শাহ আবদুল হান্নান

ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল

ইসলামী অর্থনীতি
দর্শন ও কর্মকৌশল

শাহ্ আবদুল হান্নান

দি পাইওনিয়ার

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল

শাহ্ আবদুল হান্নান

প্রকাশক
দি পাইওনিয়ার
ফোন : ০১৯১৩ ৪০০৯৭৫

গ্রন্থস্বত্ব
দি পাইওনিয়ার

প্রকাশকাল
চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, দি পাইওনিয়ার
তৃতীয় সংস্করণ, জুন ২০১১, দি পাইওনিয়ার
দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৪, আল-আমিন প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০২, আল-আমিন প্রকাশন

প্রচ্ছদ
জিয়া শামস

মুদ্রণ
দি প্রিন্টমাস্টার
১০৭ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য
দুইশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN: 984-819-005-8

Islami Orthonity: Dorshon O Karmakoushol (Islamic Economics: Philosophy & Strategy) by Shah Abdul Hannan. Published by The Pioneer. 4th Edition, January 2016. Price Tk. 250.00 (US$ 15.00)

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশকের কথা

মানবজাতির এক বিরাট অংশের মধ্যে বণ্টন সংক্রান্ত ন্যায়বিচার, স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি, ভারসাম্যপূর্ণ মানবিক উন্নয়ন, সামাজিক শান্তি ও আঞ্চলিক সমতা নিশ্চিত করতে আধুনিক অর্থনীতি ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশেবিদেশে দীর্ঘকালীন মন্দা, দীর্ঘমেয়াদী বেকারত্ব, স্থবিরতা ও মুদ্রাস্ফীতি, অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা সম্প্রসারণ, দেশী ও বিদেশী ঋণের বিশাল পাহাড়, প্রত্যেক দেশের ভেতরে ও জাতিসমূহের মধ্যে অতি প্রাচুর্য ও অতি দারিদ্র্যের পাশাপাশি অবস্থানের বিপদের মুখোমুখি হয়েছে আধুনিক অর্থশাস্ত্র। মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতা প্রাসঙ্গিক নয়; বরং অর্থনৈতিক বিষয়াদি অর্থনৈতিক আচরণের সূত্র দ্বারাই সমাধান করা যায় এবং নৈতিক মূল্যবোধের সামাজিক বিধিবিধান এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় - এই নীতিই এর মূল কারণ।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা কর্তৃক সৃষ্ট নানাবিধ অর্থনৈতিক মহামন্দা ও অর্থনৈতিক সংকট অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের হতাশ ও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ করেছে। তাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার সন্ধান একান্ত অপরিহার্য। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ব্যর্থতার পরপরই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সমস্যা সমাধানে অক্ষমতা বর্তমান সভ্যতাকে সঙ্কটপূর্ণ করে তুলেছে।

পুঁজিবাদ তার সৌধ নির্মাণ করেছিল বল্গাহীন ব্যক্তি মালিকনাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, মুনাফার অভিপ্রায় ও বাজার ব্যবস্থার নীতির উপর। সমাজতন্ত্র মানব জাতির জন্য সুখ-সমৃদ্ধি খুঁজেছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সামাজিক প্রণোদনা ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এসব মতবাদে কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও তা মানব জাতির প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির উপর আলোচনা করতে গেলে ইসলামী অর্থনীতির যে দর্শন বা স্ট্র্যাটেজি প্রয়োজন এই গ্রন্থে লেখক ব্যাপকভাবে তা আলোচনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এবং রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান হিসেবে দেশের অর্থনীতির খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক বাস্তবসম্মত ধারনা অর্জন করেছেন। বাংলাদেশে ভ্যাট-এর প্রবর্তক ও ফিনান্সিয়াল সেক্টর রিফর্ম প্রকল্পের প্রধান হিসেবে কাজ করার সুবাদে দেশী ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। একজন সমাজবিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক হিসেবে তিনি অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা সমাধানে বাস্তবসম্মত দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক ও

www.nagorikpathagar.org

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সনাক্ত করে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কল্যাণমুখী ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার স্বরূপ, সম্ভাবনা হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

গ্রন্থকার বর্তমান গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতি: দর্শন ও কর্মকৌশল, ইসলামী অর্থনীতি: প্রয়োগ ও বাস্তবতা, ইসলামী অর্থনীতি ও তার বাস্তবায়ন, ইসলামী অর্থনীতি: কিছু দিক, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং: ঐতিহাসিক ভূমিকা, বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট: অংশীদারিত্ব ব্যাংকিংই একমাত্র সমাধান, দারিদ্র্য বিমোচন: ইসলামের কৌশল, ওয়াকফ: প্রয়োজন নতুন আন্দোলন, ইসলামী ব্যাংকিং: সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি সব বিষয় সফলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া তিনি 'আল কুরআনে অর্থনীতি' শিরোনামে আমানতের খেয়ানত, এতিম এবং নারীদের সমস্যা ও অধিকার, কালালা'র সম্পত্তি বণ্টন, পার্থিব জীবনের স্থায়িত্ব, কতিপয় নিষিদ্ধ কাজ : অর্থনৈতিক তাৎপর্য, অপব্যয়, সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষার সামগ্রী, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, খিলাফতের অর্থনৈতিক তাৎপর্য, নূহ (আ)-এর যুগের সামাজিক চিত্র, সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা, সৎপথে ব্যয়, সম্পদ বণ্টন সম্পর্কিত আল্লাহর নীতি, কালেমা তাইয়্যেবার অর্থনৈতিক তাৎপর্য, আল্লাহর নিয়ামতের অপরিমেয়তা, জন্তু জানোয়ারের উপকারিতা, সম্পদের ব্যয়, সমুদ্রে যোগাযোগ ও আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান, আল্লাহর আনুগত্য, ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো, আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ও নিয়ামত, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, বিয়ে, আল্লাহই রিযিকদাতা, আল্লাহর অনুগ্রহশীল ব্যক্তি, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি, তওবার পর নিয়ামত দান, অভাবগ্রস্থদের দুঃখ দূর করা এসব বিষয়ে বিশ্ববরেণ্য তাফসীর, বিশুদ্ধ হাদিস এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে অর্থনীতির আলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে মৌলিক ও দিক-নির্দেশক বিবেচনায় দি পাইওনিয়ার বইটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণে 'ইসলামের অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা' শীর্ষক পুস্তিকার অধিকাংশ প্রবন্ধ বাস্তবতার আলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করি এতে পাঠক ইসলামী অর্থনীতি, দর্শন ও কর্মকৌশল সম্পর্কে আরো ব্যাপক ধারণা পাবেন। গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান, অধ্যাপক ড. সুলতানা রাজিয়া, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সাবেক মহাব্যবস্থাপক আহমদ হোসেন মানিক, প্রভাষক মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম এবং কবি ওমর বিশ্বাসসহ যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গ্রহণ করুন।

মোঃ হাবিবুর রহমান
২২ জানুয়ারি, ২০১৬ দি পাইওনিয়ার

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

ইসলামী অর্থনীতির উপর আমার প্রথম বই 'ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা' ১৯৮৫ সালে বের হয়। এর পর বিভিন্ন সময়ে লিখিত এবং পত্রিকায় প্রকাশিত ইসলামী অর্থনীতির উপর আমার লেখা প্রবন্ধগুলো একত্র করে ২০০2 সালে 'ইসলামী অর্থনীতি: দর্শন ও কর্মকৌশল' নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থটির চতুর্থ বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। যারা দেশ এবং অর্থনীতি নিয়ে ভাবেন তাদের পরামর্শে 'ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা' গ্রন্থের সমসাময়িক এবং প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুলো বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হলো। আশা করছি এতে পাঠক এবং অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত নীতিনির্ধারকরা অনেক বেশি উপকৃত হবেন।

ইসলামী অর্থনীতিতে দর্শন ও কর্মকৌশল (Strategy) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্পর্কিত বইয়ের সংখ্যাও কম। এ প্রেক্ষিতেই এ পুস্তকের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এ গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতির উপর যেসব প্রবন্ধ রয়েছে তার মধ্যে 'ইসলামী অর্থনীতি: দর্শন ও কর্মকৌশল' এবং 'ইসলামী অর্থনীতি: প্রয়োগ ও বাস্তবতা' প্রবন্ধ দু'টি ইসলামী অর্থনীতির দর্শন ও প্রয়োগ সংক্রান্ত। অন্যদিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের 'আল কুরআনে অর্থনীতি' প্রকল্পের আওতায় দুই খণ্ডে যে 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' নামক গ্রন্থ বের হয় তাতে একজন সদস্য হিসেবে আমারও বেশক'টি লেখা ছিল। আমার সেই লেখা ক'টিও এ পুস্তকে স্থান পেয়েছে। কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পরবর্তীতে রিসার্চের জন্য কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া এখানে ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে।

এ বই প্রকাশে বিভিন্ন সময়ে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এরমধ্যে সর্বাধিক সহযোগিতা করেছেন ড. আবদুল ওয়াহিদ ও কবি ওমর বিশ্বাস। বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের জন্য আহমদ হোসেন মানিক এবং মোঃ হাবিবুর রহমানকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, আমার এ গ্রন্থ সকলের উপকারে আসবে।

শাহ্ আবদুল হান্নান

২১ জানুয়ারি, ২০১৬

shahabdulhannan1939@gmail.com

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ইসলামী অর্থনীতি ঃ দর্শন ও কর্মকৌশল / ৯
ইসলামী অর্থনীতি ও তার সমসাময়িকতা / ১৭
ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য / ১৯
ইসলামী অর্থনীতি ও তার বাস্তবায়ন / ২৩
ইসলামী অর্থনীতির প্রথম মডেল / ২৫
ইসলামী অর্থনীতি ঃ প্রয়োগ ও বাস্তবতা / ৩২
অর্থনীতিতে সুদের প্রভাব / ৪১
যাকাত ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রধান প্রধান ব্যবস্থা / ৪৫
ওশরের বিধান / ৫২
দারিদ্র্য বিমোচন ঃ ইসলামের কৌশল / ৫৯
ওয়াকফ ঃ প্রয়োজন নতুন আন্দোলন / ৬৬
ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়করণ ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ / ৭১
ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা / ৭৬
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ঃ ঐতিহাসিক ভূমিকা / ৯৩
ইসলামী ব্যাংকিং ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা / ৯৭
বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট ঃ অংশীদারিত্ব ব্যাংকিংই একমাত্র সমাধান / ১০৬

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনে অর্থনীতি

আমানতের খেয়ানত প্রসঙ্গে / ১১৩
এতিম ও নারীদের সমস্যা এবং অধিকার সম্পর্কে / ১১৫
কালালা'র সম্পত্তি বণ্টন প্রসঙ্গে / ১১৮
পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে / ১২০
কতিপয় নিষিদ্ধ কাজ ঃ অর্থনৈতিক তাৎপর্য / ১২৩
অপব্যয় সম্পর্কে / ১২৮
সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষার সামগ্রী / ১৩২
অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা প্রসঙ্গে / ১৩৫
খিলাফতের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে / ১৩৮
নূহ (আ)-এর যুগের সামাজিক তাৎপর্য / ১৪১
সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রসঙ্গে / ১৪৫
সৎ পথে ব্যয় প্রসঙ্গে / ১৪৯
সম্পদ বণ্টন সম্পর্কিত আল্লাহর নীতি প্রসঙ্গে / ১৫১
কালেমা তাইয়েবার অর্থনৈতিক তাৎপর্য / ১৫৪
আল্লাহর নিয়ামতের অপরিমেয়তা প্রসঙ্গে / ১৫৮
জন্তু-জানোয়ারের উপকার প্রসঙ্গে / ১৬০
সম্পদের ব্যয় প্রসঙ্গে / ১৬৩
সমুদ্রে যোগাযোগ ও আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে / ১৭০
আল্লাহর আনুগত্য প্রসঙ্গে / ১৭২
ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে / ১৭৪
মানবতার জন্য সাক্ষী / ১৭৮
আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ ও নিয়ামত প্রসঙ্গে / ১৮১
আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে / ১৮৩
বিয়ে প্রসঙ্গে / ১৮৫
আল্লাহ্ই রিযিকদাতা / ১৮৯
আল্লাহর অনুগ্রহশীল ব্যক্তি সম্পর্কে / ১৯১
আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে / ১৯৪
তওবার পর নিয়ামত দান প্রসঙ্গে / ১৯৬
অভাবগ্রস্তদের দুঃখ দূর করা প্রসঙ্গে / ১৯৮

www.nagorikpathagar.org

শাহ্ আবদুল হান্নান-এর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম (১৯৭৬)
ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা (১৯৮৫)
নারীর সমস্যা ও ইসলাম (১৯৮৮)
Social Laws of Islam (1995)
Usul-al-Fiqh (2000)
ইসলামী অর্থনীতিঃ দর্শন ও কর্মকৌশল (২০০২)
নারী ও বাস্তবতা (২০০২)
দেশ সমাজ রাজনীতি (২০০৩)
Law Economics and History (2003)
বিশ্ব পরিস্থিতি, অর্থনীতি ও ইসলাম বিষয়ক বিশ্লেষণ (২০০৬)
আমার কাল আমার চিন্তা (২০০৮)
উসূল আল ফিকহ্ (২০১১)
অষ্টম কলাম (২০১১)
নারী ঃ ইসলাম ও বাস্তবতা (২০১১)
সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি ভাবনা (২০১২)
বিষয়চিন্তা (২০১৩)
নির্বাচিত সংকলন (২০১৩)
My Essays on Socio Political and Islamic Issues (2014)
SELECTED ESSAYS on Islam, Politics,
Economics and Contemporary Issues (2014)
ইসলামী অর্থনীতিঃ দর্শন ও কর্মকৌশল (২০১৬)

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী অর্থনীতি ঃ দর্শন ও কর্মকৌশল

ইসলামী অর্থনীতি বর্তমানে একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, অর্থনীতি সাবজেক্টের বয়সও খুব বেশি নয়। মাত্র আশি বা নব্বই বছর। এর পূর্বে এটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন এটাকে পলিটিক্যাল ইকোনমি (Political Economy) বলা হতো।

গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে ইসলামী অর্থনীতির উপর ব্যাপক কাজ হচ্ছে। বেশকিছু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সিনিয়র অর্থনীতিবিদ এই বিষয়ে কাজ করছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ড. নাজাত উল্লাহ সিদ্দিকী, প্রফেসর ড. ওমর চাপরা, ড. মনজের কাহাফ, ড. তরিকুল্লাহ খান, ড. মুনাওয়ার ইকবাল প্রমুখ। এছাড়াও অন্য স্কলাররা এই বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন। আস্তে আস্তে ইসলামী অর্থনীতি একটি পূর্ণ বিজ্ঞানে (Science) পরিণত হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির ওপর আলোচনা করতে গেলে ইসলামী অর্থনীতির যে দর্শন বা স্ট্র্যাটেজি সেই বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইসলামী অর্থনীতির দর্শন হলো এই অর্থনীতির ভিত্তি অথবা তার স্ট্র্যাটেজি বা কর্মকৌশলের ভিত্তি। কেননা, একটি বিল্ডিং যেমন নির্ভর করে তার ফাউন্ডেশনের ওপর, ফাউন্ডেশনটাই বলে দেয় বিল্ডিংটি কি রকম হবে, তেমনিভাবে ইসলামী অর্থনীতির দর্শন বলে দেয় যে, তার স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে বা কি হওয়া উচিত।

কিন্তু সেই দর্শন এবং কর্মকৌশল আলোচনার পূর্বে আমি মনে করি বর্তমান বিশ্বে যা চলছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধিক চলিত (Ruling) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে ক্যাপিটালিজম (Capitalism)। আমরা যদি এই ক্যাপিটালিজমের সমস্যাগুলো বুঝতে পারি তা হলেই ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্ব বুঝতে পারব। এটা এই জন্যেই প্রয়োজন যে, বর্তমান রুলিং আইডিওলজি (Ruling Ideology) দৃশ্যত খুব শক্তিশালী, খুব সফল বলে মনে হয়। অনেকের এও মনে হতে পারে যে, এর বুঝি কোনো দুর্বলতা নেই। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয় এবং এ কথাটাই আমি এখানে আলোচনা করতে চাই।

ক্যাপিটালিজমের বয়স ষোড়শ শতাব্দী থেকে ধরা হয়। প্রায় পাঁচশ' বছর এর বয়স। এই পাঁচশ বছরে ক্যাপিটালিজম যে দুনিয়ায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ

www.nagorikpathagar.org

করেছে তা অস্বীকার করা যাবেনা, তেমনি এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, ক্যাপিটালিজম বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য (Poverty), অসমতা (Unequality) দূর করতে পারেনি। কাজেই, ক্যাপিটালিজম দোষমুক্ত বা সমস্যামুক্ত এটা যেমন অতীতের ক্ষেত্রে বলা যায় না, তেমনি আজকেও বলা যায় না।

আমরা গত বিশ-পঁচিশ বছরে পুঁজিবাদী বিশ্বের অনেক সংকট দেখেছি। সাউথ ইস্ট এশিয়ায় বিরাট অর্থনৈতিক ক্রাইসিস দেখলাম বিগত শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে এবং সেটা এখনো চলছে। ল্যাটিন আমেরিকাতেও আমরা বিভিন্ন সময় ক্রাইসিস দেখেছি। ২০০৮ সন থেকে চলছে বিশ্বজোড়া নতুন করে অর্থনৈতিক সংকট।

ক্যাপিটালিজম আমরা কমবেশি সবাই বুঝি। বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদ প্রধানত পাশ্চাত্যেই তৈরি হয়েছে এবং ডেভেলপ করেছে। পাশ্চাত্যের পন্ডিতরাই এর ওপর বেশি কাজ করেছেন। এ কথাগুলো শুধু ক্যাপিটালিজমের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, সোস্যালিজমের ক্ষেত্রেও সত্য। ওয়েলফেয়ার ইকোনমিকস (Welfare Economics) নামে যা বিশ্বে চলছে, সেটাও পাশ্চাত্যেরই অবদান। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরাই এসব ধারণা নিয়ে আসছেন।

ক্যাপিটালিজমের ভিত্তি ছিল বা এর পেছনে শুরুতে কাজ করত খৃস্টান এথিকস বা খৃস্টান নৈতিকতা। কারণ, পাশ্চাত্যের যেখানে এর বিকাশ ঘটে সেই সমাজ মূলত খৃস্টান সমাজ ছিল। মৌলিকভাবে জনগণ খৃস্টীয় এথিকসে বিশ্বাস করত। ফলে ক্যাপিটালিজমের অর্থনৈতিক নীতিমালায় যা-ই ত্রুটি থাকুক না কেন, খৃস্টান এথিকস তাকে মডারেট করতো, তার খারাপ প্রভাবকে সংযত করত, তাকে নিয়ন্ত্রণ করত।

পরবর্তীকালে কোনো কোনো লেখকের দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুক্তবুদ্ধির (Enlightenment) যে আন্দোলন শুরু হয় তার মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মকে জীবনের মৌলিক কর্মকাণ্ড থেকে বাদ দেয়ারও চেষ্টা করা হলো। এই আন্দোলনের কারণে বাস্তবে সেকুলারিজম প্রাধান্য পায় এবং সমাজ সেক্যুলারিস্ট হয়। সেখানে মোরালিটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং যুক্তিকে (Reason) প্রাধান্য দেয়া হয়। এতে মনে করা হলো যুক্তিই সবকিছুর সমাধান করতে পারে। যদিও আমরা জানি, যুক্তিবাদে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এর দ্বারা সব সমাধান করা যায় না। যুক্তিবাদ সত্ত্বেও মানুষের ভিতর মতবিরোধ দেখা দেয় এবং আজকে যেটা যুক্তিসংগত মনে হয় কালকে সেটা যুক্তিসংগত থাকে না। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটা সময় গেছে যখন রিজনকে প্রায় পূজা করা হতো। আল্লাহর স্থানে, গডের স্থানে রিজনকে নিয়ে আসা হলো। সেটা ভ্রান্ত ছিল, বিভ্রান্তি ছিল, ভুল ছিল।

এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্টের কারণে (ক্যাপিটালিজমের ভিত্তি হওয়ার কারণে বা এর ফল স্বরূপ) চলে আসল ম্যাটেরিয়ালিজম (Materialism), ভোগবাদ,

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিবাদ, স্বার্থপরতার মতো বস্তুবাদের বিষয়সমূহ। এর ফলে আসে বেশি হাই কনজাম্পশান। অন্যদিকে এটা একটা সামাজিক ডারউইনিজম সৃষ্টি করল। আমরা ডারউইনিজম সম্পর্কে জানি। ডারউইনিজম হচ্ছে, জীব জগতের যে ধারণা ডারউইন থেকে এসেছে বা ডারউইন উদ্ভাবন করেছেন - (Natural selection and serival of the fittest)। অর্থাৎ জীবজগত সম্পর্কিত ডারউইনের ধারণাই ডারউইনিজম। এখন সোস্যাল ডারউইনিজম অর্থাৎ সামাজিক ক্ষেত্রেও ডারউইনিজম বিশ্বব্যাপী এত গুরুত্ব পেয়েছে এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্ট এবং ম্যাটেরিয়ালিজমের বিকাশের কারণে। ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, অর্থনীতিতেও Natural selection হবে এবং এখানে শুধু ফিটেস্টরাই সারভাইভ করবে। যোগ্যরাই বাঁচবে। অর্থনীতিতে, যদি তা-ই হয়, তাহলে তার মানে হবে প্রকৃতপক্ষে দুর্বলের কোনো স্থান থাকবে না, দরিদ্রের স্থান থাকবে না। যদি থাকেও তাহলে তাদের খুব সংকীর্ণ স্থান থাকবে।

সোজা কথা, বিশ্ব অর্থনীতি ধনীদের, যোগ্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। অর্থাৎ ম্যাটেরিয়ালিজম, এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্টের কারণে, সোস্যাল ডারউইনিজমের কারণে পুঁজিবাদ একটি ডকট্রিনে পরিণত হয়। অর্থনীতিতে শুধু যোগ্যরাই টিকে থাকবে - সেটাই একটি মতাদর্শে বা দর্শনে পরিণত হয়। এতে দরিদ্রের প্রতি খৃস্টান ইথিকসের কারণে যে মায়া-মহব্বত ছিল, তাদের প্রতি যে দায়িত্ববোধ ছিল, সেটা উঠে গেল। এমনকি দর্শনের মাধ্যমে সেটা উঠে গেল। তখন তারা দরিদ্র মারা গেলে কি হবে সে যুক্তি খাড়া করতে পারল না। যোগ্যদের টিকে থাকার ফলে দরিদ্ররা মরে যাবে। এই ধরনের ফলাফল অষ্টাদশ শতাব্দীর মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের কারণে দেখা দিয়েছিল।

ক্যাপিটালিজমের থিওরীর পেছনে কতগুলো অগ্রহণযোগ্য ধারণা (Concepts) ছিল যেগুলো আমাদের জানা দরকার। যেগুলো প্রকৃতপক্ষে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন প্রথমত, অর্থনীতির আইনগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল ল'-এর মতো। যেমন যেভাবে পৃথিবী ঘুরছে বা সূর্য যেভাবে চলছে নিজস্ব নিয়মে অথবা বায়ু প্রবাহ, নদী বা সমুদ্রের গতি প্রভৃতি ফিজিক্যাল ল'জ যেমন সঠিক তেমনি ইকোনমিক ল'জ সঠিক। এখানে অর্থনীতির আইন ফিজিক্যাল আইনের মতোই-এরকম একটা ধারণা নিয়ে আসা হলো। তারা এগুলো বিশ্বাস করে। কিন্তু এটা একেবারে সত্য নয়। আমরা জানি, বাজার ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকে। যেই পরিবর্তন আমাদের সোলার (Solar) সিস্টেমে হয় না বা আমাদের ফিজক্যাল ল'তে হয় না। অথচ যেকোনো বাজার ব্যাপক পরিবর্তনের সম্মুখীন। সুতরাং এ রকমই একটা ভুল ধারণার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপিটালিজম।

দ্বিতীয়ত, মানুষের কাজের মোটিভেশন বা কাজ করার প্রেরণাটা কি? সে সম্পর্কে তারা বলে, মানুষের কাজের মোটিভেশন হলো শুধু তার স্বার্থপরতা

www.nagorikpathagar.org

(Pecuniary Interest)। মানুষ মূলত স্বার্থপর এবং তার স্বার্থপরতা, স্বার্থ উদ্ধার করাই হচ্ছে তার প্রকৃত মোটিভেশন। এটাকেই তারা টেকনিক্যালি বলে Rational Economic Man। মানুষ হচ্ছে যুক্তিবাদী (Rational)। এ যুক্তির পরিচয় হচ্ছে সে স্বার্থের জন্য কাজ করে। তবে একথা ঠিক যে, মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা রয়েছে এবং স্বার্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মানুষ কেবল স্বার্থের জন্যেই কাজ করে? এ কথা সত্য নয়। তাহলে দুনিয়ায় এত ত্যাগ (Sacrifice) মানুষ করতে পারত না। পরিবারের জন্যে, সমাজের জন্যে মানুষ এত ত্যাগ করত না। এত চ্যারিটি দুনিয়াতে থাকতো না।

তৃতীয়ত, তারা একটি মূল্যবোধহীন অর্থনীতির জন্ম দিল। তারা একটি ডকট্রিন খাড়া করল পজিটিভিজম (Positivism) নামে। পজিটিভিজম হলো, অর্থনীতিতে কোনো মূল্যবোধ নেই। অর্থনীতিতে মূল্যবোধ এলেই অর্থনীতি প্রভাবিত হয়ে যাবে। অর্থনীতি তার ন্যাচারাল কোর্স থেকে সরে পড়বে। অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান হিসেবে থাকবে না। কিন্তু অর্থনীতির কার্যক্রমে কোনো মূল্যবোধ থাকবে না? এরকম দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত মারাত্মক। আর তা-ই যদি হয় তাহলে কোন যুক্তিতে আমরা দরিদ্রের জন্য কাজ করব? দারিদ্র্য কেন দূর করব? কেন আমরা নিরক্ষরতা দূর করব? কেন আমরা বঞ্চিত জনগণের জন্য কাজ করব? এ সবই তো মুল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত।

সুতরাং পজিটিভিজম ধারণা ক্যাপিটালিজমে প্রবেশ করল যে, অর্থনীতিতে কোনো মুল্যবোধ নেই। ক্যাপিটালিজমের অপর নাম মূল্যবোধহীন অর্থনীতি। এটা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না অথচ এটাই চলছে ক্যাপিটালিজমের নামে। আবার বলা যায়, পুরোপুরি চলছে না। কারণ, মানুষের মানবিকতা কখনো কখনো এসব বিষয় কার্যকর হতে দেয় না। কারণ এগুলো সব আন-ন্যাচারাল (অস্বাভাবিক) ধারণা। এ জন্যে হয়ত বা এগুলো থিওরিতে আছে তবে বাস্তবে তা পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, ক্যাপিটালিজম মার্কেট সিস্টেমের উপর গুরুত্ব দেয়। মার্কেট সিস্টেমের গুরুত্ব সত্ত্বেও তার অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সেটা তারা স্বীকার করে না। ক্যাপিটালিজমের মার্কেট সিস্টেমের অনেক ভালো দিক আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এলোকেশন অব রিসোর্সের ক্ষেত্রে মার্কেট একটি ভালো কাজ করে। কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, ক্যাপিটালিজমে মার্কেট সিস্টেমটাকে যে রকম পুরোপুরি পারফেক্ট মনে করা হয় তা কিন্তু সত্য নয়। বাস্তবে মার্কেট সিস্টেমের মাধ্যমে পুরোপুরি রিসোর্স বা সম্পদের সঠিক বণ্টন (Proper allocation) হয় না। ন্যায়বিচারমূলক বণ্টন হয় না। তার প্রমাণ বাস্তবে একটা দেশে জনগণের একটা অংশের হাতে প্রয়োজনীয় ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় তারা কিনতে পারে না। যেমন, আমাদের দেশে অর্ধেকের বেশি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। তাদের কাছে ডলার বা পাউন্ড নেই। তারা

www.nagorikpathagar.org

কিনতে পারে না। তারা অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রী কিনতে পারে না বলে তাদের প্রয়োজনটা মার্কেটেই যায় না, যেতেও পারে না। তাদের দুধ বা ওষুধ দরকার হলেও সেই প্রয়োজন মার্কেটে আসছে না। তাদের বাড়ি দরকার, বাড়ি ভাড়া করা দরকার-সেই প্রয়োজন মার্কেটে যায় না। কারণ, তারা সেটা কিনতে পারছেনা।

অন্যদিকে মার্কেট সিস্টেমে যাদের টাকা আছে তারা চারটা-পাঁচটা গাড়ি কিনতে পারে। বিরাট বিরাট বাড়ি বানাতে পারে। অন্যদিকে যাদের টাকা নেই তারা দুধ পর্যন্ত কিনতে পারে না। ওষুধ কিনতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে দু'টো ফল জনগণের হয়। প্রথমত পূর্ণ ও সঠিক ডিমান্ডটা মার্কেটে আসতে পারে না বর্তমান মার্কেট সিস্টেমের কারণে এবং দ্বিতীয়ত অগ্রাধিকার (Priorities) নষ্ট হয়ে যায়। দরকার দুধের অথচ মার্কেট বলছে বিলাস সামগ্রী বানাও। কেননা Price Mechanism-এর মাধ্যমে বাজারে সেসব দ্রব্যের চাহিদা এসেছে। গাড়ির চাহিদাটাই মার্কেটে আসছে। দুধের চাহিদা আর আসতে পারছেনা।

সুতরাং মার্কেট সিস্টেম সঠিক পদ্ধতি নয় যার মাধ্যমে সম্পদের সমবণ্টন হতে পারে। কেননা, সম্পদ চলে যাবে সেইদিকে, যেদিক থেকে মার্কেটে ডিমান্ড আসছে। সম্পদ সেই দিকেই যাবে, যেই ডিমান্ডটি মার্কেটে আসে। ফলে যে ডিমান্ড আসছে না (দুধের ডিমান্ড পুরোপুরি আসছে না) সেদিকে তো সম্পদ যাচ্ছে না। এরকম প্রচণ্ড ইমপারফেকশন (Imperfection) মার্কেট সিস্টেমে রয়েছে। সুতরাং যারা মনে করেন মার্কেট সব সমস্যার সমাধান করবে তারা সম্পূর্ণ ভুল করে, মার্কেটের দাস (Servant) হয়ে যায়। কিন্তু সেটা হওয়া ঠিক হবে না। বাজার গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বাজার একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।

এই কনটেক্সটে (Context) এখন ইসলামের অর্থনীতির যে মূল ভিত্তি বা তার যে স্ট্র্যাটেজি সে সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। বর্তমানে রুলিং আইডিওলজি ক্যাপিটালিজমের দুর্বলতা বোঝার কারণে ইসলামী অর্থনীতির কর্মকৌশল ভালো করে বোঝা সম্ভব। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ তিনটি বিষয় বা কনসেপ্টকে মূল ভিত্তি বলেছেন। প্রথম ভিত্তিটি হলো তৌহিদ। এই তৌহিদ হচ্ছে পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এটা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি নয়। সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মানুষের গুরুত্ব রয়েছে এবং সকল মানুষকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে খিলাফত। খিলাফত হলো - মানুষ আল্লাহর খলিফা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই। সূরা বাকারা, সূরাতুল ফাতিরে এবং অন্যান্য সূরাতে একথা বলা হয়েছে। খিলাফত মানুষকে অত্যন্ত সম্মানিত করেছে। মানুষ কোনো চান্স প্রোডাক্ট (Chance Product) নয়। হঠাৎ করে একটা এক্সিডেন্টের মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টি সে রকম নয়। মানুষ জন্মগত অপরাধী (Born Sinner)-ও নয়। যেমনটি পাশ্চাত্যে মনে করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

খিলাফতের ধারণা মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। খিলাফতের তাৎপর্য হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ব (Universal Brotherhood)। অর্থাৎ সকল মানুষ ভাই বা ভাই-বোন এবং এ হিসেবে তারা মর্যাদার অধিকারী, সমতার অধিকারী, সমভাবে তাদের দিকে খেয়াল করতে হবে। খেয়াল করার প্রয়োজন রয়েছে। এর আরেকটা তাৎপর্য হলো, মানুষ মূল মালিক নয়। মূল মালিক আল্লাহ পাক এবং সম্পদ (Resource) একটা আমানত মাত্র। যে কোনোভাবে সে সম্পদকে ব্যবহার করতে পারে না। সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে চেয়েছেন ঠিক সেভাবে। এগুলো হলো খিলাফতের ধারণার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য।

তৃতীয় ভিত্তি জাস্টিস, ইনসাফ বা ন্যায়বিচার। আদল হলো কুরআনের পরিভাষা। কুরআনে প্রায় একশ' আয়াত আছে, যেখানে জাস্টিসের কথা বলা হয়েছে। আরো একশ' আয়াত আছে যেখানে জুলুমের নিন্দা করা হয়েছে। তার মানে হলো, অর্থনীতিতে জুলুম থাকলে চলবে না এবং জাস্টিস আনতে হবে। এটাই হলো জাস্টিসের মূল তাৎপর্য।

আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায়, ইনসাফের দাবি হলো সকল মানুষের প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে হবে। সকলের জন্য সম্মানজক আয়ের (Respectable earning) ব্যবস্থা করতে হবে। এমনভাবে অর্থনীতিটাকে সাজাতে হবে, এমনভাবে কর্মকৌশলটাকে নির্ধারণ করতে হবে যাতে সকলের আয়ের ব্যবস্থা হয়। যদি কারোর আয়ের ব্যবস্থা না হয় কিংবা যদি কেউ সম্মানজনক আয়ের ব্যবস্থা না করতে পারে-অর্থাৎ যদি তার কোনোরকম শারীরিক বা মানসিক দুর্বলতা থাকে বা অর্থনৈতিক কোনো বিপর্যস্ত অবস্থা থাকে সে অবস্থায় অনেকে হয়ত ইনকাম করতে পারল না; তাহলে তাদের ব্যবস্থা প্রথমে করতে হবে তার পরিবারের বা আত্মীয়-স্বজনদের। আর তারা যদি না পারে তাহলে রাষ্ট্রকে করতে হবে। এ হলো জাস্টিসের দাবি।

এরপর ইসলামী অর্থনীতির কর্মকৌশল (Strategy) সম্পর্কে বলতে হয়। চারটি স্ট্র্যাটেজির কথা আমাদের অর্থনীতিবিদরা বলেছেন। অনেক কথা বললেও এই চারটি কথাই প্রধান। এর মধ্যে প্রথমটি হলো নৈতিক ছাঁকনি। অর্থাৎ রিসোর্সের একটা পয়েন্ট অব টাইম বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের একটা সীমা আছে এবং এর ডিমান্ড প্রায় সীমাহীন। ফলে এ দু'টির মধ্যে মিলাতে গেলে ডিমান্ডের উপর এমন এক ছাঁকনি দরকার যাতে ডিমান্ডগুলো যেন একটু কমে আসে, সংযত থাকে।

একটি ছাঁকনি হলো প্রাইস (Price) যেটা আধুনিক ক্যাপিটালিজমে আছে। প্রাইসের মাধ্যমে ডিমান্ডকে সংযত করা হয়। আমার টাকা কম সুতরাং আমি কিনতে পারবো না - এটা হচ্ছে এক ধরনের ছাঁকনি বা ফিল্টার, যার মাধ্যমে এটা হয়। ইসলাম এই প্রাইস ফিল্টারকে মেনে নিয়েছে। আবার মেনে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস সে নিয়ে আসে। সেটাকে বলা হয় নৈতিক ফিল্টার।

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ইসলাম এমন একটা নৈতিকতা সৃষ্টি করেছে, এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে যে, মানুষ যেন অপব্যয় না করে। অতিভোগ যেন না করে। অতিরিক্ত ভোগের দিকে যেন তার নজর না যায়। নৈতিক ছাঁকনির গুরুত্ব অনেক। কেননা, মূল্য ছাঁকনি (Price Filter) দ্বারা কেবল দরিদ্র মানুষের দাবি কমানো যায়। সুতরাং এই একটা স্ট্র্যাটেজি ইসলামী অর্থনীতিবিদরা সাজেস্ট করেছেন - মূল্য ছাঁকনি ছাড়াও কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে একটা নৈতিক ছাঁকনি (Moral Filter) নিয়ে আসা। যাতে করে ডিমান্ড সংযত হয়। প্রাইসের মাধ্যমেও আমরা ডিমান্ডকে সংযত করব, অন্যদিকে নৈতিক ছাঁকনির মাধ্যমে আমরা অতিরিক্ত ভোগ নিয়ন্ত্রণ করব। যতবেশি ভোগ করব, ততবেশি আল্লাহর কাছে দায়ী হব। আমাদেরকে জবাব দিতে হবে। এর জন্য চ্যারিটি করতে হবে। এইসব মাধ্যম ডিমান্ড এর দাবিকে কমিয়ে এনেছে যেন আমাদের কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের রিসোর্সের প্রাপ্যতার সঙ্গে ডিমান্ডের সংঘাতটা কমে আসে।

ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ দ্বিতীয় যে স্ট্র্যাটেজির কথা বলছেন সেটা হলো প্রপার মোটিভেশন (Proper motivation)। আমাদের প্রপার মোটিভেশন থাকতে হবে, প্রপার মোটিভেশন সৃষ্টি করতে হবে। ক্যাপিটালিজম এই মোটিভেশনকে একমাত্র স্বার্থ বলেছে। কিন্তু ইসলাম বলেছে - না, স্বার্থ ঠিকই আছে কিন্তু এই স্বার্থপরতাকে বিস্তার করে দিতে হবে। অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম যেখানে দুনিয়াভিত্তিক স্বার্থের কথা বলে সেখানে ইসলামী অর্থনীতি দুনিয়া ও আখিরাতের স্বার্থের কথা বলে। দু'টো মিলে যাতে লাভ সেটাই স্বার্থ। এডুকেশনের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে, প্রচারের মাধ্যমে, ওয়াজের মাধ্যমে, দাওয়াতের মাধ্যমে - সর্ব উপায়ে এটা করতে হবে। জনগণের মাঝে উপযুক্ত মোটিভেশন সৃষ্টি করতে হবে। অর্থনৈতিক কাজকর্মে কেবল দুনিয়ার স্বার্থ দেখলে চলবে না। দুনিয়ার স্বার্থ এবং আখিরাতের স্বার্থ দেখতে হবে। সুতরাং ইসলাম মোটিভেশনের স্বার্থপরতাকে বিস্তৃত করে দিয়েছে। বেসিক কর্মকৌশলের মধ্যে এটা রয়েছে।

উপরের বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সময় লাগবে। এ জন্য ইসলামী অর্থনীতিবিদরা তৃতীয় কর্মকৌশলও নির্ধারণ করেছেন Socio-economic financial re-structuring নামে এবং এই বিষয়টিকেই তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। এর মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ফাইনান্সিয়াল ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হবে। এর সাহায্যে ব্যাংকিং সিস্টেমের মনিটরিং পলিসির (Monitoring ploicy), ফিসকেল সিস্টেমে (Fiscal) পরিবর্তন করতে হবে। ব্যাংকের টাকা সৃষ্টির ক্ষমতাকে (Power to money creation) সংযত করতে হবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে ও মিডিয়াম শিল্পের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষি এবং রুরাল অর্থনীতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শুধুমাত্র আরবান বেসড (Urban based) হলে চলবে না। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ইসলামী অর্থনীতিবিদরা করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

কর্মকৌশলের চতুর্থ দিক হলো, Social re-structuring, Economic re-structuring এবং Financial re-structuring-এর কাজটি করতে হবে সরকারকে। ইসলামের অবস্থা সমাজতন্ত্রের মত নয় যে, সরকার সব করবে। আবার পুঁজিবাদের মতোও নয় যে, মার্কেটই সব করবে। ইসলাম বলে, মার্কেটকে আশি ভাগ আর সরকারকে বিশ ভাগ করতে হবে (এ হার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে পারে)। এটাই হচ্ছে সরকারের ভূমিকা।

আর এই চারটিই হলো ইসলামী অর্থনীতির মূল কর্মকৌশল।

গ্রন্থসূত্র

১. আল-কুরআনুল করীম

২. বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৩. ড. এম. ওমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, বিআইআইটি

৪. শাহ আবদুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা

৫. Duraut, The Story of Civilizaiton

৬. Arnold Toynbee, A Study of History

৭. Paul A Samuelson, Economics

৮. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম

৯. ইমাম শাতিবি, আল-মুয়াফাকাত ফিল উসূল আল-শরীয়হ

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী অর্থনীতি ও তার সমসাময়িকতা

মানব জীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক সমস্যাকেই সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপর ইসলামী দাওয়াতের অগ্রগতি নির্ভরশীল। কেননা দারিদ্র্য জর্জরিত জনগণ ইসলামের দাওয়াত বোঝার অবকাশই পায় না। এ জন্য ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিগুলো নির্ধারণ এবং সে আলোকে বিশদ বিধান (Laws and regulations) তৈরি করা বিশেষ জরুরি। নব্য স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশ যেন ইসলামের আলোকে হতে পারে, সে জন্য ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রশাসকদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে কিছু মনীষী ও সংস্থা গত দুই দশকে অনেক মূল্যবান কাজ করেছেন। সংস্থাসমূহের মধ্যে আমেরিকার Association of Muslim Social Scientists, International Centre for Islamic Economics, Jeddah-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশে Bangladesh Islamic Bankers Association ও Islamic Economic Research Bureau বেসরকারি পর্যায়ে কিছু কাজ করছে।

এ প্রসঙ্গে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে সাধারণভাবে যেসব ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর করা দরকার। অনেকের ধারণা, ইসলামী অর্থনীতি মানে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আরব দেশে যে অর্থব্যবস্থা চালু ছিল তার পুনরুজ্জীবন করা। কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। যারা ইসলামী অর্থনীতি কায়েম করতে চান, তারা কোনো বিগত দিনের অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান না। বর্তমান সময়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলে তা আধুনিকই হবে এবং সে ব্যবস্থায় আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, প্রযুক্তি বিদ্যা (Technology) ও সংগঠনের (Methods of organization) নিয়মই অবলম্বন করা যাবে। এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, উৎপাদন ও সংগঠন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি বিদ্যা কোনো বিশেষ আদর্শের উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে যে কোনো অর্থনীতিতেই এসব উদ্ভাবন ও পদ্ধতিকে সমভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আদর্শিক অর্থব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় বা ইসলামী অর্থনীতি বলতে আমরা কি বুঝতে চাই তাও পরিষ্কার করা

www.nagorikpathagar.org

দরকার। অনেকে বলে থাকেন, ইসলামের কোনো অর্থব্যবস্থা নেই এবং একটি চিরন্তন নৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা থাকাও উচিত নয়। যদি ব্যবস্থা (System) বলতে অর্থনীতির প্রতিটি দিকের বিস্তারিত ও নির্দিষ্ট নিয়মাবলী বোঝানো হয় তাহলে অবশ্য বলা যেতে পারে যে, ইসলামে কোনো অর্থব্যবস্থা নেই। কিন্তু ব্যবস্থা (System) বলতে কতকগুলো মূলনীতি ও মূল্যবোধও বোঝানো যেতে পারে যা একটিকে অন্যটি হতে পৃথক করে থাকে। মূলনীতি বা মূল্যবোধের দৃষ্টিতেই অর্থনৈতিক অবাধ স্বাধীনতাকে (Laissez-faire) পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে এবং সামাজিক মালিকানাকে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়েছে। ইসলামে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ থেকে অনেক বেশি বিস্তারিত অর্থনৈতিক নিয়মাবলী রয়েছে। কাজেই ইসলামী অর্থব্যবস্থা থাকতে পারে না বলা অত্যন্ত অযৌক্তিক। ইসলামী অর্থনীতির ইসলামিত্ব (Islamicness) হচ্ছে তার মূল্যবোধ এবং তার প্রয়োগনীতিতে। অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি প্রধান ইসলামী মূলনীতি হচ্ছে সুদ নিষিদ্ধকরণ, সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, দুস্থদের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা (যাকাত), ব্যবসা ও জীবিকা অনুসন্ধানের অধিকার, অর্থ ও সম্পদ জমাকরণের (Concentration) বিরুদ্ধে শক্ত মনোভাব, ইসলামের মিরাসি ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির প্রতিরোধ (আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার)। আমরা পরে দেখতে পাব যে, ইসলামী রাষ্ট্র নাহি আনিল মুনকার (দুর্নীতির প্রতিরোধ)-এর ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমকালীন সব অর্থনৈতিক জুলুম ও অনাচার প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। অনেকে মনে করেন যে কোনো সমস্যার কেবল একটিই ইসলামী সমাধান হতে পারে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র একই সমস্যাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারে। কোনো লেখকের পক্ষে ইসলামী অর্থনীতির বিশদ বিধান (details) রচনা করে সেটিকে একমাত্র মডেল বা চূড়ান্ত মনে করা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক দাবি। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর মূল পাঠ (text) থেকে পাওয়া বিধানের অতিরিক্ত বিশদ বিধান তৈরি করার জন্য লেখকরা যে ইজতিহাদ করবেন তাতে ব্যাপক মতপার্থক্য হতে পারে। সুতরাং গত হাজার বছরের অর্থনৈতিক বিবর্তন ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে ইসলামী অর্থনীতির বিশদ মডেল তৈরি করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে এসব মতপার্থক্য দেখা দেয়ার সম্ভাবনা বেশি তার মধ্যে ভূমি সংস্কার, অর্থনীতিতে সরকারি ভূমিকা, সুদবিহীন অর্থনীতির সঠিক মডেলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইসলামী চিন্তাবিদদের এসব মতপার্থক্য সম্বন্ধে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ঐক্যের গুরুত্ব লাঘব করা নয়। তবে ঐক্য ও সমঝোতা কেবল পরেই বিতর্কের মধ্যে আসতে পারে, পূর্বে নয়।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য আলোচনার পূর্বে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে কিছু আছে কিনা সে প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজন। এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে যে, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদকে কেন অর্থব্যবস্থা বলে উল্লেখ করা হয়। পুঁজিবাদ বলতে আমরা নিশ্চয়ই কোনো দেশের বাজার, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বুঝি না। কেননা এসব তো সমাজতন্ত্রেও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কেবল একটি নীতি অর্থাৎ ব্যক্তির অর্থনৈতিক উদ্যোগ নেবার স্বাধীনতা ও মালিকানা যে ব্যবস্থায় থাকে তাকেই পুঁজিবাদ বলা হয়ে থাকে। তেমনিভাবে সমাজবাদ বলতে আমরা ব্যাংকব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি বুঝি না। কেননা এসব তো পুঁজিবাদেও রয়েছে। বরং রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও উৎপাদনের নীতির কারণেই একটি অর্থব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়।

এ প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, যদি একটি মাত্র প্রধান মূলনীতির কারণে কোনো অর্থব্যবস্থাকে পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয় তবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিকে কেন্দ্র করে যে অর্থনীতি গড়ে ওঠে তাকে নিঃসন্দেহে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে গণ্য করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিক ও বিস্তৃত অর্থনৈতিক নীতি ইসলাম দিয়েছে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সুদের নিষিদ্ধতা, যাকাতের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা, সম্পত্তি বণ্টনের ইসলামী নিয়ম, হালাল ও হারামের বিস্তৃত সীমারেখা – এসব হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি।

মদিনায় ইসলামী অর্থনীতির যে প্রথম মডেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তাতে শরীয়তের সীমার মধ্যে উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের স্বাধীনতা ছিল। এ স্বাধীনতাকে পুঁজিবাদী গণ্য করা যাবে না। কেননা মদিনার ইসলামী অর্থনীতি পুঁজিবাদের অনেক আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কাজেই ইসলাম পুঁজিবাদ থেকে কিছু নিয়েছে একথা বলা যায় না।

ইসলামের অর্থনীতির লক্ষ্য কি তা আমাদের কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

www.nagorikpathagar.org

ক. অর্থনীতিতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা

ইসলাম অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে:

> আল্লাহ তোমাদের আদল ও ইহ্সান প্রতিষ্ঠা করার আদেশ করেছেন। (সূরা নহল: আয়াত ৯০)
>
> লোকদের মধ্যে যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে। (সূরা নিসা: আয়াত ৫৮)

সূরা নহলে যে আদেশ আল্লাহ্ করেছেন তা যেমন ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য সরকারের উপর। কাজেই সরকারকে শ্রমিক, কৃষক সহ সব শ্রেণি ও গোষ্ঠীর প্রতি সুবিচার করতে হবে। ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেরও একই দায়িত্ব। সূরা নহলে আল্লাহপাক কেবল সুবিচারের কথাই বলেননি ইহ্সান বা সু-আচরণের কথাও বলেছেন। সুবিচার পাওয়া তো প্রত্যেকের অধিকার। তবে সুবিচারের অতিরিক্ত জনগণকে দিতে হবে এবং সেটাই হচ্ছে ইহ্সান। সূরা নিসার আয়াতের আলোকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মীমাংসা করার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা আদালত থাকতে হবে যা সুবিচারের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা করবে ও অধিকার আদায় করে দেবে।

খ. নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ

নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের প্রতি আল্লাহ্ বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাকের ঘোষণা হচ্ছে:

> পৃথিবীতে যারা নির্যাতিত ও বঞ্চিত তাদের অনুগ্রহ করতে চাই। তাদেরকে পৃথিবীতে ইমাম (নেতা) ও উত্তরাধিকারী বানাতে চাই। তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করতে চাই।
>
> (সূরা কাসাস: আয়াত ৫-৯)

এ হচ্ছে বঞ্চিতদের সম্পর্কে আল্লাহপাকের সাধারণ নীতি। 'উত্তরাধিকারী' করার অর্থ হচ্ছে এমন সুযোগ সুবিধা দেয়া যাতে বঞ্চিতরা পৃথিবীকে ন্যায়সংগতভাবে উপভোগ করতে পারে। এ নীতির অর্থ হবে এমন বেতন, সুবিধা, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বসবাসের সুবিধা যা তাদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে। কাজেই ইসলামী অর্থনীতিতে এমন সব আইন, বিধি, নীতি, প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে সাধারণ লোকদের স্বার্থ বিশেষভাবে রক্ষিত হয় এবং কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয়। এটা করতে ব্যর্থ হলে সে অর্থনীতিকে বা সরকারকে আমরা সঠিক অর্থে ইসলামী অর্থনীতি বা সরকার বলতে পারি না। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে অন্য সব শ্রেণির অধিকার নষ্ট করা। অন্য সব শ্রেণির ন্যায়সংগত অধিকারও রক্ষা করতে হবে, কিন্তু সাধারণ লোকদের অধিকার (তাদের দুর্বল হবার কারণেই) প্রাধান্য পাবে।

www.nagorikpathagar.org

গ. অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উৎখাত করা

এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক যে সাধারণ নীতি দিচ্ছেন (যা অর্থনীতিতেও সমভাবে প্রযোজ্য) তা হচ্ছে:

> যাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দেয়া হয় তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সালাত ও যাকাতের প্রতিষ্ঠা, মারুফ (সুকৃতি বা ভালো কাজ) কাজের আদেশ দেয়া ও মুনকার (দুর্নীতি) প্রতিরোধ করা। (সূরা হজ্ব: আয়াত ৪১)

এ ধরনের বহু আয়াত কুরআন মজীদে রয়েছে। এসব আয়াতের 'মারুফ' ও 'মুনকার' শব্দকে সামগ্রিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে, কেবল নৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। এ আয়াতের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে এমন সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নীতি, পলিসি ও প্রতিষ্ঠান কায়েম করা যাতে কল্যাণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং দুর্নীতি দূর হয়। একইভাবে এ আয়াতের তাৎপর্য হবে অর্থনীতি হতে এমন সব ব্যবস্থা, নীতি, পলিসি, প্রতিষ্ঠান, আইন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ, অপসারণ ও দূর করা যার ফলে জনগণের কল্যাণ হয়। এসব কাজ করা ইসলামী সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবশ্য কর্তব্য।

ঘ. জনগণের সহজ জীবন নিশ্চিত করা

আল্লাহপাক নবী(সা.)-এর অন্যতম দায়িত্ব এভাবে নির্ধারণ করেছেন:

> তিনি তাদেরকে বোঝা হতে মুক্ত করেন এবং যে সব শিকলে তারা আবদ্ধ তা থেকে তাদের মুক্ত করেন। (সূরা আরাফ: আয়াত ১৫৭)

নবী (সা.) এর উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিটি মুসলিম সরকার ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে সে সব অন্যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ, বিধিবিধান ও নিয়মনীতি হতে উদ্ধার করা যা জনগণের জীবনের উপর বোঝা ও শিকল হয়ে আছে। অপ্রয়োজনীয় রীতি-রেওয়াজ ও আইনকানুন মানুষের জীবনের স্বাধীনতা ও শান্তি নষ্ট করে। কাজেই ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতিতে কোনো অপ্রয়োজনীয় বিধিবিধানের স্থান নেই। অবশ্য কোনটি প্রয়োজনীয় আর কোনটি অপ্রয়োজনীয় তা ইসলামী সরকারের আইন পরিষদই ঠিক করবেন।

ঙ. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার

ইসলাম জনকল্যাণের জন্য সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার চায়। এ জন্যই ইসলাম পতিত জমি ফেলে রাখা সমর্থন করেনি। যে কেউ তিন বৎসর পর্যন্ত জমি ফেলে রাখলে নবী(সা.) তা নিয়ে নেয়ার জন্য বলেছেন। পতিত সরকারি জমি আবাদ করার জন্য হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এক-দশমাংশ ফসল পাবার বিনিময়ে হলেও চাষীদের নিকট বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১] একই নীতি অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে গণ্য করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

চ. সম্পদের যথাযথ বণ্টন

ইসলাম সম্পদের যথাযথ বণ্টনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহপাকের নীতি নির্ধারণী ঘোষণা হচ্ছে:

> সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে না থাকে। (সূরা হাশর: আয়াত ৭)

এ আয়াতের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে আইন ও পলিসির মাধ্যমে সম্পদের সর্বাধিক বিস্তার ও বণ্টন নিশ্চিত করা এবং লক্ষ্য রাখা যেন সম্পদের অতিরিক্ত পুঞ্জিভূত হবার সুযোগ না হয়।

ছ. কল্যাণকর দ্রব্যের সর্বাধিক উৎপাদন

নবী(সা.)-এর দায়িত্ব হিসেবে আল্লাহপাক বলেছেন:

> তিনি তাদের জন্য পবিত্র দ্রব্য হালাল করেন ও অপবিত্র দ্রব্য হারাম করেন। (সূরা আরাফ: আয়াত ১৫৭)

এ আয়াতের আলোকে ইসলামের উৎপাদন ব্যবস্থায় অপবিত্র দ্রব্যের কোনো স্থান নেই। সেখানে কেবল স্বাস্থ্যকর ও পবিত্র দ্রব্যই থাকবে। তাই ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য হবে জনগণের স্বার্থে স্বাস্থ্যসম্মত দ্রব্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং সব অকল্যাণকর দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, রফতানি, ব্যবসা নিষিদ্ধ করা।

এ অধ্যায়ে ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি প্রধান লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব মূলনীতি কার্যকর করা ইসলামী সরকারসমূহের কর্তব্য। এসবের কার্যকর করার উপরই ইসলামী বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করে। আইন করেও যদি এসব লক্ষ্য অর্জিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে ইসলামের কোনো ভুল নেই, ভুল রয়েছে আমাদের আইন, বিধিবিধান ও আমাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে। এ কথা যেমন আজকের জন্য সত্য, তেমনি সত্য ভবিষ্যতের জন্যও।

তথ্যসূত্র

১. ইউসুফ আল কারযাভী: আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী অর্থনীতি ও তার বাস্তবায়ন

বিশেষজ্ঞদের ব্যাপক গবেষণার ফলে 'ইসলামী অর্থনীতি' বিষয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক বিষয়েরই বিকাশ হতে থাকে এবং ইসলামী অর্থনীতিও ভবিষ্যতে বিষয় হিসেবে ব্যাপক বিকাশ হবে বলে আশা করা যায়।

ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু (Scope) নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা আছে। সাধারণভাবে ইসলামী অর্থনীতি বলতেই 'যাকাত' ও 'সুদ' সংক্রান্ত আলোচনা, খুব বেশি হলে ইসলামী ব্যাংক সংক্রান্ত আলোচনাকে বোঝা হয়। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। অর্থনীতির তত্ত্বগত ও প্রয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই ইসলামী অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য নিরসন, নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও যথাযথ বন্টন। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলাম একটি ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক স্বাধীন অর্থনীতি কায়েম করতে চায় যাতে উৎপাদনের, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা থাকবে, যেখানে শ্রমিকের অধিকারের দিকে বিশেষ নজর দেয়া হবে, যেখানে বিনিয়োগ হবে প্রধানত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (মুদারাবা ও মুশারাকা), যেখানে অভাবগ্রস্তদের সমস্যা দূর করার জন্য যাকাত ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি, যথাযোগ্য বন্টন ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই ইসলাম তার অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করবে। এ প্রেক্ষিতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, 'ইসলামী অর্থনীতি' বিষয়ে (Subject) উৎপাদন, বন্টন, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এসব এবং এগুলোর থিওরী অন্তর্ভুক্ত হবে। এসব থিওরী না বুঝে কেউ উৎপাদন, বন্টন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া ভালো করে সম্পন্ন করতে পারবে না। সুতরাং Micro ও Macro economics-এর সকল বিষয়ই ইসলামী অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তা পড়তে হবে। অবশ্য থিওরীর সকল ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতে হবে এবং তা ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ তাদের বইয়ে আলোচনাও করেছেন। অর্থনীতির অধিকাংশ থিওরীকে পুঁজিবাদের অংশ মনে করা একেবারে অসঙ্গত। এগুলো হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ধরনের তত্ত্ব, যেমন Theories of price, firm, trade - যা সকল চিন্তাধারাতেই ব্যবহার করা যায়। উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হলো যে, ইসলামী অর্থনীতির

www.nagorikpathagar.org

Scope বিশাল। ইসলামী বাজার ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কেও কিছু বিভ্রান্তি আছে। ইসলাম বাজার ব্যবস্থাকে স্বীকার করে এবং গুরুত্ব দেয়।

বাজার (Market)-এর মাধ্যমে চাহিদা (Demand), ভোক্তার পছন্দ (Preference) বোঝা যায়। সে মোতাবেক উৎপাদনও যোগান দেয়া যায়। চাহিদা ও যোগান দ্বারা মুল্য বা Price নির্ধারিত হয়ে থাকে। ইসলামের শুরুতে যে অর্থনীতি বিরাজ করছিল তাতে দেখা যায় যে উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, বিনিয়োগ ও মূল্য নির্ধারণ স্বাধীনভাবে হতো, যদিও তা ইসলামের হালাল ও হারামের নীতির অধীন ছিল। এটাকে স্বাধীন বাজার ব্যবস্থা বলতে হয়।

কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে বাজারের দাস (Servant) হতে বলেনি। বাস্তবক্ষেত্রে আমাদেরকে ইসলামের অন্যান্য নীতিমালাও অনুসরণ করতে হবে। যেমন বাজারের নামে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি না দেয়া চলবে না। শ্রমিককে বাঁচার মতো মজুরি দিতে হবে। পুরাতন পুঁজিবাদের সময়ে বাজারের নামে শ্রমিককে বঞ্চিত করা হতো, তাদের উপযুক্ত মজুরি দেয়া হতো না। যার ফলে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় আর নানা দেশে রক্তাক্ত বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং বিশ্বের অনেক দেশ প্রায় ৮০ বছর একধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বে বাস করে। ইসলাম এ ধরনের নীতি সমর্থন করে না। ইসলাম আমাদেরকে আবদুল্লাহ (আল্লাহর দাস) হতে বলে, বাজারের দাস (আবদুল মার্কেট) হতে বলে না। বাজার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শ্রমিক ও বঞ্চিতদের অধিকার সমানভাবে বরং বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক ও কর্মচারীকে ন্যায্য মজুরি দিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারে, কেবল সেগুলো Long-term টিকে থাকবে। যারা তা পারে না, তাদেরকে তাদের বিনিয়োগকে নতুন ক্ষেত্রে সরিয়ে নিতে হবে, যাতে তারা ন্যায্য মজুরি দিয়েও টিকে থাকতে পারে। ইসলামের সঠিক নীতিমালা এটাই।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশে ইসলামী প্রশাসন হলে কি দ্রুত অবস্থার উন্নতি হবে? এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন; এটা নির্ভর করবে ইসলামী প্রশাসনের যোগ্যতার উপর। যদি তারা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন তবে কর না বাড়িয়েও একই টাকা সদ্ব্যবহার করে অধিকতর কাজ করতে পারবেন। ইসলামী প্রশাসন হলে উচ্চপর্যায়ে দুর্নীতি দূর হবে যার ফল নিচের দিকেও যাবে। তারা যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে কয়েক বছরের মধ্যে acute poverty দূর করতে পারবেন বলে মনে করি। তবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সময় লাগবেই। রাজস্ব বাজেট বা উন্নয়ন বাজেটে বিভিন্ন খাতে যে ধরনের বরাদ্দ আছে তাতে তেমন পরিবর্তনের অবকাশ নেই। আসলে প্রায় সব খাতেই আরো বরাদ্দ প্রয়োজন অথচ সে পরিমাণ অর্থ আমাদের হাতে নেই। কর ফাঁকি রোধ, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভব হলে কর রাজস্ব বৃদ্ধি, বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে উন্নয়ন দ্রুততর করা সম্ভব হবে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী অর্থনীতির প্রথম মডেল

বর্তমান যুগে ইসলামী অর্থনীতি কি রূপ নেবে তা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদার আমলে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল, তাকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মদিনার জীবনের শেষ দিকে এমন একটি অর্থনীতি কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা কুরআনের শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সে অর্থনীতি জাহেলিয়াতের যুগের সব অন্যায়, অত্যাচার ও বেইনসাফী হতে মুক্ত ছিল এবং সে কাজটি রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে করেছিলেন– যিনি আল্লাহপাকের দ্বারা তখন সতত পরিচালিত হতেন। সে অর্থনীতির ভিত্তি ছিল ইসলামী সুবিচার।

মক্কার জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি প্রচার করেছিলেন। একটি সমাজ ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ তখন তিনি পাননি। মদিনার জীবনের প্রথমদিক অতিবাহিত হয়েছিল আত্মরক্ষা ও সমাজকে ধীরে ধীরে অনৈসলামী জাহেলী রীতি-রেওয়াজ হতে পবিত্র করার কাজে। সুতরাং মদিনার জীবনের শেষদিকে যে অর্থনীতি ও বণ্টনব্যবস্থা চালু ছিল, তাকেই আমরা ইসলামী অর্থনীতির প্রথম মডেল বলে ধরে নিতে পারি।

এ মডেলটিই খোলাফায়ে রাশেদার আমলে সুসামঞ্জস্য ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এ যুগে ইসলামী অর্থনীতির একটি সঠিক মডেল তৈরি করার জন্য যেসব মূলনীতি ও নজীর দরকার তা আমাদেরকে কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাথমিক যুগের ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল হতে গ্রহণ করতে হবে। কেননা, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার আলোকে আজকের যুগের উপযোগী অর্থনৈতিক একটি মডেল তৈরি করা – নিজেদের মনগড়া মতবাদকে ইসলামের উপর চাপিয়ে দেয়া নয়।

মদিনায় যে নতুন অর্থনীতি কায়েম করা হয়েছিল তাতে প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করার অধিকার ছিল। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই স্বাধীনভাবে ব্যবসা, কৃষি, পশুপালন ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ছিল। উৎপাদন কার্য স্বাধীনভাবে চলত। কৃষকরা ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করতে পারতো।

www.nagorikpathagar.org

তারা নিজেরাও পরিশ্রম করতো এবং প্রয়োজনবোধে মজুরও নিয়োগ করতো। ইতিহাসে অনেক সাহাবির মজুরির বিনিময়ে কাজ করার উদাহরণ রয়েছে। পেশার স্বাধীনতার কথা অবশ্য কুরআন মজীদেও স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে" (আয়াত ২৭৫) এবং সূরা জুমআতে রয়েছে, "তোমরা নামাজ শেষে দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকা অনুসন্ধান করো (আয়াত ১০)।"

বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকেরা তাদের উৎপাদিত খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য বাজারে নিয়ে আসতেন। যাদের এসব দ্রব্যের প্রয়োজন হতো তারা বাজার থেকে এসব দ্রব্য খরিদ করে নিতেন। সাধারণত যোগানের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করা হতো না। তেমনিভাবে চাহিদার উপরও হস্তক্ষেপ করা হতো না। কোনো মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হতো না। যোগান ও চাহিদার পরিস্থিতির উপর মূল্য নির্ভর করতো।

অবশ্য যোগান ও চাহিদাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করাও নিষিদ্ধ ছিল। যেমন মজুতদারী নিষিদ্ধ ছিল, যাতে যোগানের উপর খারাপ প্রভাব না পড়ে। একবার হযরত ওমর (রা.) এর সময় এক ব্যবসায়ী বাইরে থেকে অনেক ঘোড়া এনে মদিনায় রাখতে শুরু করেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে ঘোড়ার খাবার মদিনার বাইরে থেকে না আনা পর্যন্ত এসব ঘোড়াকে মদিনার অভ্যন্তরে রাখতে নিষেধ করে দেন। ফলে সে ব্যবসায়ী ঘোড়ার খাবার মদিনার বাইরে থেকে আনার ব্যবস্থা করেন।[১] এ থেকেও স্পষ্ট হয় যে, মদিনায় ঘোড়ার খাবারের চাহিদার উপর যেন হঠাৎ প্রভাব না পড়ে সে জন্যই তিনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এখানে এ কথাও উল্লেখ করা জরুরি যে, যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ না করাই ইসলামের নীতি, তথাপি যদি দ্রব্যমূল্য ইনসাফের সীমা অতিক্রম করে যায় এবং জুলুমের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তেমন অবস্থায় সরকার মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে।[২]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে অর্থনীতি গড়ে ওঠে তা ছিল ইসলামী শিক্ষার আওতাধীন এক স্বাধীন অর্থনীতি। উৎপাদন কার্যক্রম ও জীবিকা অর্জন সে অর্থনীতিতে স্বাধীনভাবে হতো। বাজারও ছিল সেখানে স্বাধীন এবং চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক প্রভাবে সেখানে শ্রম, দ্রব্য ও অন্যান্য সরবরাহের মজুরি ও মূল্য নির্ধারিত হতো। অর্থ বা বিনিময়ের মাধ্যমে এসবের লেনদেন চলতো। কিন্তু এ অর্থনীতি স্বাধীন অর্থনীতি হলেও তা অবাধ ছিল না।

এ অর্থনীতিকে তাই আধুনিক বা পুরোনো পুঁজিবাদের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্য কিছুতেই এক করে দেখা যেতে পারে না। কেননা যদিও বর্তমান পুঁজিবাদে কারো ঠিক নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা নেই, কিন্তু তাতে ব্যক্তির উপর আইনেরই নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত অপর্যাপ্ত; কাজেই সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা তাতে

www.nagorikpathagar.org

নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন, উপার্জন, ব্যয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই ব্যক্তির উপর অনেক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আধুনিক পুঁজিবাদে এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে উইল করে তার সম্পত্তি যেভাবে ইচ্ছা দিয়ে যেতে পারে। সে ইচ্ছা করলে সম্পত্তি যে কোনো একটি মাত্র সন্তানকে দিয়ে যেতে পারে, এমনকি অন্যান্য সন্তানদের বঞ্চিত করে প্রিয় কুকুরের ভরণপোষণের জন্যও দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইসলামে এ ধরনের স্বাধীনতার কোনো স্বীকৃতি নেই। এ ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি ইসলামী মিরাসী আইনের অধীন।

ব্যক্তিগত মালিকানা

এখন আমরা ইসলামের প্রাথমিক অর্থনীতিতে মালিকানা কি অবস্থায় ছিল তা বিচার করবো। এই অর্থনীতিতে প্রত্যেক ব্যক্তি বাড়ি, সাওয়ারী, অস্ত্র ও জমির মালিক হতে পারতো। সে জমিতে স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ করতে পারতো। ব্যক্তি জমি কিনতে ও বিক্রি করে দিতে পারতো। শিল্প সে সময় উন্নত পর্যায়ের ছিল না। কিন্তু কাপড় বোনা, অস্ত্র নির্মাণ, সাধারণ কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও অন্যান্য আসবাবপত্র শিল্প ব্যক্তিমালিকানার অধীনেই ছিল। এসব ব্যক্তিমালিকানার সুযোগে অনেকেই প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা.) ও আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রা.) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কাজেই ব্যক্তি মালিকানা সে সমাজে স্বীকৃত ছিল।

অবশ্য ব্যক্তি তার মালিকানাধীন চাষোপযোগী জমিকে পতিত রাখতে পারতো না। তাকে জমি চাষ করতে হতো। তিন বৎসরের বেশি কেউ কোনো জমি ফেলে রাখলে সরকার তা নিয়ে নিতো। এ সম্পর্কে হযরত ওমরের (রা.) বিশেষ আদেশ ছিল। কিন্তু কোনো ব্যক্তি সমাজের জন্য জরুরি কতকগুলো জিনিসের একক মালিক হতে পারতো না। যেমন – খনি, পশুপালন-ভূমি, জঙ্গল, নদী-নালা, কূপ ও পানির উৎস ইত্যাদি।

এখানে এ কথা পরিষ্কার করে দেয়া দরকার যে, ইসলামে কারো কোনো নিরঙ্কুশ মালিকানা নেই। মালিকানা এখানে আমানত মাত্র। কেননা কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে:

পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের সব কিছুর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।

(সূরা বাকারা: আয়াত ২৫৫)

পৃথিবীর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। (সূরা আল-আরাফ: আয়াত ১২৮)

ফকিহদেরও সম্মিলিত মত হচ্ছে যে, সেই মালিকানাই ন্যায়সংগত ও বৈধ যা শরিয়ত প্রণেতা দান করেছেন বা স্বীকার করে নিয়েছেন। মালিকানা স্বতঃসিদ্ধ নয় বরং শরিয়ত দাতার অনুমতিতে তা অস্তিত্বে আসে।[৩]

www.nagorikpathagar.org

বৈধ উপায়ে অর্জিত সব সম্পদের মালিকানা মদিনার অর্থনীতিতে স্বীকৃত ছিল। হারাম উপায়ে সম্পদ অর্জন করা ও তার মালিক হওয়া অবৈধ ছিল। অর্জন করা ছাড়াও দান ও মিরাসী পদ্ধতিতে ব্যক্তি সম্পত্তির মালিক হতে পারতো।

সুদহীন অর্থনীতি

মদিনায় সুদহীন অর্থনীতি চালু ছিল। কুরআন মজীদে দ্ব্যর্থহীনভাবে সুদকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে (সূরায়ে বাকারা)। মদিনার ব্যবসায়ীরা নিজের অর্থে ব্যবসা করতেন অথবা অন্যের নিকট থেকে লাভ-লোকসানে অংশীদার হওয়ার ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধনের ব্যবস্থা করতেন। লাভের অংশ ঋণদাতাকে দিয়ে দিতেন। শরীকানা ভিত্তিতেও ব্যবসা করা হতো। শরীকানা ব্যবসায়ে হয় দু'জনের পুঁজিই খাটানো হতো অথবা একজনের পুঁজি ও অন্যজনের শ্রম সংযুক্ত হতো এবং নির্দিষ্ট হারে লাভ-লোকসানের ভাগ করা হতো।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিনা সুদে একজন অন্যজনের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করতেন। সমাজের প্রয়োজন এ পদ্ধতিতে মোটামুটি মিটেও যেত, কেননা কুরআন মজীদে 'করজে হাসানা'কে উৎসাহিত করা হয়েছে।

মদিনার অর্থনীতিতে কোনো আধুনিক ধরনের ব্যাংক কায়েম ছিল না। এ কারণে আধুনিক অর্থনীতিতে সুদের যেসব খারাপ প্রভাব রয়েছে অথবা ব্যাংক মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তা মদিনার ইসলামী অর্থনীতিতে দেখা দেয়নি।

অর্থনীতি ও ব্যাংককে কি করে সুদমুক্ত করা যেতে পারে তা অবশ্য আলাদা করে আলোচনা করার বিষয়। এখানে শুধু একটি কথা উল্লেখ করা যায় যে, আধুনিক অর্থনীতিকে একবারে সুদমুক্ত করা হয়ত যাবে না, তবে অর্থনীতির এক-একটি অংশকে পর্যায়ক্রমে সুদমুক্ত করতে হবে।

মজুরের অধিকার

মদিনার অর্থনীতিতে মজুররা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতো। তারা কোনো বিশেষ ব্যক্তির অধীনে কাজ করতে বাধ্য ছিল না। যে কোনো ব্যক্তির অধীনে কাজ করা বা মালিক বদল করার ব্যাপারে তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতো। মদিনার সমাজে শ্রমিকদের মর্যাদাশীল নাগরিক মনে করা হতো। শ্রমিকদের মর্যাদা মালিকদের থেকে কম মনে করা হতো না। মদিনায় বসবাসকারী মুহাজিররা আনসারদের বাগানে কাজ করতেন কিন্তু মুহাজিরদের মর্যাদা এতে কোনো অংশে কমে যায়নি। বড় বড় সাহাবিরা, যারা পরবর্তীকালে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা হয়েছিলেন, অন্য মুসলমানের এমনকি মদিনার অমুসলিম ইহুদিদের নিকটও মজুরির বিনিময়ে কাজ করেছেন। মজুরদের সামাজিক মর্যাদা ইসলামের শিক্ষা হতেই মদিনার ইসলামী সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল। তাকওয়ার

www.nagorikpathagar.org

কারণে যে মর্যাদার পার্থক্য সৃষ্টি হয় তা ছাড়া অন্য কোনো কারণে ইসলাম মর্যাদার পার্থক্য স্বীকার করে না। কুরআন মজীদে ইরশাদ করা হয়েছে:

> তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট তারাই অধিক সম্মানিত যারা অধিক তাকওয়াশীল। (সূরা হুজরাত: আয়াত ১৩)

নবী করিম (সা.) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন: "তারা (শ্রমিকরা) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন। ... তোমরা যা খাবে, তাই তাদের খেতে দেবে। যা পরবে তাদেরকে তাই পরতে দেবে। আর যে কাজ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর, তা করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করবে না।"[৪]

কাজেই মদিনার সমাজে মজুরদের ভাই বলে গণ্য করা হতো। সেখানে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হতো না। উপরন্তু তাদের তৎকালীন পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত মজুরি প্রদান করা হতো। মজুরি সময়মতো পরিশোধ করা হতো। মজুরি কাজে নিযুক্ত করার পূর্বে নির্ধারিত হতো। এ ব্যাপারে নবী করিমের (সা.) আদেশ হচ্ছে:

ক. মজুরের মজুরি তার ঘাম শুকাবার পূর্বে আদায় কর।[৫]

খ. মজুরকে মজুরি নির্ধারণ না করে কাজে নিয়োগ করবে না।[৬]

আজকের দিনেও মজুরের মর্যাদা, অধিকার ও স্বার্থরক্ষা করার জন্য ইসলামী সরকারকে বিস্তারিত আইন রচনা করতে হবে, যাতে ইসলামের নির্দেশগুলো সঠিকভাবে পালিত হয়। এখানে এ কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদিও ইসলাম শ্রেণি-সংগ্রাম সমর্থন করে না, তবুও তার অর্থ এ নয় যে সমাজের ভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন শ্রেণির (যেমন বাড়িওয়ালা বনাম ভাড়াটিয়া অথবা মালিক বনাম শ্রমিক) মধ্যে যে স্বাভাবিক সংঘাত রয়েছে, তাকে অস্বীকার করতে ইসলাম শিক্ষা দেয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, এসব সংঘাতের মধ্যে ইনসাফ সহকারে মীমাংসা করে দেয়া। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে:

> যখন বিশ্বাসীদের মধ্যে দুই দল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন তাদের মধ্যে ইনসাফের ভিত্তিতে মীমাংসা করে দাও। (সূরায়ে হুজরাত: আয়াত ৯)

করব্যবস্থা

মদিনার অর্থনীতিতে ওশর, খারাজ, যাকাত, বাণিজ্যশুল্ক – এগুলো ছিল প্রধান সরকারি আয়। মুসলমানদের অধিকারভুক্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়। বৃষ্টি বা ঝর্ণায় সিক্ত ভূমি হতে ফসলের এক-দশমাংশ ও যেসব জমিতে অন্যভাবে সেচ দিতে হয় তা থেকে বিশ ভাগের একভাগ ফসল ওশর হিসেবে নেয়া হতো। অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগাধিকারভুক্ত জমি হতে খারাজ আদায় করা হতো। জমির গুণাগুণ ও উর্বরতার ভিত্তিতে খারাজ নির্ধারণ

www.nagorikpathagar.org

করা হতো। নগদ অর্থ, ব্যবসাপণ্য, স্বর্ণ-রৌপ্য, প্রয়োজনাতিরিক্ত পশু ইত্যাদি সম্পদের উপর হতে যাকাত আদায় করা হতো।

মদিনার অর্থনীতিতে যাকাত ও অন্যান্য খাত হতে পর্যাপ্ত আয় হতো এবং তাতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয়ের চাহিদা মিটে যেত, তাই এসব খাতে অতিরিক্ত কর ধার্য করার কোনো প্রয়োজন তখন দেখা দেয়নি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এসব খাতে অতিরিক্ত কর ধার্য করার অধিকার ইসলামী সরকারের রয়েছে। হযরত ওমর ফারুক (রা.) আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করেছিলেন।[৭] পরবর্তী ইমামরাও যেমন ইমাম শাতিবী ও ইমাম ইবনে হাজম সরকারের অতিরিক্ত কর ধার্য করার আইনগত অধিকার স্বীকার করেছেন।[৮]

মদিনার অর্থনীতির উপর কড়া নজর রাখা হতো যাতে আদল-ইনসাফ কায়েম থাকে ও কোনো জুলুম হতে না পারে। আল মাওয়ার্দী তাঁর বিখ্যাত বই 'আল-আহকামুস সুলতানীয়া'তে লিখেছেন, "ইসলামী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব মারুফকে কায়েম করা ও মুনকারকে বন্ধ করে দেয়া। এ হচ্ছে একটি সামগ্রিক ফরয, যা জীবনের প্রতিটি দিকের সাথে সম্পর্কিত। এ ফরয আদায় করার জন্য ইসলামী সরকারসমূহ বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকে এবং ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইসলামী সরকারসমূহ 'হিসবা' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছিল।"[৯]

হযরত ওমর ফারুক (রা.) এ কাজ নিজেই করতেন। তিনি বাজারের উপর সর্বক্ষণ নজর রাখার জন্য আবদুল্লাহ বিন ওতবাকে নিয়োগ করেছিলেন।[১০]

কাজেই স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মদিনার অর্থনীতির উপর সব সময়ই কড়া নজর রাখা হতো এবং কোনো অবিচার যাতে না হতে পারে তা নিশ্চিত করা হতো। হযরত ওমর (রা.) একবার বাজারে নিজে পানি মেশানো দুধ দেখতে পেয়ে তা মাটিতে ঢেলে দিয়েছিলেন যাতে ভেজাল প্রতিরোধ করা যেতে পারে।[১১]

ওপরে মদিনা ও আরব দেশে কায়েম করা ইসলামী অর্থনীতির প্রথম মডেলটির চিত্র তুলে ধরা হলো। আজকের যুগেও নতুন করে ইসলামী অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে তার মূলনীতি মদিনার মডেল থেকে গ্রহণ করতে হবে। এ অর্থনীতি কুরআনের আলোকে রসূলুল্লাহ (সা.) ও মহান খোলাফায়ে রাশেদার হাতে গড়ে উঠেছিল। তাঁদের চেয়ে বেশি ভালো করে কেউ ইসলামকে বুঝতে পারেন না বা তাদের চেয়ে বেশি ইনসাফ ও জনকল্যাণ করার কথা কেউ ধারণাও করতে পারেন না, ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি ও তার প্রতিষ্ঠা করার যারা চিন্তা করেন তাদের একথা মনে রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

তথ্যসূত্র:

১. তাবারী।

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল হিসবা ফিল ইসলাম।

৩. শেখ আবু জোহরা: আল মিলকিয়াত ও নজরিয়া ফি শরীয়া আল ইসলামিয়া।

৪. বুখারী, কিতাবুল ঈমান।

৫. ইবনে মাজাহ, বায়হাকী।

৬. বায়হাকী।

৭. আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ১৬১।

৮. শাতিবী, আল ইতিসাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৯৫, ইবনে হাজম, আলমুহাল্লা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৬ এবং ইউসুফ আল কারজাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ২য় খণ্ড।

৯. আল মাওয়ার্দী: আল-আহকামুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা - ২০৭।

১০. মুয়াত্তা ইমাম মালিক: কিতাবুজ যাকাত, কনজুল উম্মাল, তৃতীয় খণ্ড, ২৬৫২ নং রেওয়ায়েত।

১১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া: আল হিসবা ফিল ইসলাম।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী অর্থনীতি ঃ প্রয়োগ ও বাস্তবতা

ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয়, এটা কোনো নতুন অর্থনীতি নয়। এর মূল ভিত্তি রয়েছে কুরআনুল করীমে - যা চৌদ্দশত বছর আগে নাযিল হয়েছিল। এর অপর মূল ভিত্তি রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষায়। আর এর প্রয়োগও শুরু হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় গিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করেন। সেখানে বিভিন্ন জাতির লোকেরা ছিল। বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা ছিল। রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী ছিলেন - একই সাথে তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন। সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো। তাঁর আমলে তাঁরই নির্দেশনায় সে দেশের অর্থনীতিসহ সবকিছু পরিচালিত হচ্ছিল। তখন থেকেই স্বাভাবিকভাবে মদিনা রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ শুরু হলো।

তিনি যে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পেয়েছিলেন তাতে দেখলেন তার মধ্যে কিছু ব্যবসা জুলুমমূলক। সেগুলো সুবিচারমূলক নয়। সেগুলোকে তিনি বাতিল করে দিলেন (যেমনঃ মুলামাসা এবং মুনাবাদা, দ্রষ্টব্য - বুখারী, কিতাবুল বাই)। তেমনি কৃষির ক্ষেত্রেও কিছু ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ থাকায় তিনি তাও বাতিল করে দেন। তিনি অনেক উৎপাদনকে বাতিল করে দেন। যেমন সে দেশে মদ উৎপাদন করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি কিছু পেশাকেও অবৈধ ঘোষণা করলেন। জুয়া খেলা সেখানে যেমন সম্ভব ছিল না তেমনি অশ্লীল কোনো দ্রব্য উৎপাদনও সম্ভব ছিল না। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই শুর হলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ দিকে এসে সুদ সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হয়ে যায়। তখন সুদমুক্ত একটি অর্থনীতি এসে যায় - যার মূল ভিত্তি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। তখন থেকেই ব্যক্তিমালিকানা কিংবা শরীকানায় ব্যবসা হতো। শরীক মালিকানায় লাভ-লোকসানকে ভাগ করে নেয়া হতো। কিংবা একজনের মূলধন হলে অন্যজনের শ্রম হতো - যাকে মুদারাবা

www.nagorikpathagar.org

(Mudaraba) বলা হয়। সেই ব্যবস্থাতেও লাভ বা লোকসান ভাগ করে নেয়া হতো। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই উমাইয়া (এর সময় প্রায় একশ' বছর) এবং আব্বাসীয় (প্রায় সাত-আটশ' বছর)-এই সম্পূর্ণ যুগে ইসলামী অর্থনীতি চালু ছিল। এখানে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না - উমাইয়াদের শাসন ব্যাপক এলাকায় ছিল। উত্তর আফ্রিকাসহ ভারতের একটা অংশ তাদের অধীনে ছিল। মধ্য এশিয়া ও গোটা মধ্যপ্রাচ্যও তাদের অধীনে ছিল। পরবর্তীতে আব্বাসীয়দের আমলে এটা আরো বিস্তার লাভ করে। কাজেই সেটা ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বড় শক্তি (Greatest super power)। তারা ছিল তখনকার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রশক্তি, আন্তর্জাতিক শক্তি এবং সামরিক শক্তি।

আমরা জানি, সেই সময়ে অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছিল। শিল্পের, ব্যবসার, যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছিল। শিক্ষা, সাহিত্যের উন্নয়ন হয়েছিল। স্থাপত্যের উন্নয়ন হয়েছিল। সুতরাং বলা যায়, তারা একটি উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। তাদের সে রাষ্ট্রেরও আইনগত ভিত্তি ছিল ইসলামী শরীয়ত। সেই রাষ্ট্রের বৈধতার (Legitimacy) ভিত্তি ছিল ইসলাম বা আল কুরআনুল করীম। কাজেই সেই রাষ্ট্র ইসলামী অর্থনীতিকে ফলো করছিল।

এখন ইসলামী অর্থনীতি বলতে কি বোঝায়? সেই যুগে যে প্রযুক্তি (Technology) ছিল সেটাই কি ইসলামী অর্থনীতি? নাকি অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের যে শিক্ষা, ইসলামের যে লক্ষ্য এবং ইসলামের যে মূল্যবোধ সেগুলোকেই কার্যকর করা হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি? আবার ইসলামী অর্থনীতির প্রশ্নে বলা যায় - কি অর্থে সেখানে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ করা হয়েছিল। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, টেকনোলজিই ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা নয়। কারণ টেকনোলজি যুগে যুগে পরিবর্তন হয়ে যায়। তেমনিভাবে যে ব্যবসায় সংগঠন (Business organization) - সেটাও মূল কথা নয়। আজকের দিনে আমরা করপোরেশন (Corporation) দেখছি, যেটা আগের দিনে ছিল না। এই করপোরেশন সিস্টেম মাত্র একশ'-দুইশ' বছর আগে এসেছে। অর্থাৎ বোঝা যায় যে, ব্যবসা সংগঠনের শেপ (Shape) কি বা কি পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসাকে বা প্রতিষ্ঠানটিকে সংগঠিত করা হয়েছে - সেটা মূল জিনিস নয়। মূল জিনিস হলো কোন জিনিসে ব্যবসা করা বৈধ আর কোন জিনিসে ব্যবসা করা বৈধ নয়। কোন পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ আর কোন পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ নয়।

কাজেই আমরা যখন ইসলামী অর্থনীতির কথা বা এর প্রয়োগের কথা বলছি তখন আমরা বোঝাচ্ছি তার নীতিগুলোকে, তার মূল্যবোধ, তার লক্ষ্য কি। সে কি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন চাচ্ছে - এই ভিত্তিতে আমরা এই বিষয়টিকে দেখছি।

আজকের দিনে যে ইসলামী অর্থনীতি হবে, সেখানে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা হবে। নতুন যে বিজনেস অর্গানাইজেশন, যেমন আগে উল্লেখিত করপোরেশন

www.nagorikpathagar.org

অথবা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ (Joint stock companies) - এগুলো সেখানে থাকবে। এখানে শেয়ার (Share) ব্যবস্থা থাকবে। আগের দিনে শেয়ারের ধারণা ছিল না। বাস্তবে বিভিন্ন মালিকানা থাকলেও তখন শেয়ার সার্টিফিকেট ছিল না, শেয়ারের ভিত্তিতে মালিকানা ভাগ করা হতো না, এগুলো সবই গ্রহণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা জানি ওআইসি'র (OIC) ফিকাহ একাডেমি এগুলোকে বৈধ ঘোষণা করেছে। শ্রেষ্ঠ আলিম দ্বারা সকল যুগেই এসব অর্গানাইজেশন, নতুন টেকনোলজি বা শেয়ার সার্টিফিকেট (যদি তা বৈধ ব্যবসার হয়) - তাকে তারা বৈধ ঘোষণা করেছেন।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে এখন যদি আমরা এর ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য করি - যেমন এখানে এতক্ষণ যা আলোচনা করা হলো - তাহলে আমরা দেখতে পাব ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর হয়েছিল। আর এটা এই জন্যেই সম্ভব হয়েছিল যে, ইসলামের যে যাকাত ব্যবস্থা এবং ইসলামের ওয়াকফ'র যে ব্যবস্থা তার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা সহজ। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি প্রধানত সরকারি ছিল না। এটা একদল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা সংগঠিত ছিল। ইসলামী অর্থনীতি যেহেতু অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশে বিশ্বাস করে, মানুষের যে উদ্ভাবনী শক্তি তার উপর বিশ্বাস করে, মানুষের যে যোগ্যতা (Capacity) তার উপর বিশ্বাস করে এবং যেহেতু ইসলাম মানুষকে প্রয়োজনীয় কিছু বিধি-নিষেধের আওতায় স্বাধীনতা দেয়, ফলে সে অর্থনীতি সাধারণত বিকাশমান হয়। অগ্রগতিমুখী হয়। সে কারণেই অর্থনীতি তখন উন্নতি করেছিল। আর অর্থনীতি উন্নত করার কারণে দারিদ্র্য কম ছিল।

একইভাবে তখন ইসলামী অর্থনীতির জন্যে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটে। ইন্ডাস্ট্রিজ ফ্লারিশ (Flourish) করেছিল। তখন দারিদ্র্য খুব কমই দেখা দেয় এবং যাও দেখা দিয়েছিল তা প্রাকৃতিক কারণে, দুর্ভিক্ষ (Famine) দেখা দেয়ায়। দেখা গেলো কোনোখানে বৃষ্টিপাত হয়নি। আর এসব কারণে যেখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা সাধারণত সরকার তার রাজস্ব ব্যবহার করে, তার বায়তুল মালের অর্থ দ্বারা সেটাকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে এবং তা করেছে। আর এ ধরনের পরিস্থিতির কথা যদি আমরা বাদ দেই তাহলে সাধারণভাবে যে পরিস্থিতি ছিল তাতে যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তখন খুব কম লোকই গরীব ছিল। কিন্তু যারা ধনী তাদের (অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে) প্রচুর অর্থবিত্ত ছিল। তাদের যাকাত হতো। মুসলিম ইতিহাসে এমন অনেক সময় গেছে যখন যাকাত দেয়ার মতো তারা লোক পেতেন না।

এরপর ওয়াকফ'র কথা যদি বলি তাহলে বলব ইসলামে দানকে, ইনফাক ফি সাবীলিল্লাহ - আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ফলে সকলেই চাইতেন কিছু সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে ওয়াকফ করে দিতে। এই

www.nagorikpathagar.org

ওয়াকফ'র আয় থেকে শুধুমাত্র ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলত বা আমরা যাকে সরাইখানা বলি (অর্থাৎ তখনকার পথিক বা আগন্তুকদের জন্য যে মেহমানখানা) তা চলত - যা সরকার চালাতেন। তখন প্রায় সবখানেই সরাইখানা করা হতো। এইসব ওয়াকফ'র আয় দ্বারা ছাত্রদের বেতন দেয়া হতো। দরিদ্রদের সাহায্য করা হতো। তাদের বৃত্তি দেয়া হতো। এমনিভাবে সার্বিক অভাব মুসলিম বিশ্ব থেকে দূর করা সম্ভব হয়েছিল। তখন মুসলিম বিশ্বের কোনো ব্যক্তি অভাবী ছিলেন বা দরিদ্র ছিলেন বা না খেয়ে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে - এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। কিংবা বলা যায় ঘটেনি, বিশেষ করে উমাইয়াদের আমল থেকে শুরু করে কলোনিয়াল (Colonial) ব্যবস্থার উত্থানের আগ পর্যন্ত।

ইসলামে যাকাত এমন একটি ব্যবস্থা যা কঠিন দারিদ্র্য (Hardcore poverty) দূর করতে সক্ষম। এর মূল কারণ হলো বর্তমানে আমাদের কিংবা বিভিন্ন দেশে যে এনজিওগুলো (NGO) তারা যে স্বল্প ঋণ দেয় (যদি টাকার হিসেবে বলি, পাঁচ হাজার বা দশ হাজার এরকম) আর তা তাদেরকে এক বছর, ছয় মাস, তিন মাস, এমনি করে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ফেরত দিতে হয়। এ সমস্ত স্বল্প আয় থেকে ঋণ ফেরত দেয়া এবং তার উপর আবার বাড়তি সুদ ফেরত দেয়া - যেটা এনজিওরা চায় তা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় না। এ জন্য এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচন করতে বিশেষ করে (Hardcore poverty) দূর করতে পারে না।

কিন্তু ইসলামে যে যাকাত ব্যবস্থা, সেটা হলো প্রকৃতপক্ষে ট্রান্সফার (Transfer), এটা একবারে দিয়ে দেয়া হয়; এটা আর ফেরৎ নিতে হয় না। এ প্রসঙ্গে আমাদের স্কলাররা বলেছেন, যাকাত এমন পরিমাণ দিতে হবে যাতে যাকাতগ্রহীতা স্বাবলম্বী হয়ে যায়। অধিকাংশ ফিকাহবিদ এ কথাই বলেছেন যে, এমনভাবে দিতে হবে যাতে তাকে আর কারো কাছে যেতে না হয়। অর্থাৎ স্বাবলম্বী করে দাও, কিংবা অন্তত এই পরিমাণ দাও যাতে এক বছর আর তার কাছে ফিরে আসতে না হয়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি তার বাস্তব প্রয়োগের কারণেই তখন কঠিন দারিদ্র্য (Hardcore poverty) দূর করা সম্ভব হয়েছিল। এখনও যদি মুসলিম বিশ্ব দারিদ্র্য দূর করতে চায় তাহলে যাকাতকে এবং যাকাতের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের ট্রান্সফারের মাধ্যমেই এই কাজটি করতে হবে।

এক্ষেত্রে এনজিওদের প্রতি আমার পরামর্শ হবে - এনজিওরা যেভাবে করছে তার মাধ্যমে হবে না। তাদের মধ্যে ট্রান্সফারের একটা উপাদান (Element) থাকতে হবে। ইসলামের দাবী এটা যে, তারা সুদভিত্তিক কোনোকিছু না করুক। তারা সেটাকে মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ করে ইসলাম ভিত্তিতে করুক। এটা তারা সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে করতে পারে। তাতে তাদের লাভ হবে না কিন্তু তাদের খরচ উঠে আসবে। এখানে সার্ভিস চার্জ হলো, যে পরিমাণ দিয়েছি তার উপর এত পরিমাণ নেয়া যাতে তার প্রশাসনিক

www.nagorikpathagar.org

খরচ (Administrative cost) আদায় হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে এক পয়সাও বেশি নিলে তা সুদ বলে গণ্য হবে। এটাই হলো ওআইসির ফিকাহ একাডেমির ফতোয়া বা ঘোষণা বা রুলিং।

এনজিওগুলোর উচিত হবে সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে করা - সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর যেটা করতে হবে সেটা হলো এই ধরনের ঋণের সাথে ট্রান্সফারকে একত্র করা। কথা উঠতে পারে, যদি দান বা অনুদান দেই তাহলে সেটা তারা খেয়ে ফেলতে পারে। তারা সেটা ফেরত দেবেও না বরং খেয়ে ফেলবে, তাতে কাজ হবে না। এই সমস্যাগুলো রয়েছে। আর এটা যে হতেও পারে তা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের মধ্যে স্বভাব খারাপের জন্যে এরকম পরিস্থিতি হতে পারে। কিন্তু তথাপি আমাদের ভালো সুপারভিশনের মাধ্যমে এই পদ্ধতি সার্থক করার চেষ্টা করতে হবে, অন্য পদ্ধতিতে হবে না।

যাকাতের ব্যাপারে আইন কি হবে তার একটা স্ট্রাকচার আমরা ইতোমধ্যে পাকিস্তানে পেয়ে গেছি। সেদিক থেকে যাকাতের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। যদিও সরকারি পর্যায়ে আদায়ের ব্যাপারটি এখনো ভালো করে গড়ে ওঠেনি। আদায় এবং বন্টনের ক্ষেত্রে সেটাকেই এখন গড়ে তুলতে হবে। এটা সামাজিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমেও হতে পারে। রাষ্ট্র যদি বলে দেয় আমরা এই অংশটুকু পর্যন্ত আদায় করব, বাকীটা জনগণ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে আদায় করবে। সেটাও সম্ভব, একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। যদিও সেটার অনেক আইনগত বা শরীয়ত সংক্রান্ত দিক রয়েছে। সেগুলো পরীক্ষা করে আমাদেরকে দেখতে হবে। যদিও এটা বড় কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না (যাকাত সম্পর্কে দ্রষ্টব্য - ইসলামে যাকাতের বিধান, ড. ইউসুফ আল কারযাভী)। আগে একসময় ছিল যাকাত মানুষ একদম দিত না। এখন যারা ব্যবসায়ী, যারা শিল্পপতি তারা যাকাতের জ্ঞান উপলব্ধি (Awareness) বা প্রকৃতি (Nature) সম্পর্কে বুঝে গেছে। ফলে ভালো লক্ষণ হলো যারা এটা জানে তাদের অধিকাংশই এখন যাকাত দেন। তারা যতটুকু বোঝেন ততটুকুই দেন। এ ক্ষেত্রে তাদের উপলব্ধি আরো ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। আলিমদের দায়িত্বও অনেক। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, আলিমরা অনেক পুরোনো বই পড়েছেন কিন্তু তাঁদের আধুনিক বইও পড়া প্রয়োজন।

'ইসলামে যাকাতের বিধান' - আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভীর এই বইটি পড়লে দেখা যায় যে, যাকাত কত বড় মাধ্যম এবং এর মাধ্যমে বিশ্বের কত সমস্যার সমাধান করা যায়। অর্থনীতির কত সমস্যার সমাধান করা যায়।

হাজার বছর মুসলিম শাসনের পর মুসলিম শাসনের পতন হলো। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়লাম। তারই ফলে আমরা সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়লাম। জ্ঞানের সাথে সাথে সামরিক ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়লাম। কারণ মিলিটারী হার্ডওয়ার বা এর যে সুপিরিয়রিটি - তার পেছনে রয়েছে নলেজ। আবার

www.nagorikpathagar.org

টেকনোলজী তারও পেছনে রয়েছে নলেজ। এই জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণে আমরা সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়লাম। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো (Colonial power) জোর করে আমাদের দেশ দখল করার সুযোগ পেয়ে গেল। আর তারা আমাদের দেশে এসে দুনিয়ার যত অবৈধ ব্যবসা সম্ভব তা শুরু করল। মদের ব্যবসা শুরু করল। আবার অন্যান্য সুদভিত্তিক কাজ কারবার চালু করল। পরবর্তীকালে সুদভিত্তিক ব্যাংক চালু করল। ফলে এই কলোনিয়াল প্রভাবের কারণে মুসলিম বিশ্ব ইসলামী অর্থনীতি থেকে অনেকটা দূরে সরে গেল। ব্যক্তিগত জীবনে তারা মুসলিম থাকল। যতটা সম্ভব ইসলামী কালচার থাকল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে অনৈসলামিক উপাদান বাড়তে লাগল।

এরপর আবার ইসলামের নব উত্থান ঘটে। The new rise of Islam- ইসলামের নতুন করে জাগরণ শুরু হলো। সেটা ঘটে গত একশ' বছর আগে। এরপর পঞ্চাশ ষাট বছর আগে বিভিন্ন দেশ স্বাধীন হতে থাকে। পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হলো। আস্তে আস্তে মুসলিম দেশগুলো স্বাধীন হলো। সবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীন যে সব মুসলিম দেশ ছিল তা স্বাধীন হয়ে গেল। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে বহু লোকই ইসলামের জন্য কাজ করতে লাগলেন। ইসলামী আন্দোলনের উত্থান হলো। তারা ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন এবং নতুন করে ইসলামী আইন (Legislation) লেখা শুরু হলো। পাকিস্তানে অনেক ধরনের আইন হলো - যাকাতের উপর, উশরের উপর। এমনকি তারা নতুন প্যানাল কোড করলেন। সাক্ষ্য আইন (Evidence Act) করলেন। অন্যান্য আইনে ইসলামী ধারা সংযোজন করলেন। ইসলামী কন্সটিটিউশন করলেন। এভাবে ইরান, সুদানে একই ব্যাপার হলো। আবার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াতে কিছু হলো। এভাবে সকল মুসলিম দেশে কিছু না কিছু ইসলামী আইন হতে লাগল। বাংলাদেশেও কিছু হলো। শাসনতন্ত্রে কিছু ইসলামী ধারা যোগ হলো। যাকাত অর্ডিন্যান্স হলো। এর ফলাফল স্বরূপ ইসলামী ব্যাংকিং শুরু হলো। অর্থনীতির সবচেয়ে বড় একটা উপাদান বা টুল হচ্ছে ব্যাংকিং। এই ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেই অর্থের (Money) আদান-প্রদান হয় এবং এরই মাধ্যমে অর্থনীতি গড়ে ওঠে। আমরা যদি ইসলামী ব্যাংকিংকে এগিয়ে নিতে পারি, ইসলামী ব্যাংকিং যদি জাতীয় ব্যাংকিং সিস্টেম হয়ে যায় তাহলে সুদ অটোমেটিক উঠে যাবে। আবার সুদের উপর মানুষের এমনিতেই আস্থা নেই। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, মুসলিমরা সুদ চায় না, বাধ্য হয়েই সুদে জড়ায়।

ইসলামী ব্যাংকিং যদি সাকসেসফুল হয়, অনেক দেশে ইসলামী ব্যাংকিং মেজর ফ্যাক্টর হয় অথবা অধিকাংশ ব্যাংক ইসলামিক হয়ে যায় তাহলে সুদ ক্রমে দূর হয়ে যাবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

নতুন যুগে এই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যে প্রয়োগ শুরু হলো তা ইসলামী অর্থনীতিতে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। প্রায় সকল মুসলিম দেশেই

www.nagorikpathagar.org

এখন ইসলামী ব্যাংক হয়ে গেছে। প্রায় তিনশ'র বেশি ইসলামী ব্যাংক তাদের অনেক শাখা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। এই ব্যাংকগুলো আরো ব্যাপক হচ্ছে। এতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং সফল হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা করছে। এছাড়াও তারা ইসলামের যে সামাজিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যাবলী (Socio-economic objectives) তা কার্যকর করার জন্য চেষ্টা শুরু করেছে।

এসব লক্ষ্যের মধ্যে আছে মানুষের প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে হবে, সুবিচার করতে হবে এবং তা যদি করতে হয়, মানুষের চাহিদা পূর্ণ করতে হয় তাহলে অনেক কিছুই আমাদের করতে হবে। এরমধ্যে অন্যতম একটা হলো পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full employment)। অর্থনীতিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে মানুষের পূর্ণ কর্মসংস্থান হয়। কর্মসংস্থান হলে আয় হবে আর আয় হলে তাদের চাহিদা পূর্ণ হবে। আমরা যদি তাই কাজের বা নিয়োগের ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আয় হবে না -আর আয় না হলে চাহিদাও অপূর্ণ থেকে যাবে, প্রয়োজনও পূর্ণ হবে না। মানুষ সমাজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে আর সেটা ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য নয়। ইসলামী অর্থনীতি চায়, যেসব লোক কোনোভাবেই কাজ জোগাড় করতে পারছে না (যেমন সে অসুস্থ বা অতি বৃদ্ধ বা বিধবা এরকম অন্যান্য অসুবিধা যাদের আছে) সেসব ব্যক্তিকে তার পরিবার প্রথমত চালাবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় আত্মীয়-স্বজন তারাও করবে। আর যদি তা না করতে পারে, তাহলে তা রাষ্ট্র করবে। এছাড়া ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে রোজগার করবে, ভালো রোজগার করবে। অর্থনীতিতে সফল হতে হবে। সে রোজগার করতে পারবে এবং সেই রোজগারের ভিতর তাকে চলতে হবে।

এসব করতে গেলে আজকের যুগে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে রুরাল ইকোনমি (Rural economy) গড়ে তুলতে হবে। কারণ জনগণের একটা বিরাট অংশ, কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে আশিভাগ - গ্রামে বাস করে। কোথাও ষাট ভাগ আবার কোথাও ত্রিশ বা চল্লিশ ভাগ গ্রামে বাস করে। আরব দেশের কোথাও দশ বা বিশ ভাগ গ্রামে বাস করে। পাকিস্তানে ষাট বা পঁয়ষট্টি ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রে সত্তর ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। এসব কারণে আমাদের রুরাল অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হবে। আমাদেরকে গ্রামীণ অর্থনীতি; এগ্রিকালচারকে গড়ে তুলতে হবে। শুধু ইন্ডাস্ট্রি করলে চলবে না। ইন্ডাস্ট্রি করতে হবে কিন্তু কৃষিকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে, যাতে গ্রামীণ জনগণের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা উন্নত হতে পারে।

তেমনিভাবে শহরাঞ্চলকে যদি সামনে রাখি তাহলে বড় ইন্ডাস্ট্রি তো করতেই হবে। সাথে ছোট ইন্ডাস্ট্রিও করতে হবে। কারণ ছোট ইন্ডাস্ট্রি করতে পারলেই বেশি কর্মসংস্থানকে নিশ্চিত করা যায়। সেই সাথে আত্মকর্মসংস্থানের

www.nagorikpathagar.org

(Self employment) সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এগুলো ব্যাপকভাবে করতে হবে। এসব কাজ বিভিন্ন এনজিও করতে পারে। সমাজ সাহায্য করতে পারে। আমরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারি। ব্যাংকিং সিস্টেমের একটি অংশ এ কাজে ব্যয় হতে পারে। সরকারও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

এভাবে আমরা ইসলামের সামাজিক লক্ষ্যগুলো - নীড ফুলফিলমেন্ট (Need fullfilment), জাস্টিস (Justice) যদি করতে পারি তাহলেই একটা সংঘাতমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে।

ইসলামী অর্থনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। আমাদের দেশেই শুধু নয়, প্রত্যেক মুসলিম দেশেই যারা সমাজ চালাচ্ছেন - তাদের মধ্যে ইসলামের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এগুলোকে দূর করতে হবে। মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা কারণে, নানা ভীতি রয়েছে - যেহেতু ইসলাম খুব কঠিনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সে ভীতিগুলো দূর করতে হবে। তাহলেই আমাদের যে এলিট শ্রেণি, উচ্চ শ্রেণি বা সবচেয়ে শিক্ষিত শ্রেণি, তারা ভয়মুক্ত হবে। তারা তখন ইসলামের প্রয়োগের ব্যাপারে আগ্রহী হবে।

তেমনিভাবে পাশ্চাত্য এ ব্যবস্থা চায় না - সে সমস্যাও রয়েছে। আবার তারা তাদেরটা বাদ দিয়ে আমাদেরটাই বা চাইবে কেন? সে ক্ষেত্রেও সমাধান কঠিন। কিন্তু আমরা যদি যোগ্য হয়ে উঠি - আমরা যদি আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, আমরা যদি সবাই শিক্ষিত হয়ে যাই, আমরা যদি আমাদের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে পারি; আমরা যদি আমাদের সম্পদকে (Resource) ব্যবহার করতে পারি তাহলে পাশ্চাত্যের কাছে আমরা তত দায়বদ্ধ থাকব না। আর আমরা যদি তাদের কাছে দায়বদ্ধ না থাকি তাহলে পাশ্চাত্যের সাথে সংঘাত না করেও আমরা আমাদের পদ্ধতি ফলো করতে পারবো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা স্বীকার করতেই হবে, মুসলিম দেশগুলোতে নানা রকম ডিক্টেটরশিপ (Dictatorship) রয়েছে, রাজতন্ত্র রয়েছে। এগুলো সহায়ক নয়। এগুলো ইসলামিকও নয়। আমাদেরকে আল্লাহর আইনের অধীনে জনগণের সরকার, যেটাকে আমরা শূরাভিত্তিক শাসন বলি বা যেটাকে আমরা গণতন্ত্র বলি সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

হিউম্যান রাইটস (Human rights) প্রতিষ্টিত করতে হবে। সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জবাবদিহিতামূলক (Accountable) সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এসব কথাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেন। এগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। ডিক্টেটরের অধীনে কোনো কোনো সময় সাময়িকভাবে উন্নতি হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী (Long-term) ডিক্টেটরের অধীনে কল্যাণমুখী অর্থনীতি গড়ে ওঠে না।

আমরা সামনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখি, যদি ইসলামের সংকটগুলো, দারিদ্র্যের সংকট, শিক্ষার সংকট, পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে আমাদের যে সংঘাত-

www.nagorikpathagar.org

এই সংঘাতগুলোকে আমরা যদি কাটিয়ে উঠতে পারি, আমরা যদি আমাদের নিজেদের যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে, আমাদের মধ্যে যে অতি গোঁড়ামী রয়েছে, কোথাও কোথাও যার কোনো ইসলামী ভিত্তি নেই - সেগুলো যদি আমরা দূর করতে পারি; আমরা যদি একটা Balanced understanding of Islam অর্জন করতে পারি, আমরা যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ উপলব্ধি (ফিকাহ) অর্জন করতে পারি - তাহলে আমি মনে করি, ইসলামী অর্থনীতি ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী হতে থাকবে।

এর জন্য ইসলামী জ্ঞানের ব্যাপক বিস্তার করা দরকার। ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তার করা দরকার। ইসলামের যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠা দরকার। ইসলামী আন্দোলনগুলোকে আরো যোগ্য হওয়া দরকার। এসব যদি করা সম্ভব হয় তাহলে মুসলিম বিশ্ব ক্রমাগতভাবে ইসলামী অর্থনীতির নিকটে চলে আসবে। তাহলে মুসলিম বিশ্ব থেকে সুদ উঠে যাবে। অবৈধ ব্যবসা উঠে যাবে, জালিয়াতি কমে যাবে। ভেজাল, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি কমে যাবে - যদিও রাস্তা যে দুর্গম তা অস্বীকার করা যায় না। এর জন্য অনেক পরিশ্রম দরকার, অনেক প্রচেষ্টা দরকার - সেগুলোকেও অস্বীকার করা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

অর্থনীতিতে সুদের প্রভাব

সামাজিক সুবিচার বা আদল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বা অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সব শিক্ষার উদ্দেশ্যই সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক সুবিচার কায়েম করার জন্যই ইসলামে সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক কুরআন মজিদে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেনঃ

> সুদখোরদের অবস্থা হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শয়তান তার নিজ প্রভাব দ্বারা মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, তারা বলে, ব্যবসা ও সুদ একই ধরনের। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। যারা আল্লাহর আদেশ মোতাবেক এরপর সুদী কারবার হতে বিরত হবে, তারা পূর্বে যা নিয়েছে, তা তাদেরই থাকবে। এ ব্যাপারে তাদের সমস্যা আল্লাহর নিকট সোপর্দ কিন্তু যারা এ আদেশের পরেও সুদী কারবার করবে তারা জাহান্নামী, জাহান্নামেই তারা চিরকাল থাকবে। (আল বাকারা: আয়াত ২৭৫)
>
> হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তবে সুদ বাবদ যা পাওনা আছে, তা ছেড়ে দাও। যদি তোমরা তা না করো, তবে তোমাদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। আর যদি তোমরা তওবা করো তবে তোমরা নিজেদের আসল মূলধন ফেরত পাবে। কারো ওপর জুলুম করো না, তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না।
>
> (আল বাকারা: আয়াত ২৭৮-২৭৯)
>
> হে ঈমানদারগণ! দ্বিগুণ, চতুর্গুণ সুদ খেয়ো না। দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি পাবার নিমিত্ত আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক।
>
> (আল ইমরান: আয়াত ১৩০)

এখানে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ সুদের উল্লেখের অর্থ এই নয় যে, দ্বিগুণ, চতুর্গুণ সুদ না হলে তা বৈধ হবে। তা হতে পারে না। এটা সূরা বাকারার আয়াতসমূহ হতে স্পষ্ট হয়। এখানে আরবে সে সময় যা কিছু বাস্তবে ঘটতো তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা কোনো নতুন বিষয় নয়। আগেও একবার ইসলামের প্রথম যুগে অর্থনীতিকে সুদমুক্ত করা হয়েছিল। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব দেশে অর্থনীতি সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। সব ব্যবসায়ীক ও ব্যক্তিগত লেনদেন সুদের ভিত্তিতে হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন অর্থনীতিকে সুদবিহীনভাবে গড়ে তোলেন। সুতরাং আমাদের জন্য সুদহীন অর্থ-ব্যবস্থা নতুন কিছু নয় বরং আমরা জানি যে, এর মডেল ইতিহাসে ছিল। আমাদের কাজ হচ্ছে সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থাকে নতুনভাবে পুনঃপ্রবর্তন করা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অষ্টম শতাব্দী হতে শুরু করে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি সুদ ছাড়াই পরিচালিত হতো। কেননা সে সময় মুসলিম বিশ্বই সবচেয়ে উন্নত ছিল; কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যেও। সর্বোপরি পাশ্চাত্য হতে যেসব পণ্য প্রাচ্যে আসতো তার পথও (Trade route) ছিল মুসলিম বিশ্বের ভেতর দিয়েই। কেননা পাশ্চাত্য তখনো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশ আরো পরে শুরু হয়েছিল। মুসলিম অর্থনীতি তখন ইসলামের ভিত্তিতে সুদ ছাড়া পরিচালিত হতো; কেননা মুসলিম বিশ্বের আইন ব্যবস্থা ছিল তখন ইসলামী ফিকাহ। যদিও খেলাফতের নামে বাদশাহী তখন কায়েম ছিল, তথাপি ইসলামী আইনের ভিত্তিতেই সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালিত হতো। যদি অষ্টম শতাব্দী হতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত উন্নত এক অর্থনীতি সুদ ছাড়া চলতে পারে তবে আজও সুদ ছাড়া একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত অর্থনীতি পরিচালনা করা যে সম্ভব, এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

এরপর আমি সুদভিত্তিক অর্থনীতির মন্দ প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করব। লাভ হোক বা না হোক, ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার নিকট হতে নির্দিষ্ট হারে সুদ দাবি করা নিঃসন্দেহে একটি জুলুম। এর ফলে অনেক ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক ভরাডুবি ঘটে যা সমাজের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। অনেকে মনে করতে পারেন যে, আজকাল ব্যাংকে যারা টাকা জমা রাখেন, তারা ব্যাংক হতে সুদ পেয়ে থাকেন এবং এ সুদ দেয়ার ফলে ব্যাংকের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়; কেননা ব্যাংক যে সুদ জমাকারীদের দিয়ে থাকে তার দ্বিগুণ সুদ ঋণগ্রহীতার উপর চাপিয়ে দেয়। এ পরিস্থিতিতে ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি যদি মন্দার সম্মুখীন হয়, তবে সে আর সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে অনেক সময় সক্ষম হয় না। ফলে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার শিল্প বা বন্ধক দেয়া বাড়ি ও সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করে থাকে। এভাবে সুদ ব্যবস্থার কারণে অনেকের সর্বনাশ হয়ে থাকে। কাজেই সুদ যে ইনসাফের সম্পূর্ণ খেলাফ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ সুদের কারণেই দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক রকম চড়া হয়ে থাকে। সুদবিহীন ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর স্বাভাবিক মুনাফা যোগ

www.nagorikpathagar.org

করে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদী অর্থনীতিতে সুদও মূল্যের উপর যোগ করা হয়। কাজেই অধিকাংশ দ্রব্যের ওপর কেবল সুদের কারণেই জনগণকে অতিরিক্ত দাম দিতে হচ্ছে। সুদী ব্যবস্থার আর একটি ভয়াবহ দিক হচ্ছে এই যে, এর ফলে পুঁজি সামান্যসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়, যা কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ খেলাফ। পুঁজির এ পুঞ্জিভূত হওয়া কোনো চেষ্টা তদবীরের ফল নয়। সুদের এটি একটি বৈশিষ্ট্য যে, হাত গুটিয়ে বসে থাকা একটি শ্রেণিকে এ ব্যবস্থা শ্রম ছাড়া সম্পদ বৃদ্ধির এক সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। যে কেউ প্রচুর বিত্ত-সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য কোনো সূত্রে পেয়ে গেলে সুদের বদৌলতে টাকা ব্যাংকে রেখে বিনা পরিশ্রমে সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। ফলে এ শ্রেণির লোকদের মধ্যে অকর্মন্যতা, বিলাসিতা ও দুষ্কর্মের প্রসার দেখা দেয়। আর যে সম্পদ সে এভাবে পেয়ে থাকে তা সবই সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকদের ঘর্ম ও রক্তধারা নিঃসৃত। এমনিভাবে দু'টি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যার একটি হচ্ছে, পুঁজি অপরিমিত ও অস্বাভাবিকভাবে জমা হতে থাকা, অপরটি হচ্ছে, ধনী-গরীবদের মধ্যে অস্বাভাবিক শ্রেণি পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া। এতে সামাজিক শান্তি নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। মালের জমা হওয়া সম্বন্ধে জার্মানির প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডক্টর সাখত, যিনি জার্মানির রাইখ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন, এলজেবরার একটি হিসাব দ্বারা প্রমাণ করেন যে, সুদী ব্যবস্থায় দুনিয়ার সমগ্র ধন-দৌলত একটি সুদখোর শ্রেণির হাতে চলে যেতে বাধ্য। এর কারণ হচ্ছে সুদের ভিত্তিতে ঋণদাতা সর্বদাই লাভবান হয়ে থাকে আর গ্রহীতা হয়ে থাকে কখনো লাভবান, কখনো ক্ষতির সম্মুখীন। (সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, পৃ: ৩৫৪)।

অথচ শরীকদারী নীতি ও মুনাফার ভিত্তিতে যে অর্থনীতি গড়ে উঠবে তাতে একটি শ্রেণির হাতে পুঁজি ক্রমাগত জমা হতে থাকার বা কর্মবিমুখ একটি শ্রেণি গড়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

সুদের অন্য এক মারাত্মক দিক হচ্ছে, এর ফলে অর্থনীতিতে বারবার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন হতে থাকে (Business cycle) যার ফলে অর্থনীতিতে সব সময় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে, তখন সুদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে যখন সুদের হার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তখন ঋণগ্রহীতা যদি হিসাব করে দেখে যে, অতিরিক্ত সুদের হারের কারণে লাভের সম্ভাবনা কম, তখন সে আর ঋণ নিতে চায় না। এর ফলে পুঁজি খাটানোতে ভাটা পড়ে, উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাঁটাই হয় এবং সাধারণভাবে ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেয়। এরপর আবার যখন ব্যাংক দেখতে পায় যে, পুঁজির চাহিদা কমে গেছে, তখন অপারগ হয়ে আবার সুদের হার কমিয়ে দেয়। তারপর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি নতুন করে পুঁজি নিয়ে বিনিয়োগে আত্মনিয়োগ করে। এমনিভাবে অর্থনীতিতে ক্রমাগতভাবে মন্দা ও তেজীভাব

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টি হতে থাকে। এ পরিস্থিতি যে অর্থনীতি ও জনকল্যাণের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। সুদী ব্যবস্থার অন্য একটি বিপদজনক দিক হচ্ছে এ ব্যবস্থায় ফটকাবাজারী (Speculation) উৎসাহিত হয়। অন্যদিকে মুনাফার ভিত্তিতে যে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাতে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা গ্রহণ করা হয়। এ ব্যবস্থায় জামানত (Security) দেয়াই যথেষ্ট নয়, লাভের নিশ্চয়তাও থাকতে হবে। কিন্তু সুদী অবস্থায় জামানত দিতে সক্ষম হলেই অন্য সতর্কতার কোনো প্রয়োজন নেই। আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো ক্ষেত্রে ঋণ না দেয়ার যে নির্দেশ দিয়ে থাকে তা খুব কমই পালিত হয় এবং এসব ফাঁকি দিয়ে ফটকাবাজারীর জন্য ঋণ নেয়া বিশেষ কঠিন হয় না। কেননা, যেহেতু সুদী ব্যবস্থায় জামানতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়, সে জন্য বাস্তবে টাকার কি ব্যবহার হচ্ছে তার উপর নজর রাখা হয় না। ফলে সুদী ব্যবস্থার আড়ালে বিশেষ করে বিভিন্ন পণ্য মওজুদের মাধ্যমে ফটকাবাজারী কায়েম হয়ে থাকে যা দ্রব্যমূল্য ও অর্থনীতিকে অস্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করে জনসাধারণের দুর্দশার কারণ হয়।

অর্থনীতির উপর সুদের খারাপ প্রভাব খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' এবং আনোয়ার ইকবাল কোরেশীর 'ইসলাম এন্ড দি থিওরী অব ইন্টারেস্ট' পুস্তক দুইটি দেখা যেতে পারে।

অর্থনীতিতে সুদ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে না। ১৯৩৫ সালে কিনস (Keynes)-এর The General Theory of Income, Employment and Interest পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মনে করা হতো যে, সুদ হচ্ছে সঞ্চয়ের মূল কারণ। কিন্তু কিনস দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সঞ্চয়ে সুদের কোনো ভূমিকা নেই। সব আধুনিক অর্থনীতিবিদই আজ তা সত্য বলে মনে করেন।

বর্তমানে সুদ কেবল ঋণদান ও ঋণগ্রহণের একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে এবং এ ভিত্তিতেই ঋণ দেয়া নেয়া হচ্ছে। অবশ্য ঋণ দানের এ ভিত্তিটি যে কত ক্ষতিকর তা তো আমরা আগেই দেখেছি। অথচ শরিকদারী এবং মুনাফার সম্পর্ক যে ঋণ দেয়া-নেয়ার আরো সুন্দর ও ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর ফলে অর্থনীতিতে কোনো খারাপ প্রভাবও দেখা দেবে না।

সুদমুক্ত অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশসহ প্রায় সব মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংক কায়েম করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যাংকের অনেক দেশী-বিদেশী শাখাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ইসলামী ব্যাংক এখন বিশ্বে একটি স্বীকৃত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা অপেক্ষা এটা অনেক ভালো ফল দেখাতে পেরেছে। আশা করা যায় যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী ও কার্যক্ষম হয়ে উঠবে।

www.nagorikpathagar.org

যাকাত ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রধান প্রধান ব্যবস্থা

যাকাত

নিরাপত্তা মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। নিরাপত্তা না থাকলে কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠতে ও বিকাশ লোভ করতে পারে না। ইসলাম তাই নিরাপত্তা চায়। ইসলামের অর্থই হচ্ছে শান্তি, অর্থাৎ ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থা যেখানে নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলাম নিরাপত্তা চায় বলেই সে যেসব উপাদান নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করতে পারে যেমন মদ, জুয়া, অশ্লীলতা ইত্যাদিকে হারাম করেছে। এ জন্যই ইসলামী দন্ডবিধিতে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির (ফাসাদ ফিল আরদ) জন্য প্রয়োজনে হত্যার বিধান রাখা হয়েছে (সূরা মায়েদা: আয়াত ৩৩)।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তার একটি প্রধান অংশ। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পরিভাষার দিক থেকে সামাজিক নিরাপত্তার অর্থ হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিরাপত্তা দান। তাই ইসলাম অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

> তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে।
>
> (সূরা বাকারা: আয়াত ২৭৫)

কুরআন ও হাদিসে বহু স্থানে মানুষকে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। যারা কোনো কারণে নিজেদের প্রয়োজনীয় জীবন ধারণের ব্যবস্থা করতে পারে না তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত, তাদের আত্মীয়-স্বজনের ও স্থানীয় সমাজের। ইসলাম সমাজবদ্ধ জীবনে বিশ্বাস করে এবং সমাজের প্রত্যেকের একে-অপরের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের ঘোষণাঃ

> এবং নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে তার হক দাও।
>
> (সূরা বনী ইসরাইল: আয়াত ২৬)

www.nagorikpathagar.org

অতএব নিকটাত্মীয়কে এবং মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে তার হক দাও। (সূরা আর রূম: আয়াত ৩৮)

পূর্ব ও পশ্চিমের দিক মুখ করে দাঁড়ানো কোনো প্রকৃত কল্যাণের কাজ নয়। বরং প্রকৃত কল্যাণের কাজ করল তারা যারা আল্লাহ, পরকাল, কিতাব, ফিরিশতা ও নবীদের প্রতি ঈমান আনল এবং ধনমাল আল্লাহর ভালোবাসায় নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, দরিদ্র, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্য দান করল এবং নামাজ কায়েম ও যাকাত প্রদান করল। (সূরা বাকারা: আয়াত ১৭৭)

ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বা সামাজিক প্রচেষ্টা অপ্রতুলতার কারণে যারা অভাবগ্রস্ত থাকবে বা দূরবস্থার সম্মুখীন হবে তাদের অসুবিধা দূর করা এবং তাদের পুনর্বাসন করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার (বুখারী)। এ পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে খিলাফতের দায়িত্ব হিসেবে ইসলামী সরকারের। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের শিক্ষা নিম্নরূপঃ

পৃথিবীতে চলৎশক্তিসম্পন্ন এমন কোনো জীব নেই যার রিযিক দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর নয়। (সূরা হুদ: আয়াত ৬)

তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর সেই ধন-সম্পদ থেকে যাতে তিনি তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করেছেন। (সূরা আল হাদীদ: আয়াত ৭)

এ পর্যায়ে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা হচ্ছেঃ জেনে রাখো! তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

যে লোক ধন-মাল রেখে মরে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে এবং যে লোক অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে যাবে তার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে (বুখারী ও মুসলিম)।

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম তিন পর্যায়ে সামাজিক বিশেষ করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। প্রথমত, ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টা; দ্বিতীয়ত, সামাজিক ব্যবস্থা এবং তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা (তার শিক্ষা ও আইন ব্যবস্থাসহ) কার্যকর করা সম্ভব হলে কোনো মুসলিম সমাজেই কোনো ধরনের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিতে পারে না।

ইসলামী সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কি বোঝাবে? এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণাঃ

www.nagorikpathagar.org

আমরা বনী আদমকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি।

(সূরা বনী ইসরাইল)

এ প্রসঙ্গে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা হচ্ছেঃ তোমাদের জান, তোমাদের মাল ও তোমাদের সম্মান পবিত্র ও সম্মানার্হ (বিদায় হজ্জের ভাষণ: সিহাহ সিত্তাহ)।

কাজেই ইসলামী সমাজে এমন এক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে যেখানে জান-মালই শুধু বিপদমুক্ত হবে না বরং প্রত্যেক মানুষ ইজ্জতের সঙ্গে বাস করতে পারবে। এ জন্য ইসলামের ফকীহগণ খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও বিবাহের ব্যবস্থাকে মৌলিক প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবন হাজম লিখেছেনঃ প্রত্যেক এলাকার ধনবান লোকদের উপর সেখানকার দরিদ্র জনগণের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। শাসক তাদেরকে এ কাজ করতে বাধ্য করবেন এবং যাকাত বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ এ দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট না হলে ধনীদের নিকট হতে আরো সম্পদ সংগ্রহ করে তাদের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, শীত-গ্রীষ্মের পোশাক, বৃষ্টি, রৌদ্র ও পথিকদের বৃষ্টি হতে রক্ষাকারী একটি ঘরের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে (আল মিলাল ওয়ান নিহাল)।

জানের নিরাপত্তা ঘোষণার মধ্যেই চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর শিক্ষা তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সবার উপর ফরজ করেছেন। 'প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর উপর শিক্ষা ফরজ' (আল হাদিস)।

এ আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিখ্যাত আলিম ও ফকীহ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম লিখেছেন, পুরুষ ও নারীর যথাসময়ে বিবাহ হওয়া এ পর্যায়েরই মৌলিক প্রয়োজন (ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, ১ম সংস্করণ, পৃ-৯৩)।

সামাজিক নিরাপত্তার প্রধান প্রধান ব্যবস্থা

এ পর্যায়ে ইসলামের সবচেয়ে প্রধান ও মশহুর ব্যবস্থা হচ্ছে যাকাত। যাকাত কোনো সাধারণ কর বা শুল্ক নয়। সব কাজে যাকাতকে ব্যবহার করা যায় না। যাকাত হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি। যাকাতের মাধ্যমে সমাজকে দারিদ্র্য থেকে ইসলাম উদ্ধার করতে চায়। যাকাতের হকদার হচ্ছে যারা কর্মক্ষমহীন এবং যারা কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উপার্জনহীন অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণ উপার্জন করতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

> যাকাত পাবে ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করা দরকার, ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত এবং নিঃস্ব পথিক। আল্লাহর পথে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজেও এ অর্থ খরচ করা হবে। (সূরা তওবা: আয়াত ৬০)

www.nagorikpathagar.org

যাকাতের মাধ্যমে সব অভাবগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অভাব দূর করা ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করা সম্ভব। যাকাত অভাবগ্রস্তকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দিতে হবে যাতে সে আর অভাবগ্রস্ত না থাকে। এ পর্যায়ে কোনো কোনো ফকীহ্ মত প্রকাশ করেছেন যে, যাকাতের যে গ্রহীতা তাকে এক বছরের প্রয়োজন পূর্ণ করে দিতে হবে। কেউ কেউ সারা জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়ার কথা বলেছেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর মত হচ্ছে - যখন দেবেই, তখন সচ্ছল বানিয়ে দাও।

যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র জনতার পুনর্বাসন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। সারা মুসলিম বিশ্বের দেশভিত্তিক বা সামগ্রিক আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সব তথ্যও আমাদের কাছে নেই। এখানে কেবল বাংলাদেশের আদায়যোগ্য যাকাতের একটি নিম্নতম হিসাব পেশ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে তিন কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। এর অন্তত ১ কোটি টন সচ্ছল কৃষকগণ উৎপাদন করে থাকেন। যদি এই ১ কোটি টনের উপর অর্ধ ওশর (৫%) আদায় করা হয় তার পরিমাণ হবে ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। যার নীচের পক্ষে মূল্য হচ্ছে ২,৫০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাট, চা, রবিশস্য, তামাক ও অন্যান্য ফসল যার যাকাতযোগ্য পরিমাণ পাঁচ হাজার কোটি টাকা হবে। এতে শতকরা ৫ ভাগ হারে ২৫০ কোটি টাকার যাকাত আদায় হতে পারে। এ হিসাবের জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে, সব জমিতেই সেচ দেয়া হচ্ছে এবং এ জন্য জমির মালিকগণ শতকরা ১০ ভাগ ওশর না দিয়ে শতকরা ৫ ভাগ অর্ধ ওশর দিচ্ছে। তেমনিভাবে যাকাতযোগ্য ব্যবসায়ী পণ্য, নগদ অর্থ এবং স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার হতে যথাক্রমে ১,০০০ কোটি, ১,০০০ কোটি ও ৫০০ কোটি টাকার যাকাত আদায় হতে পারে। এভাবে অন্যান্য বনজ সম্পদ, পশু সম্পদ এবং সমুদ্র হতে প্রাপ্ত মাছ ইত্যাদি বাদ দিলেও অন্তত ৫,২৫০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে। নিম্নে এ সম্পর্কে একটি ছক দেয়া হলো:

যাকাতযোগ্য পণ্য, সম্পদ ও অর্থের হিসাব
(২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী)

সম্পদ	যাকাতযোগ্য পরিমাণ/ মূল্য/ অর্থ	যাকাতের পরিমাণ ও মূল্য (টাকায়)	মন্তব্য
১. খাদ্যশস্য	১ কোটি টন	৫ লক্ষ টন (মূল্য ২,৫০০ কোটি টাকা)	শতকরা ৫ ভাগের মূল্য
২. অন্যান্য শস্য	৫,০০০ কোটি টাকা	২৫০ কোটি টাকা	ঐ
৩. ব্যবসায়ী/ শিল্প পণ্য	৪০,০০০ কোটি টাকা	১,০০০ কোটি টাকা	শতকরা ২.৫ ভাগ হারে
৪. নগদ অর্থ (ব্যাংক সহ)	৪০,০০০ কোটি টাকা	১,০০০ কোটি টাকা	ঐ
৫. স্বর্ণ/ স্বর্ণালঙ্কার	১০,০০০ কোটি টাকা	৫০০ কোটি টাকা	ঐ

www.nagorikpathagar.org

যাকাতের এ পরিমাণ অর্থ যদি প্রতি বছর কেবল দরিদ্র জনতাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান, কর্মে নিয়োগ ও পুনর্বাসনে ব্যয় করা হয় তবে কয়েক বছরেই বাংলাদেশে ছিন্নমূল বলে কিছু থাকবে না। অবশ্য যাকাতের অর্থ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা যায় না। সে জন্য অন্য কর ও শুল্কও আদায় করতে হবে।

যাকাতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে রয়েছেঃ

> যখন আমরা তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তখন তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। (সূরা হাজ্জ: আয়াত ৪১)

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ আদেশ করেছেনঃ

> তাদের মাল থেকে যাকাত আদায় করুন।
>
> (সূরা তওবা: আয়াত ১০৩)

আয়াতে 'সাদাকাত' শব্দের অর্থ ফকীহগণ যাকাত করেছেন, কেননা আয়াতে 'খুজ' ক্রিয়াটি আদেশবাচকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যা কেবল বাধ্যতামূলক কাজের জন্য প্রযোজ্য। আর আমরা জানি যে, একমাত্র বাধ্যতামূলক সাদাকা হচ্ছে যাকাত (ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, পৃ. ৩১-৩৭, ২য় খণ্ড)।

সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের দ্বিতীয় প্রধান উপায় হবে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের অন্যান্য সম্পদ - যদি যাকাত, স্থানীয় সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে অপর্যাপ্ত হয়। বায়তুল মালের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ বায়তুল মালের সম্পদ সাধারণ মুসলমানের সম্পদ। বায়তুল মালের এ সম্পদ হতে কেবল মুসলমানই নয়, অমুসলিমদেরও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। হয়রত ওমর ফারুকের খিলাফতকালে ইরাকের হিরাবাসী খৃস্টানদের সঙ্গে যে চুক্তি হয় তাতে লেখা ছিলঃ

যে বৃদ্ধ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কিংবা কোনো বিপদে পড়ে গেছে অথবা পুর্বে ধনী ছিল এবং স্বচ্ছল ছিল এখন দরিদ্র হয়ে পড়েছে আর সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করেছে এরূপ ব্যক্তির উপর, সে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক থাকবে - ধার্য জিজিয়া প্রত্যাহৃত হবে এবং মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে তার ও তার পরিবার-পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪, আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ থেকে)।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) অন্য এক সময় একজন অসমর্থ জিম্মী সম্পর্কে বায়তুল মালের দায়িত্বশীল কর্মচারীকে লিখে পাঠানঃ

www.nagorikpathagar.org

এই লোকটি ও তার উপর ধার্য জিজিয়া ইত্যাদি করের বোঝা সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা কর। আমরা লোকটির উপর কিছুমাত্র সুবিচার করিনি, তার যৌবনকালের উপার্জনে সকলে উপকৃত হয়েছি, আর এখন তার বার্ধক্যকালে লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য তাকে ত্যাগ করেছি। অথচ আল্লাহ তো বলেছেন, সাদাকাসমূহ ফকীর ও মিসকীনদের জন্য। ফকীর বলতে মুসলমান দরিদ্র লোককে বোঝায়। আর এ লোকটি হচ্ছে আহলি কিতাব থেকে মিসকীন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬, আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ থেকে)।

বর্তমান যুগে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যকর করার জন্য আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা কায়েম করা যেতে পারে, যাতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো সংহত ও প্রসারিত হয়। এ প্রসঙ্গে বীমা ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবন বীমাকেও সুদমুক্ত ও জুয়ামুক্তভাবে সংগঠিত করা সম্ভব। আধুনিক অনেক ফকীহই এই মত পোষণ করেন। (১. Nazatullah Siddiqui, Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature, Islamic Foundation, UK. ২. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামী অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা)। প্রকৃতপক্ষে এর ফলে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ও যাকাত অর্থের উপর চাপ কমবে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি ইসলামী বীমা কোম্পানি মধ্যপ্রাচ্যে কাজ শুরু করেছে।

বর্তমান যুগে ইসলামী ব্যাংকও সামাজিক নিরাপত্তা কায়েমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামী ব্যাংক অভাবগ্রস্ত কর্মক্ষম যুবক ও শ্রমিকদের মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। এ জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে খুব বেশি অর্থ দিতে হবে না। এ পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ যুবক কর্মীকে বেকারত্ব থেকে মুক্ত করে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। এটাও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ব্যাপক সহায়তা করবে।

এসব প্রতিষ্ঠান কায়েম করা প্রকৃত পক্ষে কুরআনের দৃষ্টিতে মারূফ কায়েম করা হিসেবেই গণ্য হবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

> যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে ক্ষমতা দিয়েছি তারা... সৎকাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। (সূরা হাজ্জ: আয়াত ৪১)

বাস্তব সামাজিক নিরাপত্তা ও যাকাত ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে রাষ্ট্রকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, যাকাত প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যতটুকু যাকাত রাষ্ট্র কর্তৃক আদায় করা অধিকাংশ ফকীহ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, ততটুকু যাকাত বাধ্যতামূলকভাবেই আদায় করতে হবে। যাকাতের কিছু অংশ ফকীহদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে আদায় করার কথা বলেছেন (ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় খণ্ড)। এ জন্য সব মুসলিম দেশে প্রয়োজনীয় যাকাত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

যাকাত আদায়কে সহজ করার জন্য যাকাত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান জনগণকে দিতে হবে। তবেই সালাত আদায় করার মতো যাকাত আদায় করা জনগণের জন্য সহজ হবে। জনগণ এ ব্যাপারে অনেক কিছুই জানে না। এ সম্পর্কে ইউসুফ আল কারযাভী লিখেছেনঃ '(যাকাত সম্পর্কে) আরও কতকগুলো বিষয় জানার প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুনভাবে এ যুগে দেখা দিয়েছে। প্রাচীনকালীন ফিকাহবিদগণ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন।' এ প্রসঙ্গে তিনি বড় বড় শিল্প কারখানার উৎপাদন, জাহাজ, ভাড়া বাড়ি, হোটেল-রেস্তোরাঁ, প্রেস ইত্যাদি নতুন ধরনের সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের ভূমি যে খারাজী ভূমি নয় বরং উশরী ভূমি, এ সম্পর্কেও জনগণের জ্ঞানের অভাব আছে। জনগণকে জানানো দরকার যে, বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের জমির ফসলের উপর ওশর দান ফরজ। (ক. ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, খ. সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, ওশরের শরীয়তী বিধান, আধুনিক প্রকাশনী)। তেমনিভাবে যাকাত প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাত কি কি সম্পদে ফরজ, নিসাব কি, যাকাতের বছর কিভাবে গণনা করতে হয় - এ সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান জনগণকে দিতে হবে (ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত)।

সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যাকাত সংক্রান্ত এ আইন-কানুনকে বিস্তারিতভাবে পড়বার ব্যবস্থা করতে হবে।

যাকাত ব্যবস্থা কার্যকরণে কেবল সরকারি কর্মচারীর উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না; তাতে যাকাত বিভাগের প্রশাসনিক খরচ বেশি হবে। কাজেই যাকাত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক মুসলিম দেশকে বেসরকারি পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের কমিটির ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি যাকাত কর্মচারীগণ তাদের কাজ তদারক করবেন।

যাকাত বিভাগে কর্মরতদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার হবে। এ প্রশিক্ষণের মধ্যে যাকাতের বিধি-বিধান, প্রসাশনিক আইন-কানুন ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হবে। যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের যথাযোগ্য বেতন দিতে হবে, যেন তারা অসততার পথে পা না বাড়ায়।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য ইসলামী বীমা ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এ কাজ বেসরকারি ও সরকারি দুই পর্যায়েই হতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইসলামী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। এ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্রত্যেক সরকার ও সমাজের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা কর্তব্য। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী অর্থনীতি নানাবিধ দিক-নির্দেশনা দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ওশরের বিধান

ফসলের যাকাত বা ওশর আদায় মুসলমানদের জন্য কেবল শরীয়তের বিধানের দিক দিয়েই অপরিহার্য বা ফরজ নয়, বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশে ওশর আদায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের বিরাট জনগোষ্ঠী গ্রামে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় বাস করে। এদেশের দারিদ্র্য দূর করা, দরিদ্রদের পুনর্বাসন করা ও তাদের ভবিষ্যতের জন্য স্বাবলম্বী করা ওশর আদায় করার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার কথা যে বাংলাদেশের জনগণ ওশর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নয়। তাই তারা ওশর আদায় করে না। এভাবে শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ হুকুম এদেশে পালিত হচ্ছে না এবং তার ফায়দা থেকে এদেশের জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে।

ওশর ফরজ হওয়ার দলিল: কুরআন ও হাদিস থেকে

ওশর ফরজ হওয়ার দলিল নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন:

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র উপার্জন থেকে এবং আমরা তোমাদের জন্য জমি থেকে যা কিছু বের করি, তা থেকে ব্যয় করো। আর ব্যয় করতে গিয়ে খারাপ জিনিস দিতে ইচ্ছা করো না। কেননা তোমরা নিজেরাও তো উপেক্ষা করা ছাড়া গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও না। (সূরা বাকারা: আয়াত ২৬১)

ব্যয় করার এই নির্দেশ ফরজ প্রমাণ করে। জাসসাস বলেছেন, ব্যয় করো অর্থ যাকাত দাও। অন্য বিশেষজ্ঞরাও এ ব্যাপারে একমত। আল্লাহপাক আরো ইরশাদ করেছেন:

> তিনি আল্লাহ্ যিনি নানা প্রকারের গুল্মলতা ও গাছ-গাছালি সম্বলিত খেজুর বাগান সৃষ্টি করেছেন, ক্ষেত-খামার বানিয়েছেন, যা থেকে নানা প্রকারের খাদ্য উৎপাদন করা হয়, জয়তুন ও আনারের গাছ তৈরি করেছেন যার ফল দেখতে সাদৃশ্যসম্পন্ন ও স্বাদে বিভিন্ন হয়ে থাকে, তোমরা সকলে খাও এর উৎপাদন - যখন তা ধরবে এবং আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

> হক আদায় কর যখন তার ফসল কেটে তুলবে। (সূরা আনআম: আয়াত ১৪১)

ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ আল শায়াবানী, ইমাম মালিক, সাইদ ইবনুল মুসাইয়েব, তাউস, কাতাদাহ ও দাহহাকসহ অধিকাংশ মনীষীদের মতে এ আয়াতে আল্লাহর হক বলতে ফসলের যাকাত ওশরকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতেও আদায় করো দ্বারা ওশর ফরজ প্রমাণিত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

> যেসব জমিকে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি সিক্ত করে তা থেকে ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ (ওশর) এবং যেসব জমি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তা থেকে ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ (অর্ধ-ওশর) দিতে হবে।[১]

হযরত জাবির (রা.) থেকেও আহমদ ও মুসলিম একই ধরনের হাদিস নবী (সা.)-এর কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কি কি ফসলের ওশর হয়

সূরাতুল বাকারা এবং সুরাতুল আনআম-এর উপরোল্লিখিত আয়াত ও রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদিসের সাধারণ তাৎপর্যের আলোকে জমির সব ধরনের উৎপাদনের উপর ওশর ফরজ। এসব আয়াতে ও হাদিসে বিভিন্ন ধরনের ফসলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। এ জন্য ইমাম আবু হানিফা, দাউদ জাহেরী, ইবরাহীম নখয়ী, ওমর ইবনে আবদুল আযীয, মুজাহিদ ও হাম্মাদ ইবনে আবু সালমান মত প্রকাশ করেছেন যে জমির সব ধরনের উৎপাদনেই ওশর হবে।

ইমাম মালিক শাফেয়ীর মত হচ্ছে যা-ই খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ও সঞ্চয় করে রাখা যায় তাতেই ওশর হবে। এ মতে যা খাদ্য নয় এবং যেসব খাদ্য শুকিয়ে জমিয়ে রাখা যায় না তাতে ওশর হবে না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের প্রচলিত মত হচ্ছে যেসব ফসল মাপা যায়, সংরক্ষণ করা যায় এবং শুকিয়ে রাখা যায় তাতে ওশর হবে।

এ যুগের বিখ্যাত মুজতাহিদ আলেম ইউসুফ আল কারযাভী সব মতামত ও তাদের যুক্তি আলোচনার পর কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদিসের সাধারণ তাৎপর্যের ভিত্তিতে সব ধরনের ফসলেই ওশর হবে বলে মত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

> কেবলমাত্র খাদ্য হিসেবে গ্রহণীয় জিনিসের উপরে যাকাত ধার্য সংক্রান্ত হাদিসসমূহের কোনোটিই ক্রটিমুক্ত নয়। হয় তার সনদ বিভিন্ন, ধারাবাহিকতা ও অবিচ্ছিন্নতা নাই, না হয় কোনো কোনো বর্ণনাকারী জইফ। কিংবা যে হাদিস রাসূলে করীমের (সা.) কথা হিসেবে বর্ণিত আসলে তা কোনো সাহাবির উক্তি।

www.nagorikpathagar.org

> নবী করীমের (সা.) কথা হিসেবে বর্ণিত 'শাকশবজিতে যাকাত নেই' সনদের দিক দিয়ে খুব দুর্বল হাদিস। তাই তা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন ও হাদিসের সাধারণ ও ব্যাপক ঘোষণাবলীকে সীমিত ও সংকীর্ণ করা তো দূরের কথা। ইমাম তিরমিযী এই হাদিস উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'এই হাদিসের সনদ সহীহ নয়।' হাদিসটিকে সহীহ মেনে নিলে হানাফীদের মতে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে তাতে এমন যাকাত ধার্য নয় যা আদায়কারী কর্মচারীদের মাধ্যমে আদায় করতে হবে।[২]

কাজেই সব ধরনের ফসলে ওশর হবে এ মতই কুরআন, সুন্নাত ও অধিকাংশ আলেমের মত বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য।

নিসাবের পরিমাণ কি

কি পরিমাণ ফসলে ওশর ফরজ হবে সে সম্বন্ধে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে, পরিমাণ কম হোক কি বেশি হোক ফসলের সব পরিমাণের উপরই ওশর দিতে হবে। ইবরাহীম নখয়ী, ইয়াহইয়া ইবনে আদম ও ওমর ইবনে আবদুল আযীয থেকে একই মত বর্ণিত হয়েছে। তাদের মতের ভিত্তি হচ্ছে নবী (সা.) বর্ণিত একটি হাদিস, "আকাশের পানিতে যাই সিক্ত হবে তাতেই ওশর হবে।"

কিন্তু নিম্নে উল্লিখিত হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদসহ অধিকাংশ আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে পাঁচ ওয়াসাকের পরিমাণে কোনো যাকাত হবে না।

> পাঁচ ওয়াসাক খেজুরের কম পরিমাণে যাকাত নেই।[৩]

নাসায়ীতে আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, "কোনো ফসলে ও খেজুরে তার পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত যাকাত নেই।" এ ব্যাপারে অধিকাংশের মতই যুক্তিযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এসব হাদিসের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা আকাশের পানি যা সিক্ত করে তাতেই ওশর কথাটি দ্বারা কোন জমির উপর ওশর ধার্য হবে এবং কোনটিতে অর্ধ-ওশর ধার্য হবে সে কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিসাবের পরিমাণ কি হবে সে সম্বন্ধে এ হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়নি। সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অন্য হাদিসসমূহে।

পাঁচ ওয়াসাক বলতে কত পরিমাণ বুঝাবে এ সম্বন্ধে কিছুটা মতভেদ আছে। ৬০ ছা-এ এক ওয়াসাক হয়ে থাকে। মতভেদের কারণ হচ্ছে ছা-র পরিমাণ। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর ইউসুফ আল কারযাভী মত দিয়েছেন যে পাঁচ ওয়াসাক সমান ৬৫৩ কিলোগ্রাম অর্থাৎ ১৮ মনের মতো।

পাকিস্তানে যাকাত ও ওশর আইন প্রণয়নের সময় এ পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। সর্বশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে পাঁচ ওয়াসাক

www.nagorikpathagar.org

হবে ৯৪৮ কিলোগ্রাম বা সাড়ে ছাব্বিশ মন। পাকিস্তানে যাকাত ও ওশর আইন প্রণয়নে বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা আলেমের মতামত নেয়া হয়। কাজেই এ মতকে এ যুগের আলেমদের এক ব্যাপক অংশের মত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের দেশেও এ মতের উপর আমল করা উচিত হবে।

ওশর ও খারাজ

জমহুর ফিকাহবিদগণ মুসলমানের মালিকানাধীন সব জমির উপর ওশর ফরজ বলেছেন। কেননা কুরআন ও সুন্নাতের স্পষ্ট আয়াত ও দলিলের ভিত্তিতে কোনো মুসলমানই ওশর আদায় হতে অব্যাহতি পেতে পারে না। তারা এও মনে করেছেন যে, সরকার কর্তৃক যদি কোনো ভূমিকর বা খারাজ ধার্য করা হয় তা দিলেও ওশর দিতে প্রত্যেক মুসলমান বাধ্য। তারা ওশর ও খারাজ একত্রে ধার্য হওয়া অবৈধ মনে করেন না। কেননা খারাজ ও ওশর দুই ভিন্ন প্রকৃতির হক। খারাজ হওয়ার কারণ হচ্ছে জমি ব্যবহার করার অধিকার। অন্যদিকে ওশর আদায়ের কারণ হচ্ছে জমির ফসল লাভ। জমহুর ফিকাহবিদগণ ইবনে মসউদের মাধ্যমে নবী (সা.) হইতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস গ্রহণ করেননি। "কোনো মুসলিমের জমির উপর ওশর ও খারাজ একসঙ্গে ধার্য করা যেতে পারে না।" ইমাম নববী বলেছেন এ হাদিসটি বাতিল। এর দুর্বল হওয়া সর্ব সমর্থিত। বায়হাকী বলেছেন যে এর বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে আম্বাসাতা যে দুর্বল বর্ণনাকারী তা সর্ব সমর্থিত। ইমাম সুয়ুতী ইবনে আব্বাস ও ইবনে আদী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে ইয়াহইয়া ছাড়া আর কেউ তা বর্ণনা করেননি, সে দাজ্জাল।[৪]

এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফা মত প্রকাশ করেছেন যে, জমি যদি ওশরী হয় তবে ওশর দিতে হবে এবং যদি খারাজী হয় তবে খারাজ দিতে হবে। জমি কিভাবে ওশরী হয় এবং কিভাবে খারাজী হয় এ প্রসঙ্গে আবু ওবায়েদ কিতাবুল আমুয়ালে যা লিখেছেন তার সারাংশ হচ্ছে:

ক. যে জমির মালিকই ইসলাম গ্রহণ করবে ও তারপরও জমির মালিক থেকে যাবে সেই জমিই ওশরী জমি হবে।

খ. কোনো দেশ বিজয়ের পর সে দেশের জমি যদি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হয় সে জমি ওশরী হবে।

গ. মৃত জমি ও পোড়ো জমি যদি মুসলমানরা আবাদ করে তা ওশরী হবে।

ঘ. অন্যদিকে বিজয় বা সন্ধির পর অন্য জাতির জমি যদি তাদের নিকটই করের বিনিময়ে রাখা হয় তবে তা হবে খারাজী জমি।[৫]

উপরে বর্ণিত নীতি মোতাবেক বাংলাদেশের প্রায় জমিই যে ওশরী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ দেশের অধিকাংশ অধিবাসী অমুসলমান ছিল এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমি আবাদ করেছে। মুসলিম সরকার হতেও তারা অনেক জমি পেয়েছে। এ সব জমিই ওশরী।

www.nagorikpathagar.org

অনুমানের ভিত্তিতে মুসলমানের জমিকে খারাজী গণ্য করা যায় না। তেমনিভাবে মুসলিম বিজয়ের সময় প্রত্যেকটি জমির কি অবস্থা ছিল তা বিবেচনা করে কোনো জমিকে খারাজী গণ্য করা আজ সম্ভব নয় এবং শরীয়তের যথেষ্ট কোনো দলিলের ভিত্তিতে এমন কিছু করার মতো প্রয়োজনীয়তাও আমাদের নেই।

এ যুগের বড় হানাফী আলেম ও তাফসিরকার মুফতী মুহাম্মদ শফী এ সম্পর্কে বলেন:

> (সরকার) জমির যে সরকারি খাজনা আদায় করে তা ওশর বা খারাজের শরয়ী নীতির অধীনে আদায় করে না এবং ওশর ও খারাজ নামেও আদায় করে না। আবার তার খাতে খরচ করার কোনো ঘোষণা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। এজন্য মুসলিম রাষ্ট্রের আরোপিত ইনকাম ট্যাক্স বা সরকারি খাজনা দিলে যাকাত ও ওশরের ফরজ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। এ দায়িত্ব বহাল থাকে এবং সম্পদের মালিকদের নিজ নিজ যাকাত ও ওশর বের করে তা তার খাতে ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য।[৬]

কাজেই বাংলাদেশের মুসলমানদের জমিকে ওশরী গণ্য করতে হবে এবং ওশর দিতে হবে। অবশ্য জনগণের অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে এবং ওশর আদায়ের পরে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য যদি জমির খাজনা তুলে দেয়ার প্রয়োজন বোধ হয় তবে তা করা খুবই সংগত হবে। যেখানে বাংলাদেশে মুসলমানদের জমির খাজনা ২০/২৫ কোটি টাকার মতো হবে সেখানে মুসলমানদের জমি হতে ওশর আদায় হতে পারে অন্তত ২৫০ কোটি টাকা। কাজেই সামান্য ভূমিকরের জন্য আমরা ওশর আদায় পরিত্যাগ কোনো অবস্থাতেই করতে পারি না। কেননা তাতে গরীবের অধিকার লঙ্ঘিত হবে।

ওশরের পরিমাণ

একটি স্বাভাবিক বৎসরে বাংলাদেশে অন্তত তিন কোটি টন খাদ্যশস্য (চাল, গম ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের জনগণের এক বড় অংশ ভূমিহীন কৃষক। তাদের হাতে জমি নেই। জমির অর্ধেক পরিমাণ রয়েছে সচ্ছল বা বড় কৃষকদের হাতে। কাজেই বাংলাদেশের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের অন্তত অর্ধেক অর্থাৎ ১ কোটি টন উৎপাদন করে থাকে সচ্ছল কৃষকগণ এবং তাদের প্রত্যেকের উৎপাদনের পরিমাণ নিসাবের অতিরিক্ত হয়ে থাকে যা যাকাতযোগ্য। যদি এই ১ কোটি টনের উপর অর্ধ-ওশর (৫%) আদায় করা হয় তবে ওশরের পরিমাণ হবে ৫ লক্ষ টন যার মূল্য হবে কমপক্ষে ২৫০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাট, চা, রবিশস্য, তামাক ও অন্যান্য ফসল (যার যাকাতযোগ্য পরিমাণ হবে অন্তত ৫,০০০ কোটি টাকা) হতে অর্ধ-ওশর (৫%) আদায় করা হলে ২৫০ কোটি টাকার ওশর আদায় হবে। এ হিসাবের জন্য আমরা ধরে নিয়েছি যে সব জমিতেই সেচ দেয়া হচ্ছে এবং তাই ওশর (১০%) আদায় না করে অর্ধ-ওশর

www.nagorikpathagar.org

আদায় করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে অনেক জমির ফসল হতে ওশর (১০%) আদায়যোগ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে মোট ওশরের পরিমাণ আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে।

ওশর সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়

ওশর আদায়ের পূর্বে জমির ফসল উৎপাদনের খরচ বাদ যাবে কি? এ পর্যায়ে আমরা জানি যে সেচের খরচকে আল্লাহর রাসূল (সা.) বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন এবং যে জমিতে সেচ দিতে হয় তার ফসলের ওশর ১০% না করে ৫% নির্ধারণ করেছেন। অন্যান্য খরচ বাদ দেয়ার ব্যাপারে কোনো সহীহ সুন্নাত আমাদের কাছে নেই। ইবনে হাযাম, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও আবু হানীফা মত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ যে হক ধার্য করেছেন তা কুরআন বা প্রমাণিত সুন্নাত ছাড়া প্রত্যাহার করা জায়েজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাসের মত হলো যা ফসলের জন্য ব্যয় করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্টের উপর ওশর দিতে হবে। হযরত ইবনে ওমর মনে করেন পরিবার ও কৃষিকাজ করার জন্য যে ঋণ বা খরচ করা হলো তা সবই বাদ যাবে। মকহুল, সুফিয়ান সাওরী, আবু উবাইদ এ মতই পোষণ করেন। সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আহমদ খারাজ বা ভূমিকর বাদ দেয়ার পর ওশর আদায় করার কথা বলেছেন।[৭]

পাকিস্তানে যাকাত ও ওশর আইন প্রণয়নের সময় আলেমদের অধিকাংশের পরামর্শে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ফসল উৎপাদনকারী খরচ বাবদ সর্বোচ্চ এক-চতুর্থাংশ বাদ দিতে পারবে। অবশিষ্টের উপর ওশর (১০%) দিতে হবে। অবশ্য সেচের ক্ষেত্রে অর্ধ-ওশর (৫%) দিতে হবে। যদি কোনো জমিনে বৎসরের এক সময় সেচ এবং অন্য সময় বৃষ্টির পানি দ্বারা ফসল ফলানো হয় সে ক্ষেত্রে যে ফসল সেচ দ্বারা ফলানো হয় তার উপর অর্ধ-ওশর (৫%) এবং যে ফসল বৃষ্টির পানিতে ফলানো হয় তার উপর ওশর (১০%) দিতে হবে। অবশ্য যদি কোনো ফসল ফলানোর সময়ের এক অংশ বৃষ্টির পানি এবং এবং অন্য অংশ সেচ দ্বারা সিক্ত হয় তাহলে বেশিরভাগ সময় হিসাবে ধরে ওশর বা অর্ধ-ওশর দিতে হবে।

যদি কোনো জমিন বর্গা দেয়া হয় তাহলে কি হবে? সে ক্ষেত্রে জমির মালিক ও বর্গাদারকে তার নিজ নিজ অংশের ওশর বা অর্ধ-ওশর দিতে হবে। যদি দু'জনের একেজনের ফসল নিসাব পরিমাণ হয় এবং অন্য জনের নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে যার নিসাব পরিমাণ হবে তাকে দিতে হবে এবং যার হবে না তাকে কিছুই দিতে হবে না। এ মতই যুক্তিযুক্ত।

ওশর পণ্যেও আদায় করা যায় এবং নগদেও আদায় করা যায়। আমাদের দেশে ধান ও গমের ওশর পণ্যে এবং অন্যান্য ফসলের ওশর নগদে অর্থাৎ ওশর হিসাবে আদায়যোগ্য পণ্যের মূল্যে আদায় করা যায়। ধান ও গমের ওশর পণ্যে আদায় করা হলে দেশের গ্রামাঞ্চলে এসব পণ্যের মজুদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে সহায়তা করা অনেক সহজ হবে। ওশর আদায়

www.nagorikpathagar.org

করার জন্য প্রত্যেক গ্রামে স্থানীয় জনগণ মসজিদভিত্তিক কমিটি ও অন্যান্য ব্যবস্থা করতে পারেন। মসজিদের পাশেই ওশরের ফসল রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ওশর আদায় করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা আমাদের সমাজকে দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য অপরিহার্য। এ ব্যাপারে আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজবিদ ও অন্যান্য সবার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এজন্য ওশর সংক্রান্ত বিস্তারিত আহকাম জনগণকে জানানো অত্যন্ত জরুরি। কেননা জনগণ এ সম্পর্কে অবহিত নয়।

তথ্যসূত্র

১. বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ।

২. ইউসুফ আল কারযাভী, যাকাতের বিধান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩১-৪৩৪, প্রকাশক - ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩. বুখারী ও মুসলিম।

৪. ইউসুফ আল কারযাভী, ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৯০।

৫. ইউসুফ আল কারযাভী, ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৭৭-৪৭৯।

৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী, ইসলাম কা নেযামে আরাদী, পৃষ্ঠা: ১৮৩।

৭. ইউসুফ আল কারযাভী, ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৬৪-৪৬৭।

www.nagorikpathagar.org

দারিদ্র্য বিমোচন ঃ ইসলামের কৌশল

ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে সক্ষম কি-না? এই প্রশ্নের উত্তর ভাবতে গেলে একদিকে মনে হয় এই প্রশ্নটি সঠিক নয়। কেননা, ঐতিহাসিক বিচারে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো ইসলাম যখন বিস্তার লাভ করে, তার খিলাফতের যখন বিস্তার হয় তারপর থেকে বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্য উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে, এমন সময় পার হয়েছে যখন যাকাত নেয়ার লোক ছিল না। যাকাত নেয়ার লোক কখন থাকে না, যখন কোনো সমাজে দারিদ্র্য থাকে না। কিন্তু আজকের আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ কি এই দাবি করতে পারবে যে, সাহায্য নেবার কেউ নেই? আমেরিকা কি দাবি করতে পারবে, তাদের সাহায্য নেবার কেউ নেই? এর থেকে বোঝা যায় ইসলামের ইতিহাস অনেক গৌরবোজ্জ্বল আর এই অর্থে সুপিরিয়র, শ্রেষ্ঠ যে সে দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই দাবি পুরোপুরিভাবে পশ্চিমা বিশ্ব এখনো করতে পারবে না। এইদিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচন করতে সক্ষম কি না - এই প্রশ্নটি অযৌক্তিক মনে হয়। কিন্তু এই প্রশ্নটিই মাঝেমধ্যে শুনতে হয়। আবার একদিক থেকে এই প্রশ্নটি সাধারণ মানুষের মধ্যে আসতে পারে। কেননা, তারা বলে ইসলামে আখিরাতের কথা বলা হয়, এবাদত-ঈমানের কথা বলা হয়, নামাজ, রোজা, হজ্জের কথা বলা হয়, কিছুটা যাকাতের কথা বলা হয়। তাহলে এখানে দারিদ্র্য বিমোচন করার ওপর কিংবা অর্থনীতির ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। এর থেকে তাদের ধারণা হয়, ইসলামে প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য বিমোচনের কোনো কথা বলা হয়নি। কিংবা ইসলামের আলোকে হয়তো বা দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু ঐতিহাসিক যে বিচারের কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি সেটা ছাড়াও তারা এটা ভুলে যায় যে, ইসলাম দুনিয়ার কথা বলেছে। ইসলাম বলেছে, 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানা' - এই কথা তারা ভুলে যায় যে, কুরআনে সূরাতুল বাকারার ২০১ আয়াতে প্রথমত দুনিয়ার কল্যাণের কথা বলা হয়েছে - আখিরাতের কল্যাণের পূর্বে। আবার ইসলামে কাজের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা কাজ কর। আমল কর। কিন্তু তোমরা বসে থাকো - এইকথা ইসলাম বলেনি। আবার ইসলাম ব্যবসার কথা বলেছে। বলেছে সম্পদের ব্যাপক বিতরণের কথা,

www.nagorikpathagar.org

মানুষের অধিকারের কথা। ইসলামে হকের কথা বলা হয়েছে। ইসলামে 'হাক্কুল ইবাদ' অর্থাৎ বান্দার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এগুলোকে যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে একথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, ইসলাম শুধু আখিরাতের কথা বলেছে। শুধু ঈমানের কথা বলেছে। তবে আমি একথাও বলব যে, সাধারণ মানুষ বা যারা জানে না তাদের পুরো দোষও দেয়া যাবে না। কেননা, তারা জুমার খুতবায়, ঈদের খুতবায়, আলেমদের ওয়াজ মাহফিলের আলোচনায় সাধারণভাবে ইসলামের অর্থনীতির কথা শোনেনি। তারা 'মুদারাবা' নামে যে এক ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি আছে সেই 'মুদারাবা'র কথা শোনেনি। মুদারাবা হলো এক পক্ষ কাজ করবে আরেক পক্ষ অর্থ দেবে। আবার তারা 'মুশারাকা'র কথাও শোনেনি। এটা হলো এক ধরনের শরীকদারী ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্প যাতে শরীকদের পুঁজি একত্র হয়। আবার 'ইসতিসনা' বা ম্যানুফ্যাকচারিং কন্ট্রাক্ট (Manufacturing contract)-এর কথাও শোনেনি। যদি বলি, আজকের বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষের মধ্যে কতজন 'ইসতিসনা'র কথা শুনেছে তা চিন্তার বিষয় হবে। কিন্তু এইসব কথা তারা খুতবায়, ওয়াজে শোনেনি। ফলে তাদের কি করে দোষ দেয়া যায় যে, কেন তারা এই প্রশ্ন করে, ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচন করতে সক্ষম কিনা। এই প্রসঙ্গে এখানে একথা বলতে হয় যে, ইসলামের লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ। ইসলামের শ্রেষ্ঠ আলেমগণও তাঁদের পুস্তকাদিতে এই কল্যাণের কথা বলেছেন। এঁদের মধ্যে ইমাম গাযালী, ইমাম শাতিবি, ইবনুল কাইয়্যেম-এর কথা উল্লেখ করা যায়। 'মাকাসিদ আল-শরিয়াহ' বা শরিয়াহর লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ। জনকল্যাণ কি? জনকল্যাণ হচ্ছে যা কিছু ঈমান বা বিশ্বাসের, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রাণ বা জীবন, মাল বা অর্থনীতি, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কল্যাণকর সেগুলোকে তারা বলেছেন, প্রকৃত জনকল্যাণ। আর যা কিছু এসবকে নষ্ট করে অর্থাৎ জীবনের কল্যাণ, অর্থ বা অর্থনীতি কিংবা মালের কল্যাণের বিরোধী হবে, যা কিছু ঈমানের বিরোধী হবে, যা কিছু মানুষের বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করে সেগুলোকে 'মাফাসিদ' বা অকল্যাণ বলে গণ্য করা হবে। (দ্রষ্টব্য: ইমাম গাযালী, আল-মুসতাসফা, ১ম খণ্ড; ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লাম আল-মুয়াক্কিয়িন, তৃতীয় খণ্ড)।

আবার সহজ করে বলতে গেলে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ। আমরা লক্ষ্য করেছি, আধুনিক যুগে যারা ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে লিখেছেন, যেমন ড. ওমর চাপরা, ড. ফাহিম খান, ড. মনওয়ার ইকবাল, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ড. তরিকুল্লাহ খান, ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ড. মনজের কাহাফসহ অন্যান্য বড় বড় ইসলামী অর্থনীতিবিদের কথা যদি বলি তাহলে দেখবো তারা যে ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি খাড়া করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে আদল বা জাস্টিস। তারা কুরআন বিশ্লেষণ করে বলেছেন, কুরআনে প্রায় একশ' আয়াত আছে যেখানে আদল, জাস্টিস, ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে। আবার একশ' আয়াত আছে যেখানে জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা বোঝাতে চাচ্ছেন মোটামুটি প্রায় দু'শ' আয়াতে ইনসাফ করার কথা বলা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

তারা বলেছেন, ইনসাফ করার মূল তাৎপর্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনকে মেটাতে হবে। ইংরেজিতে তারা বলেছেন Need fulfillment করতে হবে। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ (Welfare)। আবার ইসলামী শরীয়তের যে দর্শন, অর্থনীতির যে দর্শন সেখানেও রয়েছে জাস্টিস। আর জাস্টিসের অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে প্রয়োজন মেটানো। জাস্টিসের এছাড়াও অনেক তাৎপর্য আছে। কাজেই যেই অর্থনীতির দর্শনে রয়েছে নিড ফুলফিলমেন্ট বা প্রয়োজন পূরণ করা, তাহলে এটা কি করে বিশ্বাস করা যায় যে, সেই অর্থনীতি দারিদ্র্য বিমোচন করতে চায় না, তা দূর করার কর্মকৌশল দেবে না?

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামী অর্থনীতি দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে? কি কৌশল (Strategy) গ্রহণ করেছে? অর্থনীতিতে এভাবেই ইসলাম তার কৌশল ও কর্মপদ্ধতিকে সাজিয়েছে যে, মানুষ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করবে - এটা হবে শরীয়তের সীমার মধ্যে। সে রোজগার করবে। তার সম্পত্তির ওপর তার অধিকার রয়েছে এবং থাকবে। ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক যে মালিকানা হয় তা তার থাকবে। সে স্বাধীনভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প গড়তে পারবে।

এমনভাবে যদি অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করা যায় বা সাজানো যায় তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা হবে। তবে কিছুটা সময় অবশ্য লাগবেই। এর সবকিছু নির্ভর করে যদি সরকার ইসলামী সরকার হয় কিংবা কমিটেড হয় এবং জনগণ তা চায় কি-না। আর সরকার যদি ইসলামিক না হয় কিংবা ইসলামের প্রতি কমিটেড বা আগ্রহী না হয় বা তার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা অঙ্গীকারাবদ্ধ না হয় অথবা জনগণ যদি এ ব্যাপারে আগ্রহী না হয় তাহলে তো ইসলামের যে কর্মসূচি তা কার্যকর হবে না। এক ব্যক্তি যদি পরাধীন হয়, স্বাধীন না হয় তাহলে তার মধ্যে প্রতিভার স্ফূরণ হয় না। সুতরাং যে অর্থনীতি মৌলিকভাবে স্বাধীন নয় সেখানে অর্থনৈতিক উদ্যোগ বেশি হবে না, প্রবৃদ্ধি (Growth) বেশি হবে না। কিন্তু যেহেতু ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শরিয়াহ্‌র সীমার মধ্যে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে ফলে তা যদি কার্যকর করা যায় তাহলে এখানে ব্যক্তির বিকাশ বা স্ফূরণ পূরণ হবে। অর্থনীতির বিকাশ হবে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ লোক নিজেদের রোজগারের ব্যবস্থা নিজেরা করে নেবে। আর এটাও স্বাভাবিক, যে কোনো অর্থনীতিতে মানুষ নিজেরা নিজেদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করে থাকে।

একথা সত্যি যে, ইসলামী অর্থনীতিতে এমনভাবে স্ট্রাকচার করা হবে যাতে মানুষ নিজেরাই তাদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে। এই প্রসঙ্গটি আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। তারপরও যারা কোনো কারণে রোজগার কিংবা প্রয়োজনীয় আয় করতে পারবে না তাদের দায়িত্ব ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থায় পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনদের ওপর বর্তাবে। আবার তারাও যদি সে দায়িত্ব পালন করতে না পারে তাহলে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির দায়িত্ব পড়বে রাষ্ট্রের ওপর।

এখানে একটা পার্থক্য রয়েছে - ইসলাম যেটাকে ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণ রাষ্ট্র বলেছে, এর সাথে পাশ্চাত্যের কল্যাণ রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্যে ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রে (যেমন সুইডেন) যদি কোনো লোক নিজে তার ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর চলে যায়। এরফলে সেখানে একটা খারাপ দিক দেখা দেয় - তা হলো রাষ্ট্রের ওপর অনেক বেশি বোঝা বাড়ে। আর রাষ্ট্রের ওপর যদি বোঝা বেড়ে যায় তাহলে রাষ্ট্রকে সেটা মোকাবিলা করার জন্য জনগণের ওপর বেশি ট্যাক্স বসাতে হয়। রাষ্ট্রকে অনেক বেশি ঋণ (Borrow) করতে হয়। আর ঋণ নিলে পাশ্চাত্যের সিস্টেমে সুদ দিতে হয়। কাজেই দেখা যায়, বাধ্য হয়ে ঋণ নিতে হয়, তার ওপর সুদও দিতে হয়। অথবা ট্যাক্স করতে হয়। না হলে দু'টোই করতে হয়। যার ফলে কিছুদিন এভাবে চলে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে (long-term) একটা পর্যায়ে যাওয়ার পর এটা আর চলে না, স্থবির হয়ে যায়। এটা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

এ জন্য পাশ্চাত্যের ওয়েলফেয়ার ইকোনমি বা জনকল্যাণ রাষ্ট্রগুলো ক্রমেই রিট্রিট করছে। ক্রমেই তারা পিছিয়ে আসছে জনকল্যাণমূলক প্রোগ্রাম থেকে। এগুলোকে তারা কাট-ছাঁট করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম এই বিষয়টিকে এভাবে মোকাবিলা করছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজে আয়-রোজগার করতে না পারে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবেই তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর পড়বে না; বরং তা তার পরিবারের ওপর পড়বে। তার ছেলের, পিতা বা ভাইয়ের ওপর পড়বে। কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়ের ওপর পড়বে। আর রাষ্ট্র এটা দেখবে যে, তারা এ দায়িত্ব পালন করছে। এখানে যদি কেউ বেআইনি কাজ করে তাহলে তার জন্য রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিতে পারে, তাকে বাধ্য করতে পারবে। এর জন্য তার ওপর আইনগত বাধ্যবাধকতা (Obligation) হবে। কিন্তু এ সবকিছু করার মতো তার যদি কেউ না থাকে তা হলে কেবলমাত্র তখনই তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপরে পড়বে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের ওয়েলফেয়ার সিস্টেমে রাষ্ট্রের ওপর যে বিরাট দায়িত্ব চলে আসে তার তুলনায় ইসলামের ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রে দায়িত্ব কম আসে। যার ফলে ইসলামের ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্র More sustainable, এটা বেশি কার্যকর। এটাকে কার্যকর করাও সম্ভব। যেটা পাশ্চাত্য দীর্ঘমেয়াদে সম্ভব হয় না বলেই সেখানে ওয়েলফেয়ার সিস্টেম ধসে (Collapse) পড়ছে। নর্থ ইউরোপ, বৃটেন, আমেরিকাসহ বিভিন্ন জায়গায় এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। যার ফলে তারা আবার পুরোনো ক্যাপিটালিজম সিস্টেমে ফিরে যাচ্ছে কিংবা যেতে বাধ্য হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

এই ওয়েলফেয়ার সিস্টেম যেটার কথা ইসলাম বলছে তার মধ্যে যাকাত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের যে কর্মসূচি তার মধ্য যাকাত একটা ভূমিকা পালন করবে। সেখানে রাষ্ট্র যাকাত আদায় করবে।

কি পরিমাণ যাকাত আমাদের দেশে আদায় হতে পারে তার একটা হিসাব কিছুদিন আগে আমরা করে দেখেছি। প্রায় ২৪০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব (২০০২ সালের হিসাব)। এটা এক বছরের কথা বলা হয়েছে। এখানে খুব কমই হিসাব করা হয়েছে। এর পরিমাণ আরো বেশি এমনকি পাঁচ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। আমরা কম করে ২৪০০ কোটি টাকা হিসাব করলেও যদি এই টাকা সত্যিই রাষ্ট্র আদায় করে এবং এটা যদি শুধুমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা দারিদ্র্য বিমোচনে বিরাট ভূমিকা রাখবে। কিন্তু যদি ধরি তা রাষ্ট্র আদায় করবে না, ব্যক্তি বা সমাজ করবে আর সেটাও যদি আমরা মেনে নেই তাহলে যে ২৪০০ কোটি টাকা আদায় হবে তা গরীবদের মাঝে বণ্টন (Transfer) হবে, ধনীদের কাছ থেকে। এটা যদি সিস্টেমেটিক্যালি করা যায়, সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে করা যায় এবং এমনভাবে করা যায় যেটা ইসলামের লক্ষ্য, এমনভাবে দেয়া হবে যে গ্রহীতা ব্যক্তি জীবনের মতো স্বাবলম্বী হয়ে যায়। হযরত ওমর (রা.)-এর বিখ্যাত বক্তব্য হলোঃ তুমি এমনভাবে দাও যাতে সে ধনী হয়ে যায়। অর্থাৎ তাকে যেন আর কোনদিন যাকাত না নিতে হয়। যাতে তার কোনো না কোনো কাজের ব্যবস্থা হয়ে যায়। একটা Self-employment হয়। তার যেন একটা ব্যক্তিগত আয়-রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। কাজেই যাকাতের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র করুক বা সমাজ করুক এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

যাকাত ব্যবস্থার সাথে সাথে 'ওয়াকফ' তার ভূমিকা পালন করবে। আমাদের ওয়াকফ সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা এটাকে নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু আমরা জানি যে, ইসলামের ইতিহাসে ওয়াকফ'র বিরাট ভূমিকা ছিল, যেটা বর্তমানে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। সেটাকে আমাদের পুনরুদ্ধার (revive) করতে হবে। এক সময় ইসলামে যে দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে তা মূলত একদিকে যাকাত আর একদিকে ওয়াকফ'র কারণ। এমন সময় গেছে যখন সবাই চাইত কিছু না কিছু সম্পত্তি আল্লাহর পথে দিতে। সেটা দিতো বলেই সেই সময় সকল স্কুল ফ্রি চালানো সম্ভব হতো। ওয়াকফ'র কারণে সকল ইউনিভার্সিটি ফ্রি চালানো হতো। অর্থাৎ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই। ওয়াকফ'র কারণেই সকল চিকিৎসা ফ্রি চালানো হতো। পথিক কিংবা আগন্তুকদের জন্য যে সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল তাও ওয়াকফ সম্পত্তির মাধ্যমেই ফ্রি চালানো সম্ভব হতো।

তেমনিভাবে ওয়াকফকে একটি লম্বা সময় ধরে পুনর্গঠন করার কথা জনগণকে বোঝানো দরকার। জনগণ যদি এটা বুঝতে পারে এবং যদি সত্যিই

www.nagorikpathagar.org

আগের দিনের লোকদের মতো যেভাবে তারা আল্লাহর পথে দান করত, সেভাবে প্রত্যেক ধনীই যদি ওয়াকফ করে যান তাহলে ব্যাপকভাবে সমাজে দারিদ্র্য দূরীকরণে, উন্নয়নে এই ব্যবস্থা একটা ভূমিকা রাখতে পারে।

ড. ওমর চাপরা তার বইতে উল্লেখ করেছেন, একসময় গেছে যখন দশ থেকে পনের ভাগ পর্যন্ত মানুষের সম্পত্তি ওয়াকফতে চলে গিয়েছিল যেগুলোর মাধ্যমে অর্জিত আয় সম্পূর্ণ জনকল্যাণে, মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যবহার করা হতো। আমরা জানি, সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ক্ষমতায় যাবার পরপরই সমস্ত ওয়াকফ প্রপার্টি বাতিল করে দেয়া হয়। এর একটা অন্যতম কারণ হলো যাতে করে সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলামী শিক্ষা বন্ধ হতে পারে। সেখানে স্কুলগুলো চলতো এসব ওয়াকফ প্রপার্টির মাধ্যমে। (দ্রষ্টব্য: Islam in the Soviet Union, Alexander Bennigsen)।

যা-ই হোক, দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা থাকবে যা আগেই উল্লেখ করেছি। সেই সাথে ওয়াকফ তার ভূমিকা পালন করবে। নতুনভাবে, নতুন করে আমাদের ওয়াকফ চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেও তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা জানি, ইসলাম ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সংগঠিত করার কথা বলে। এটা সুদভিত্তিক হবে না। এটা মুদারাবাভিত্তিক, মুশারাকাভিত্তিক হবে। মুরাবাহাভিত্তিক হবে। ব্যবসাভিত্তিক হবে। এখানে শোষণের সুযোগ কম থাকবে। যদিও একথা এখনো পুরোপুরি বলা সম্ভব নয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে। আর একথা দাবি এখন করাও সম্ভব নয়। ইসলামের সামাজিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণে ইসলামী ব্যাংকিংকে পদক্ষেপ নিতে হবে। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ বলেন, ইসলাম যে সামাজিক বিপ্লব চায়, অর্থনৈতিক বিপ্লব বা পরিবর্তন চায়, সেই পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, এই কাজের জন্য অর্থ লাগবে এবং অর্থ আদান-প্রদান হবে ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। সুতরাং ব্যাংককেই এই ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে গেলে আমাদেরকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ওপর যেসব থিওরিটিক্যাল কাজ হয়েছে, তাত্ত্বিক কাজ হয়েছে এবং তার লক্ষ্য সম্পর্কে যেসব কাজ হয়েছে, তার পলিসি সম্পর্কে যে সমস্ত কাজ হয়েছে সেগুলোকে আমাদের পড়তে হবে এবং জানতে হবে।

তেমনিভাবে, ইসলামী রাষ্ট্র তার রাজস্ব নীতিকে (Fiscal Policy) কাজে লাগাবে। রাজস্ব নীতিতে আয় ও ব্যয়ের নীতিগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাবে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যয়ের নীতির ব্যাপক পরিবর্তন হবে। যেমন - ঢাকা শহরে যারা রাস্তা-ঘাটে থাকে (এর মধ্যে নারীর সংখ্যা অর্ধেক) তাদের জন্য কি আমাদের বাজেট থেকে এক-দুই বছর ৫০০ কোটি টাকা করে

www.nagorikpathagar.org

বের করতে পারি না? আমরা কি বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে এদেরকে আবার শহর থেকে যার যার গ্রামে নিয়ে গিয়ে পুনর্বাসন করে দিতে পারি না? কিন্তু এর জন্য দরকার আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে Determind Policy।

এখানে ইসলামের যে ব্যয়নীতি (Expenditure Policy) তার একটা বিরাট ভূমিকা আছে। কিন্তু আমরা সেগুলো করতে ব্যর্থ হচ্ছি, সেগুলো আমাদের করতে হবে। তেমনিভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে মনিটরিং পলিসি এটাতে ইসলামের আলোকে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। কারণ, সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতিবছরই নতুন অর্থ বাজারে ছাড়ে ৫-১০ ভাগ, এটা একটা ক্রিয়েটেড মানি। এতে নুতন অর্থের সৃষ্টি হয়। এই অর্থ যদি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়। সেন্ট্রাল ব্যাংকের এই নতুন অর্থের জন্য যেহেতু কোনো খরচ করতে হচ্ছে না, এর জন্য তাকে কোনো জিনিস বেচতে হচ্ছে না। এটা একদমই আকাশ থেকে পাওয়া অর্থই বলা যায়। যেটা নোট প্রিন্টের মাধ্যমে সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতিবছর বাজারে ছাড়ে। সেই টাকা যদি সরকারকে দেয়ার সময় বলে এটা শুধুমাত্র জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে, দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় করতে হবে তাহলে এর মাধ্যমে সামগ্রিক পরিবর্তন সম্ভব। এ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে কর্জ বা বিনা সুদে দিতে পারে। এ ব্যাপারে ড. ওমর চাপরা তার Towards a just Monetary System গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যয়নীতি, মুদ্রানীতির একটা বিরাট ভূমিকা থাকবে। এসব পলিসি ব্যবহার করে আমাদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে সাহায্য করবে। এরপর যে কথা আমি আগেই বলেছিলাম যে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় ইসলামী সমাজে কঠিন দারিদ্র্য কম ছিল। যাকে আমরা Hardcore poverty বলি তা কম ছিল বা ছিল না। দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ তারা গড়তে পেরেছিল। একেবারেই শুরু থেকে ইসলাম সিস্টেমটিকে আস্তে আস্তে গড়ে তোলে যদিও শুরুতে কিছু দারিদ্র্য ছিলই। কিন্তু উমাইয়া, আব্বাসীয়দের সময় থেকে তা কার্যত সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। আর একথাও আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামে এমন এক সময় গেছে যখন যাকাত নেয়ার লোক পাওয়া যায়নি। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো আজকেও এ দাবি করতে পারবে না যে, সাহায্য নেবার লোক তাদের সমাজে নেই।

যেই সরকারই থাকুক সেই সরকার যদি ইসলামকে অগ্রাধিকার দেয় এবং কমিটেড হয় আর সেই সাথে জনগণ যদি তা গ্রহণ করতে রাজি হয় তাহলে আমার মতে, ইসলামের চেয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের আর কোনো ভালো আদর্শ হতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

ওয়াকফ ঃ প্রয়োজন নতুন আন্দোলন

আমাদের নতুন এক ওয়াকফ আন্দোলন প্রয়োজন। ওয়াকফ'র যে গুরুত্ব তা আজকের দিনে আমাদের সমাজে হারিয়ে গেছে। সে গুরুত্বকে আমাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

ওয়াকফ'র নীতি হলো, যে কোনো ব্যক্তিই তার সম্পত্তির একটি অংশ আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়ে দিতে পারে এবং বলে দিতে পারে সে সম্পদ কিভাবে ব্যবহৃত হবে, কি কাজে ব্যবহার হবে। ওয়াকফ সবসময় ভালো কাজেই ব্যবহার করা যায়, মন্দ কাজে ব্যবহার করা যায় না। ওয়াকফ যিনি করেন তিনিই ওয়াকফ কিভাবে চলবে তার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তার ব্যবস্থাপনা কৌশল বলে দেন। কমিটির মাধ্যমে বা কিভাবে ওয়াকফ পরিচালিত হবে, এ নির্দেশ তিনি দিতে পারেন।

ইসলামের শুরুতেই ওয়াকফ শুরু হয়। প্রথম থেকেই মুসলমানদের স্বভাব ছিল তাদের সম্পত্তির একটা অংশ তারা আল্লাহর পথে দিয়ে যেতেন। এই সম্পদই কিভাবে ব্যয় হবে তাও বলে দিতেন। যেমন - এর মাধ্যমে সেখানে সরাইখানা করা হতো যেখানে পর্যটকরা থাকতে পারত। যারা মুসাফির হতো, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত তারা থাকতে পারতেন। সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। সে সময় বহু হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। সেসব ছোট-বড়-মাঝারি বিভিন্ন আকারে হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সবকিছুই ওয়াকফ'র মাধ্যমে পরিচালিত হতো। ওয়াকফ'র ফান্ড থেকে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা চালু ছিল। সমাজের যত এতিম ছিল তাদের জন্য ওয়াকফ'র মাধ্যমে এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করা হতো। সমাজের দুঃস্থ শ্রেণির শিশুদের জন্য একটি পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তাদের ভরণ-পোষণের সব রকম ব্যবস্থা এই ওয়াকফ ব্যবস্থা থেকে করা হতো। অর্থাৎ বলতে গেলে তখন ওয়াকফ'র একটি বিরাট সামাজিক ভূমিকা ছিল, গুরুত্বও ছিল।

ঐতিহাসিক বিচারে আমরা দেখতে পাই, মধ্য এশিয়ার ইতিহাস পড়ে আমি দেখেছি, মধ্য এশিয়া বিশেষ করে তাতারস্থান, বশখিরিয়া, ভলগা-উরাল

www.nagorikpathagar.org

অঞ্চলের মতো রাশিয়ার মুসলিম অঞ্চল অথবা মধ্য এশিয়ার যেসব অঞ্চল এক সময় রাশিয়া দখল করে নিয়েছিল সেসব জায়গায় ওয়াকফ'র সম্পত্তির পরিমাণ ছিল তাদের ভূখণ্ডের প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ওয়াকফ'র অধীনে থাকার কথা ইতিহাস সাক্ষী দেয়। তখন মূল সম্পদ হিসেবে ভূসম্পত্তিকেই ধরা হতো। এটা আজ থেকে আটশ' বা এক হাজার বছর আগের কথা। এটা শিল্পবিপ্লবের বহু আগের কথা। সে সময় সম্পদ বলতে বোঝাতো একদিকে জায়গা-জমি আর অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য। আমি Pall Mall Press, London থেকে প্রকাশিত Alexander Bennigsen and C.L. Quelquejay - Islam in the Soviet Union বইতে এই বিষয়ে অনেক কিছু দেখেছি। আবার ড. ওমর চাপরা তার Islam and the Economic Challenge বইতে বলছেন, ওয়াকফ'র বিরাট গুরুত্ব রয়েছে এবং একসময় মুসলিম বিশ্বের ১০ থেকে ১৫ ভাগ সম্পদ ওয়াকফ'র অধীনে চলে এসেছিল।

কিন্তু পরবর্তীকালে কমিউনিস্টরা সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করল। ফলে সেসব ওয়াকফ'র অধীনে যেসব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এতিমখানা, সরাইখানা বা হাসপাতাল পরিচালিত হতো তার সবই বন্ধ হয়ে গেল।

আমাদের দেশে একসময় ওয়াকফ সিস্টেম চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে আগ থেকে চলে আসা কিছু ওয়াকফ বাদে নতুন করে ওয়াকফ কম হচ্ছে। আমরা যদি সত্যি সমাজের দুঃস্থ ও দরিদ্রদের জন্য ব্যবস্থা করতে চাই যারা সমাজে অসহায়, বিত্তহীন তাহলে আমাদের নতুন করে আবার ওয়াকফ আন্দোলন শুরু করতে হবে। এর জন্য একটি নতুন ওয়াকফ আন্দোলন শুরু করা উচিত বলে আমি মনে করি। এটা সারা বিশ্বেই শুরু করা উচিত, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে এবং বাংলাদেশে।

আমাদের দেশের কথাই বলি। এখানে যাদের শত কোটি টাকা আছে বা প্রচুর সম্পদ আছে তারা তাদের অর্থ-সম্পদ রেখে মারা গেলে সেই অর্থ-সম্পদে তাদের কি লাভ হবে? তারা তাদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ যেমন; তিন ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ কিংবা দশ ভাগের এক ভাগ ওয়াকফ করে যেতে পারেন। বাকি অর্থ-সম্পদ তাদের পরিবারের জন্য থাকবে। এর জন্য এক একজন এক এক নামে ফাউন্ডেশন গঠন করে যাবেন। ক করবে ক ফাউন্ডেশন, খ করবে খ ফাউন্ডেশন, আর এসবের যদি ওয়াকফ করা ২০, ২৫ কিংবা ৩০ কোটি টাকার সম্পদ থাকে তাহলে তা সমাজের জন্য বিরাট অর্থবহ হয়ে উঠবে। এর জন্য যার একশ' কোটি টাকা আছে সে উপরের উল্লেখকৃত অনুপাতে দিলে দাঁড়ায় ১০, ২৫, ৩৩ কোটি টাকা। এই টাকাই প্রতি বছর ওয়াকফ'র জন্য ব্যবহৃত হবে। এ টাকা থেকে আবার আয়

www.nagorikpathagar.org

হবে। এভাবে যদি আমাদের দেশে ১০০, ২০০, ৩০০ ওয়াকফ ফাউন্ডেশন তৈরি হয় তাহলে তার কি বিপুল প্রভাব সমাজে পড়ে - তা চিন্তা করতে পারি। এসব ফাউন্ডেশন কি করতে পারে? কোনো কোনো ফাউন্ডেশন হাসপাতাল করতে পারে, কেউ এতিমখানা করল, সেই সাথে এতিমখানায় স্কুল-কলেজ করতে পারে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও করতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে পারে। কোনো ফাউন্ডেশন হসপিটাল তৈরি করতে পারে যেখানে কম পয়সায় মানুষ থাকতে পারবে। লোকেরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এলে তাদের থাকার জায়গার অভাব, হোটেল খরচ দিতেও পারে না, কষ্ট পায়, সেখানে অত্যন্ত কম ফি'র মাধ্যমে, এমনকি বিনামূল্যে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেহেতু এটা ওয়াকফ প্রপার্টি তাই ফ্রিও করা যেতে পারে। না হলে খুব সামান্য ফি করা যেতে পারে। আবার কোনো ফাউন্ডেশন শুধু এমন হতে পারে যে তারা বৃদ্ধ নিবাস তৈরি করে বৃদ্ধদের দেখার ব্যবস্থা করবে। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। বিধবাদের দেখাশোনার জন্যও হতে পারে। এমনিভাবে বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সকল অসহায়ের দেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ওয়াকফ কাজটি হবে যাকাতের অতিরিক্ত এবং যাকাত থেকে আলাদা। মানুষ যাকাত তো দেবেই। যাকাতের মাধ্যমেও দারিদ্র্য বিমোচনের বিরাট কাজ হতে পারে। আবার এসব ফাউন্ডেশনের মাধ্যমেও যাকাতকে অর্গানাইজ করা যায়। তারা ওয়াকফ বাদেও যাকাতের জন্য একটা স্পেশাল ফান্ডের ব্যবস্থা করতে পারে। প্রয়োজনে তা শুধুমাত্র যাকাতের খাতেই ব্যয় হবে। সেটা কোনো সমস্যা হবে না। আর যাকাতের মাধ্যমেও বিপুল পরিমাণ দরিদ্র পরিবারকে আত্মনির্ভরশীল করা যায়। আমাদের দেশে যাকাতকে প্রধানত স্বনির্ভর করার কাজে ব্যয় করা উচিত। তারপর মানুষের অনেক ঋণ থাকে, সেই ঋণ প্রদানে ব্যবহার করা উচিত। যাকাতের মাধ্যমে গরীব, মিসকিনদের এলাউন্স বা ভাতা দেয়া উচিত। এটা বৃদ্ধ ভাতা বা বিধবা ভাতা হতে পারে।

যাকাত আদায়ের পরিমাণ আমাদের সমাজে আগের তুলনায় বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে। প্রায় শিল্পপতিই আজ যাকাত দেয়। তাদের যাকাতের টাকা যদি তারা নিজেরা সঠিকভাবে ব্যয় করে তাহলেও তার প্রভাব সমাজে পড়বে। এই যাকাতের টাকা দিয়ে তারা বিপুল পরিমাণ রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। সমাজের বিধবাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করতে পারেন। বিত্তহীন ও অসহায়দের জন্য ভাতা সিস্টেম করতে পারেন। আর এই যাকাতের সঙ্গে যদি যে ওয়াকফ'র কথা আগে বললাম সে ওয়াকফ যোগ হয় তাহলে তার দ্বারা কি বিরাট কাজই না হতে পারে সমাজে।

এ জন্য আমি মনে করি, আমাদের দেশে নতুন করে একটি ওয়াকফ আন্দোলন দরকার। আমার আবেদনও থাকবে, যারা কোটিপতি বা শতকোটি টাকার মালিক তারা একটি করে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করবেন। তারা সব সম্পদ

www.nagorikpathagar.org

তাদের সন্তান বা পরিবারের জন্য না রেখে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ ওয়াকফ করে দিয়ে এই ফাউন্ডেশনের জন্য রাখবেন। তারাই একটি কমিটি গঠন করবেন বা বলবেন কি ধরনের কমিটি হবে। কমিটির মাধ্যমেই ফাউন্ডেশন পরিচালিত হবে। নগদ টাকাই যে দিতে হবে, তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন, কারও দশটা শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকলে তিনটা প্রতিষ্ঠান ওয়াকফ দিয়ে দিতে পারেন। এতে তিনটি কোম্পানি ওয়াকফে চলে গেল। এর মানে হলো জমির আয় থেকে যেমন ব্যবস্থা তেমনি এই ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান থেকেও আয় হবে। সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকবে ফাউন্ডেশন। সেখান থেকে যে আয় আসবে তা সমাজকল্যাণ কাজে ব্যয় হবে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, বর্তমানে যে ওয়াকফ আছে তার পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয় এবং তা খুব একটা ভালোও চলছে না। আবার যাও আছে তার যে ব্যবহার হতে পারত তা হচ্ছে না। এর জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা আছে। আবার যারা এর মোতাওয়াল্লী তাদেরও ব্যর্থতা আছে। এসবই সত্য কথা। কিন্তু আমি ওয়াকফ'র কথা উল্লেখ করেছি তা কিছুটা নতুন ধরনের। এটা একেকটা ফাউন্ডেশন ধরনের হবে বা ট্রাস্ট ধরনের হবে। ফাউন্ডেশন বা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় তা পরিচালিত হবে। সেখানে একটা সিস্টেমেটিক ম্যানেজমেন্ট হবে। সেখানে প্রচলিত ওয়াকফ'র পরিণতি হবার সম্ভাবনা নেই। এখানে কোনো একক ব্যক্তি কর্তৃক অপব্যয়, অপব্যবহারের কোনো সুযোগ থাকবে না। আর বর্তমানে যেসব ওয়াকফ আছে তা খুব সামান্য এবং বাস্তবে এসব দিয়ে তেমন কিছুই হবে না। এগুলো যেমন আছে তাই থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ওয়াকফগুলো হলো কতকগুলো দরগাকেন্দ্রিক, এর আয় সমাজের মানুষের খুব একটা কাজেও লাগছে না। কিছু ওয়াকফ মসজিদ কর্তৃক পরিচালিত। এগুলো চলবে। কিছু ওয়াকফ কর্তৃক এতিমখানা চলছে। এটাও চলুক। অনেক মাদ্রাসা ওয়াকফ চালায়। কিছু কিছু ওয়াকফ মসজিদের খরচ বহন করে। এসবই ভালো। এসব থেকে আমাদের যে নতুন প্রকৃতির ওয়াকফ তা হবে ভিন্ন ধরনের এবং অনেক উন্নত। এখানে মডার্ন কর্পোরেশন ধরনের ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করা হবে। ফাউন্ডেশন বা ট্রাস্ট যাকে বলা হয়, এখানে সেটাই ব্যবহার করা হবে। তখন এ ওয়াকফ দ্বারা অনেক ভালো কাজ করা সম্ভব হবে।

এটা সম্পূর্ণ নতুন টাইপ বলে জিরো থেকেই শুরু করতে পারি। আগে হয়তো কোনো ব্যক্তি কোনো মাদ্রাসাকে লিখে দিত, আকারও ছোট ছিল। সেটা কখনো বড় আকার ধারণ করেনি। আর সে যুগে আজকের মত এত সম্পদশালী ব্যক্তিও ছিলো না। এখন অনেক পরিবারই ১০০, ২০০, ৫০০ কোটি টাকার মালিক। এদের থেকেই নতুন ওয়াকফ'র কথা চিন্তা করা সম্ভব। তবে আজকের ব্যক্তি ওয়াকফ খুব কম। সেটাও চলতে থাকবে। কিন্তু তার থেকে বর্তমান প্রস্তাবিত ফর্মে করাই ভালো।

www.nagorikpathagar.org

এর জন্য সরকারি আইন থাকবে। কেউ যেন এর অপব্যবহার বা অপচয় না করতে পারে। তবে কোনভাবেই সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। এটা প্রাইভেট পর্যায়ে থাকবে। যিনি ওয়াকিফ তিনি বলে দিবেন কি কাজে, কিভাবে বা কোন কোন খাতে এটা ব্যয় হবে। তিনি বলতে পারেন, কোন কাজে ব্যয় করা হবে। এর মানে হলো আসলে সব কাজেই ব্যয় করা যাবে। কিন্তু বাস্তবে সবাই সব কাজ করতে পারে না। কাজেই কাউকে হাসপাতাল, কাউকে এতিমখানা বা স্কুল-কলেজ দিয়ে যেতে হবে। এটা নানা ধরনের হতে পারে। আমাদের দেশে তাই সার্বিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য এই নতুন ধরনের ওয়াকফ বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং, বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় দেশেই নতুন করে ওয়াকফ আন্দোলন শুরু করা দরকার। আশা করি, জাতির চিন্তাবিদ, স্কলার ও আলেমগণ এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করবেন। আর সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ সেদিকে নজর দেবেন এবং এগিয়ে আসবেন।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়করণ ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ

বিগত ছয়-সাত দশক যাবত মুসলিম বিশ্বে জাতীয়করণ (Nationalization) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকের শেষের দিক থেকে মুসলিম বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির যাঁতাকল হতে স্বাধীনতা লাভ করতে শুরু করে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এসব মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে হয়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনীতির পুনর্গঠনে সরকারের ভূমিকা মুখ্য হয়ে ওঠে। দূর ভবিষ্যতের জন্য এসব সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

এ প্রেক্ষিতে জাতীয়করণের বিষয়টি একটি মূল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মুসলিম দেশসমূহের সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহ এ ব্যাপারে ইসলামের মতাদর্শকে উপেক্ষা করতে পারেনি। ইসলাম প্রকৃতিগতভাবেই একটি ব্যাপক বুদ্ধিভিত্তিক আদর্শ জীবন ব্যবস্থা। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে হোক অথবা কর্ম পদ্ধতির ক্ষেত্রে সর্বত্রই ইসলামের কিছু বক্তব্য রয়েছে। ফলে মুসলিম দেশসমূহে এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে যে ভূমি, উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণসমূহ অথবা কোনো সম্পদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে পারে কিনা এবং যদি তা হয়, তবে তা কি শর্তে ও কি উদ্দেশ্যে এবং ইসলামে মালিকানার ধারণাই বা কি?

আলোচ্য প্রবন্ধে মুসলিম অর্থনীতিবিদগণ ইসলামে মালিকানা বলতে কি বুঝেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মালিকানার ধারণা, এ ব্যাপারে বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের মনোভাব কি এবং ভবিষ্যতে মুসলিম দেশসমূহের জন্য কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব।

ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রকৃত মালিকানা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর এবং মানুষ আমানতদার হিসেবেই সম্পদের অধিকারী হয়। তাই সে ইসলামী শরিয়তের বিধান ও উপরে বর্ণিত অর্থনৈতিক দর্শন মোতাবেক আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সম্পদ আহরণ, এর ব্যবহার

www.nagorikpathagar.org

ও হস্তান্তর খোদা নিরূপিত সীমারেখার মধ্যে এবং আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মেই হতে হবে। ব্যক্তিমালিকানার অধিকারের সাথে সাথে অন্যদের প্রতি কিছু দায়-দায়িত্বও নির্দিষ্ট করা আছে। ব্যক্তিগত সম্পদের পর সরকারি মালিকানা ইসলামের একটি কেন্দ্রিয় ধারণা। এ দু'টোর সীমারেখা দৃঢ়ভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি বরং অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কতগুলো নীতির আলোকে তা নির্ধারিত হবে।[১]

ইসলামের প্রথম যুগের অর্থনীতিবিদগণ ব্যক্তিগত সম্পদ ও মালিকানার উপর জোর দিয়েছেন। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হলো প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের জীবনধারা - যারা ব্যক্তিগত ভূমি ও ব্যবসার অধিকারী ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষিজীবী বা ব্যবসায়ী। ব্যবসা ও কৃষি সম্পর্কে এবং এর বৈধ ও অবৈধ দিক সম্পর্কে হাদিস শাস্ত্রে বিস্তারিত অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে রচিত ফিকাহ্ শাস্ত্রেও এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা রয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যবসা, কৃষি ও শিল্পের বৈধতা সম্পর্কে প্রথম যুগের পণ্ডিতগণের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আল-কুরআন ব্যবসার অনুমতি দিয়েছে (সূরা বাকারা: আয়াত ২৭৬), সম্পদ উপার্জন ও মানুষের কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছে (সূরা জুমা: আয়াত ১০), উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তরের অনুমতি দিয়েছে (সূরা নিসা: আয়াত ৭,১১,১২,১৭৬) যা ব্যক্তিগত সম্পদ ও মালিকানার স্বীকৃতির প্রমাণ। বর্তমানকালে এ মতের প্রবক্তা হচ্ছেন মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী (মাশাইয়াত-এ ইসলাম) ও মিশরের সাইয়্যেদ কুতুব (ইসলামে সামাজিক সুবিচার)। তবে তারা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু এটাকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে চান।

তবে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত মালিকানার কেন্দ্রীয় অবস্থানকে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ-এর দীর্ঘ উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, শাসক ও পরামর্শদাতাদের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবহারের উপায় উপকরণ সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করার অধিকার সমাজের রয়েছে। সমগ্র সম্পদের মালিক আল্লাহ। তিনি সমাজের কল্যাণের জন্যই এসব সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের বিধান হচ্ছে যে, আল্লাহর মালিকানাধীন সব সম্পদই সমাজের কল্যাণের জন্য এবং সম্পদের উপর সমাজেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্যক্তির নয়। সমাজ প্রতিনিধিত্বকারী শাসক শ্রেণির মাধ্যমে জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে কোনো সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা রহিত করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। যদিও ইসলাম সীমাহীন মালিকানার অনুমতি দেয় তথাপি সমাজ হক্কুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার/জনকল্যাণ) নিশ্চিত করা ও এর সুষম ব্যবহারের লক্ষ্যে ব্যক্তিমালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারে। সমাজ তার প্রতিনিধিদের

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমেই এটা করতে পারে। শহরাঞ্চলের জমিজমা, বাড়ি-ঘর ও কৃষি ক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণেও নীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।[২]

মুসলিম পণ্ডিতবর্গ 'জাতীয়করণ' বিষয়টি সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন বলে আমার মনে হয়। এর দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত ইসলাম তত্ত্বগতভাবে এ বিষয়টির ব্যাখ্যার ব্যাপারে নমনীয়তা অবলম্বন করেছে। কেননা ইসলামে একদিকে পেশা ও উপার্জনের অধিকার (সূরা বাকারা: আয়াত ২৭৫), ব্যক্তিগত সম্পদের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপের নিষিদ্ধতাকে (সূরা নিসা: আয়াত ২৯; বিদায় হজ্জের ভাষণ) গুরুত্ব দিয়েছে, অপরদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার, অন্যের অধিকার (সূরা বাকারা: আয়াত ১৭৭ ও সূরা তওবা: আয়াত ১০৩) এবং সম্পদের সর্বাধিক বন্টনের (সূরা হাশর: আয়াত ৭) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ইসলামী পণ্ডিতগণের মধ্যমপন্থা অবলম্বনের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বিশ্বে বিগত দিনের জাতীয়করণের অভিজ্ঞতা। জাতীয়করণ অন্যায় ও বেআইনীভাবে অর্জিত ভূমির উপর সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে দিতে সাহায্য করেছে; অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র ও সেক্টরে শোষণের অবসানে সহায়তা করেছে। অপরদিকে জাতীয়করণ অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও উৎপাদনে ঘাটতি বৃদ্ধি করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করেছে। ফলে মুসলিম অর্থনীতিবিদগণ সতর্কতার সাথে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং জাতীয়করণ করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন কেবল যেখানে সামাজিক কল্যাণ ও বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে জাতীয়করণ প্রয়োজন।

অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় - এ তিন প্রকারের মালিকানা দেখতে পাই। প্রাকৃতিক সম্পদ যথা - বন, খনি, পানি সম্পদ এবং বিশাল ভূখণ্ড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ছিল। চারণভূমি, সমাধিস্থান ইত্যাদি স্থানীয় সমাজের প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিক ছিল সমাজ, ব্যক্তি নয়। তবে অধিকাংশ কৃষিভূমি, ঘর-বাড়ি, কারখানা, পশুসম্পদ ইত্যাদি ব্যক্তি মালিকানায়ই ছিল। হাদিসে ব্যক্তিগত মালিকানার বিস্তারিত বিবরণ আছে। প্রতিটি হাদিস ও ফিকাহর গ্রন্থে ব্যবসা, কৃষি ইত্যাদি সম্পর্কে পৃথক পৃথক অধ্যায় রয়েছে যা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, ব্যক্তি মালিকানাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে মালিকানার সাধারণ রূপ ছিল। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে তত্ত্ব ভিত্তিক মালিকানা নির্ধারণে এ বিষয়টির বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না যেমনটি কোনো কোনো লেখক করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় বনাম ব্যক্তি মালিকানার বিষয়টি ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য ইসলামের প্রথম যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের পর সদ্য অধিকৃত ভূমি বিজয়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণ

www.nagorikpathagar.org

করা হবে – না রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে এ নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাহাবাদের মধ্যে এক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। হযরত যুবায়ের, বিলাল, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সালমান ফারসী এবং আরও কতিপয় সাহাবি (রা.) অধিকৃত ভূমি সৈনিকদের মধ্যে বিতরণের দাবী জানান। অপরদিকে উমর, আলী, মুআয বিন জাবাল (রা.) ভবিষ্যৎ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধিকল্পে এসব ভূমি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। দু'-তিন দিন যাবৎ দীর্ঘ বিতর্কের পর মজলিশ-ই-শুরায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ সব ভূমি রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে যা সাহাবিগণের দ্বারা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। বিজিত ভূমি রাষ্ট্রীয় ভূমিতে পরিণত হয় এবং তা একপ্রকার ভূমিকর (খারাজ) এর বিনিময়ে কৃষকদের নিকট ইজারা দেয়া হয়। ভূমি করের বাৎসরিক আয় রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালন ও জনকল্যাণে ব্যয় করা হত।[৩]

এ ঘটনা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে যখন কোনো সম্পদকে রাষ্ট্রীয় অথবা ব্যক্তি সম্পদে পরিণত করার এখতিয়ার থাকে তখন জনকল্যাণের বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। আর কিয়াসের ভিত্তিতে এর অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ দৃষ্টান্ত সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে।

বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র ইরান ও পাকিস্তানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বীমা ও (ভারী) মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকাংশ আলেমদের সমর্থনে জাতীয়করণ করা হয়েছে। ইরানের উলামা পরিচালিত সরকার জাতীয়করণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এমনকি বাংলাদেশেও ইসলামী দলসমূহ ইতোমধ্যে জাতীয়করণকৃত মূল সেক্টরগুলোর বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উলামা সমাজ ও ইসলামী দলসমূহের নিকট ক্রমশ গণস্বার্থে মূল অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর জাতীয়করণ করার প্রয়োজনীয়তা গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে সম্পদের কেন্দ্রীভূত করে পাহাড় গড়া অর্থনৈতিক অবিচার এবং সামাজিকভাবে মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রতিরোধ কল্পে 'জাতীয়করণ' ইসলামী সরকারের একটি কর্মপদ্ধতি হতে পারে কিনা তা এ পর্যায়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। সম্পদের কেন্দ্রীভূত করার ক্ষেত্রে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা[৪] এবং ন্যায় বিচারের (সুষ্ঠু বণ্টনের)[৫] উপর গুরুত্বারোপ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সমাজের সকল প্রকার অবিচার ও অসাম্য বিদূরিত করা নবীদের একটি কর্তব্য ছিল যা সূরা হাদীদে উল্লেখ করা হয়েছে।

> নিশ্চয়ই আমরা নবীদেরকে স্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি, তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে গ্রন্থ এবং আরও দেয়া হয়েছে সত্যাসত্য নিরূপণের মানদণ্ড, যাতে তারা ভারসাম্য ও ইনসাফের উপর মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। (সূরা হাদীদ: আয়াত ২৫)

www.nagorikpathagar.org

নবী রাসূলগণের অবর্তমানে মানবতাকে ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করা মুসলিম মিল্লাত বিশেষ করে সরকারের দায়িত্ব। যদি কোনো উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে ভারসাম্য বিনষ্ট হয় তাহলে তা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। ক্ষতিপূরণসহ বা ক্ষতিপূরণ ব্যতিত (অবৈধ পন্থায় আহরিত সম্পদের ক্ষেত্রে) জাতীয়করণ ইসলামী সরকারের একটি কর্মপন্থা হতে পারে। যাহোক, অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা কর্মপন্থা ইনসাফ ও জনগণের প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রতিফলিত মতামতের ভিত্তিতে হতে হবে। অনুমান ভিত্তিক বা কারো খেয়ালখুশী মতো তা করা ঠিক হবে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাতীয়করণ (Nationalization) পরিভাষার পরিবর্তে জাতীয় ব্যবস্থাপনা (National Management) পরিভাষাটি ব্যবহার করা অধিক যুক্তিযুক্ত। জাতীয় ব্যবস্থাপনা পরিভাষাটি ইসলামী ভাবধারার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল বলে মনে হয়। কেননা ইসলামে সরকার বা ব্যক্তি কেউ মালিক হননা, সবাই ব্যবস্থাপনা করেন।

তথ্যসূত্র

১. Nazatullah Siddiqi: Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature, Islamic Foundation, UK. খুরশীদ আহমদ সম্পাদিত, দশম অধ্যায়, পৃষ্ঠা: ১৯৭।

২. শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ: আল মাল ওয়াল হুকুম ফিল ইসলাম, নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী কর্তৃক উদ্ধৃত।

৩. দ্রষ্টব্য: ক. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হাশরের তাফসির, সপ্তদশ খণ্ড।

খ. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ।

গ. ইমাম আবু উবায়েদ, কিতাবুল আমওয়াল।

৪. সূরা হাশর ঃ আয়াত ৭।

৫. সূরা নহল ঃ আয়াত ৯০।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা

অর্থনীতিতে ইসলামী সরকারের ভূমিকা আলোচনার পূর্বে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা এর উপরেই নির্ভর করে অর্থনীতিতে সরকার কি ভূমিকা নেবে।

ইসলামী অর্থনীতির (প্রকৃতপক্ষে গোটা ইসলামী জীবনব্যবস্থা বা বিধানের) মূল লক্ষ্য হচ্ছে 'আদল' ও 'ইহসান' কায়েম করা। এ সম্পর্কে কুরআন পাকের ঘোষণা হচ্ছে:

> আল্লাহ তোমাদের আদল, ইহসান ও নিকট লোকদের অধিকার আদায়ের আদেশ দিচ্ছেন ও অশ্লীলতা, দুর্নীতি ও অবাধ্যতা নিষেধ করেছেন। (সূরা নহল: আয়াত ৯০)

আদল ও ইহসানকে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার কথাই আল্লাহপাক বলেছেন। কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই আদল ও ইহসানকে (সুকার্যক্রম বা good conduct) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হচ্ছে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক জুলুমের পন্থাকে নিষিদ্ধ করে দেয়া ও এমন সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাতে দেশের ভেতরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণিতে শ্রেণিতে, অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচার কায়েম হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচারের অর্থ হবে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের শোষণ বন্ধ করা। আজকাল উন্নত রাষ্ট্রসমূহ দরিদ্র দেশসমূহকে কাঁচামালের কম দাম দিয়েও শিল্পজাত দ্রব্যের উচ্চ দাম আদায় করার মাধ্যমে শোষণ করে থাকে। শোষণের আরো অনেক উপায় আছে।

ইসলামী অর্থনীতির সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এটিই প্রধান বিষয় এবং কোনো যুক্তিতেই সামাজিক সুবিচারের মূলনীতিকে ক্ষুণ্ন করা যাবে না। ইসলামী অর্থনীতির অন্যান্য লক্ষ্য যেমন সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, জীবিকা অর্জনের স্বাধীনতা, বঞ্চিতদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানো ও মানবিক মর্যাদার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার কায়েম করা। কাজেই অন্যসব অর্থনৈতিক বিবেচনাকে সামাজিক সুবিচার মূলনীতির অধীনস্থ মনে করতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে সামাজিক ও

www.nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক সুবিচার ব্যাহত করে এমন কোনো অর্থনৈতিক নিয়ম বা নীতিকে কার্যকর থাকতে দেয়া কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

সুবিচার এবং সুকার্যক্রম প্রতিষ্ঠার যে আদেশ আল্লাহপাক দিয়েছেন তা ইসলামী সরকারসহ প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর ফরয। এ ফরয পালন করা থেকে কোনো মুসলমান বা সরকার অব্যাহতি পেতে পারে না। এছাড়া আল্লাহপাক স্পষ্টভাবে কুরআন মজীদে ইসলামী সরকারের ভূমিকা এভাবে উল্লেখ করেছেন:

> তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করা হলে তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দান করে, সুনীতির প্রতিষ্ঠা করে ও দুর্নীতির প্রতিরোধ করে। (সূরা তওবা: আয়াত ৭১)

এ আয়াতে আল্লাহপাক মারুফের প্রতিষ্ঠা ও মুনকারের প্রতিরোধের কথা বলেছেন। আদল ইহসান করতে হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মারুফকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মুনকারকে প্রতিরোধ করতে হবে। মারুফ বা সুনীতি ও মুনকার বা দুর্নীতি শব্দ দু'টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সবক্ষেত্রেই এটি সক্রিয় রয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'আমরু বিল মারুফ' এর সঠিক প্রয়োগের অর্থ হবে সর্ববিধ উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং 'নাহি আনিল মুনকার' এর অর্থ হবে অর্থনৈতিক জুলুমের সব উপায় ও পন্থাকে বন্ধ করে দেয়া। অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েম ও জুলুমের অবসানের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব আইন রচনা করতে পারে এবং তার প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা কুরআনের এ আয়াতে ইসলামী সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য কি ধরনের অর্থনৈতিক পন্থা ও উপায়কে জুলুম বলে গণ্য করা হবে তা নির্ভর করবে শরিয়তের ভিত্তিতে গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের উপর। পার্লামেন্টের এ ক্ষমতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অজুহাতে খর্ব করা যেতে পারে না। এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইসলামী সরকার সব ধরনের মুনাফাখোরী, মজুতদারী, কার্টেল, মনোপলী, চোরাচালান ও অন্য সব অন্যায় পন্থা বন্ধ করে দিতে পারে। এসব বন্ধ করে দেয়ার জন্য আইন তৈরি করা সরকারের জন্য অপরিহার্য। অন্যদিক থেকে বিচার করলেও আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী সরকারের ক্ষমতা সম্পর্কে একই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারবো। ইসলামী আইন রচনার তিনটি ভিত্তি হচ্ছে - কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদ। ইজতিহাদ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কিয়াস বা অনুমিত সিদ্ধান্ত (Systematic inference) হচ্ছে ইজতিহাদের অন্যতম পদ্ধতি। ইজতিহাদের অন্য উল্লেখযোগ্য নীতি ইসতিহসান বা ইসতিসলাহ অর্থাৎ আইনের এমন ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা যাতে জনগণের মঙ্গল ও সুবিধা হয়। এখন দেখা যেতে পারে যে, শরিয়তে কেন সুদ ও জুয়াকে হারাম করা হলো, কেন যাকাতকে ফরয করা হলো এবং কেন বা অর্থ যেন ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হলো?

www.nagorikpathagar.org

স্পষ্টতই আল্লাহপাক সুদ ও জুয়াকে সমাজের জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেই নিষিদ্ধ করেছেন। তেমনিভাবে যাকাতকে সমাজের জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কল্যাণকর হওয়ার কারণেই ফরয করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট কিয়াস করা যায় যে, আল্লাহ পাক ক্ষতিকর অর্থনৈতিক নিয়ম ও পন্থাকে অপছন্দ করেন এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর অর্থনৈতিক পন্থাকে পছন্দ করেন। কাজেই কিয়াসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, সমাজ ও ইসলামী সমাজের দায়িত্ব হলো ক্ষতিকর অর্থনৈতিক উপায় ও পন্থাকে উৎখাত করা এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর অর্থনৈতিক উপায় ও পন্থাকে উৎসাহিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

শরিয়ত ও ইসলামী আইনের লক্ষ্য সম্পর্কে ইমাম ইবনে কাইয়্যেমের মত এখানে উল্লেখ করা হলো:

> আল্লাহতায়ালার নবী পাঠানো ও কিতাব নাজিল করার উদ্দেশ্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যা হচ্ছে গোটা সৃষ্টির মূলনীতি। আল্লাহর নাজিল করা প্রতিটি বিষয় এ কথাই প্রমাণ করে যে, এসবের সত্যিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য ও ইনসাফ এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। যেভাবেই আইন রচনা করা হোক না কেন আইনকে সত্য ও ইনসাফের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আইনের আসল লক্ষ্য কিভাবে আইন পাওয়া গেল তা নয়। কিন্তু আল্লাহ আমাদের কিছু আইন দিয়ে কতকগুলো উদাহরণ স্থাপন করেছেন এবং আইনের কয়েকটি যুক্তিসংগত ভিত্তি দিয়েছেন। আমরা তাই ন্যায়সংগত সরকারি নীতি ও আইনকে শরীয়তের অংশ মনে করি। শরীয়তের বরখেলাপ হওয়া মনে করি না। এসবকে রাজনৈতিক নীতি বলা কেবল পরিভাষার ব্যাপার। আসলে এগুলো শরীয়তেরই অংশ, তবে শর্ত এই যে, এগুলিকে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।[১]

এই উদ্ধৃতিটি বর্তমানকালে ইসলামী আইন রচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক তৈরি করা আইনের ধর্মীয় প্রকৃতি এ থেকে প্রমাণিত হয়। আরো একদিক থেকে আমরা ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারি। শরীয়তের পরিভাষায় 'ফরজে কেফায়া' বলা হয় সে সব সামাজিক ফরজকে যা নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরজ নয়, কিন্তু যা সমাজকে অবশ্য করতে হয়। এ সম্পর্কে ইমাম শাতিবি লিখেছেন:

> ফরজে কেফায়া'র অর্থ – এগুলি নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরজ নয়। এগুলি গোটা সমাজের দায়িত্ব। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সব সাধারণ জনকল্যাণকর কাজগুলি অব্যাহতভাবে হতে থাকার অবস্থা করা যার অবর্তমানে ব্যক্তিস্বার্থও নিরাপদ থাকে না। এগুলি পূর্বে উল্লিখিত

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিগত ফরজগুলিকে পূর্ণ ও শক্তিশালী করে। কাজেই এগুলি অত্যন্ত জরুরি কাজ। ফরজে কেফায়াগুলি সব মানুষের কল্যাণের জন্য। এজন্যই এসব দায়িত্ব ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি, কারণ তাহলে এগুলি ব্যক্তিগত ফরজে পরিণত হতো। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে তার নিজের সব দায়িত্বই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয় না, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, সমাজ ও সাধারণ মানুষের কথা তো অনেক বড় ব্যাপার। সে জন্যই আল্লাহতায়ালা সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর দায়িত্ব সমাজের উপর অর্পণ করেছেন। এটাই সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ভিত্তি।[২]

জিহাদ, ইসলামের প্রচার, সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শিল্প ও সেবা 'ফরজে কেফায়া'র অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "শাফিয়ী ও হামবলী ফিকাহর অনুসারী অনেক ফকীহ এবং গাজ্জালী ও আলজওজীর মতে এসব শিক্ষা হচ্ছে 'ফরজে কেফায়া', কেননা (জাতির) অর্থনৈতিক জীবন এসব শিক্ষা ছাড়া চলতে পারে না।"[৩] কাজেই দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সেবা ও শিল্পগুলো কায়েম রাখা সমাজ ও সরকারের দায়িত্ব।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োজন, উপরের আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, সে ক্ষমতা ইসলামী শরিয়তে সরকারকে দেয়া হয়েছে। মুসলিম ফকীহরাও এ মত সমর্থন করেছেন। এ নীতিগত আলোচনার পর বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামনে রেখে ইসলামী সরকারের বাস্তব অর্থনৈতিক ভূমিকা কি হতে পারে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সব মুসলিম দেশেই ইসলামী সরকারের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে শরীয়ত প্রদত্ত সব অধিকার হেফাজত করা। ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তিকে আয় উপার্জনের অধিকার দান করেছে। কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে:

> আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন।
>
> (সূরা আল-বাকারা: আয়াত ২৭৫)

> যখন নামাজ শেষ হয়, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর দেয়া রিজিক অনুসন্ধান কর। (সূরা জুমুয়া: আয়াত ১০)

ওপরের আয়াত দু'টি হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কর্মের স্বাধীনতা (Freedom of work and enterprise) ইসলামের একটি বুনিয়াদী নীতি। ইসলামে কেবল কর্মের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি বরং জীবিকার জন্য কাজ করাকে ফরজ করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ অধিকারকে অপব্যবহার করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা রক্ষা করা ইসলামী সরকারের কর্তব্য।

www.nagorikpathagar.org

তেমনিভাবে জায়েজ পথে অর্জিত ধন-সম্পদ এবং ইসলামী উত্তরাধিকার আইন বলে পাওয়া ধন-সম্পদ নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখা ও ভোগ-দখল করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইসলাম দান করেছে। কুরআন মজীদে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে:

> তোমাদের মাল একে অপরে অন্যায়ভাবে খেয়ো না।
>
> (সূরা আল-বাকারা: আয়াত ১৮৮, সূরা নিসা: আয়াত ২৯)
>
> পুরুষগণ যা উপার্জন করে তা তাদের এবং স্ত্রীলোকগণ যা উপার্জন করে তা তাদের। (সূরা নিসা: আয়াত ৩২)

কুরআন পাকে আরো বলা হয়েছে,

> তারা কি চিন্তা করে না যে আমি আমার ক্ষমতায় তাদের জন্য জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করেছি, যেসবের তারা মালিক হয়ে থাকে। (সূরা ইয়াসিন: আয়াত ৭১)

এ আয়াতে আল্লাহ্‌পাক মানুষের জন্য 'মালিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য মানুষ কখনো নিরঙ্কুশ মালিক হতে পারে না। নিরঙ্কুশ মালিকানা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর। কেননা কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে ঘোষণা রয়েছে যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মালিক হচ্ছে আল্লাহ। কাজেই মানুষের অধিকার হচ্ছে আমানতী মালিকানার। মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসেবে আমানতদার মাত্র। আল্লাহর আদেশ-নির্দেশের অধীনেই তাকে তার ধন-সম্পত্তি ভোগ-ব্যবহার করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের আমানতী মালিকানার অধিকার সংরক্ষণ করবে।

অবৈধ সম্পত্তি

নাজায়েজ পন্থায় জুলুম করে অর্জিত সম্পত্তি রক্ষা করা ইসলামী সরকারের দায়িত্বের অংশ নয়। বরং অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ ইসলামী সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। কেননা সব অবৈধ পন্থাই হচ্ছে হারাম ও মুনকার, আর মুনকার নির্মূল করা হচ্ছে ইসলামী সরকারের প্রধানতম দায়িত্ব।

অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেয়ার অথবা তার মূল মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার অনেক নজির ইসলামী ইতিহাসে রয়েছে। যেসব শাসনকর্তা তাদের সরকারি পদের সুযোগ নিয়ে বিত্ত-সম্পত্তি করেছিলেন তাদের সম্পত্তির এক অংশ হযরত ওমর (রা.) বাজেয়াপ্ত করেছেন। এ কারণে তিনি একবার ওমর বিন আল আস ও সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের অর্ধেক মাল বাজেয়াপ্ত করেন।[৪]

হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রা.) ক্ষমতা গ্রহণ করার পর বনি উমাইয়ার লোকেরা অন্যদের যেসব জমাজমি ও সম্পদ জোরজবরদস্তি করে বা

www.nagorikpathagar.org

অবৈধ উপায়ে দখল করে নিয়েছিল তা তাদের নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে মূল মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেন।[৫]

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, 'আমার এক শিক্ষক আমাকে বলেছেন যে, ওমর বিন আব্দুল আজিজের নজর সবসময় অন্যায়ভাবে দখলীকৃত সম্পদ তার সত্যিকার মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার প্রতি নিবদ্ধ ছিল।'[৬]

কাজেই ইসলামী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হবে অবৈধ সম্পত্তি উদ্ধার করে তার সত্যিকার মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া অথবা বায়তুল মালে জমা রাখা। এজন্য অতীতে 'হিসবা' নামে একটি দফতর কায়েম করা হয়েছিল।[৭]

আজও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে হবে। এ বিভাগের দায়িত্ব দিতে হবে অত্যন্ত সচ্চরিত্র উচ্চপর্যায়ের লোকদের হাতে। কোনো সাধারণ বিভাগের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। যাদের হাতে সীমাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ রয়েছে তাদের সম্পদ জায়েজ পথে অর্জিত হয়েছে কিনা তা দেখা এ বিভাগের বিশেষ কর্তব্য হবে। ইসলামের দেয়া কর্ম ও জীবিকা অনুসন্ধানের স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে, সমাজের জন্য ক্ষতিকর ব্যবসা করা যাবে। তা কখনো হতে পারে না। কেননা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোনো কাজই জায়েজ হতে পারে না। এগুলো সবই মুনকারের পর্যায়ভুক্ত। এগুলো নির্মূল করা সরকারের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজি করে সে আমার তরীকার লোক নয়।'[৮]

এর উপর ভিত্তি করে সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, 'ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারবারের মধ্যে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা সম্পূর্ণভাবে হারাম ঘোষণা করেছে।'[৯]

সাইয়েদ মওদূদী বলেছেন, 'সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষে ব্যবসায়ের যেসব নিয়মপন্থা মারাত্মক ও ক্ষতিকর তা সবই আইনত বন্ধ করে দেয়া আবশ্যক।'[১০]

মজুতদারি

ইসলামী সরকারকে সব অবৈধ-অন্যায় ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব ব্যবস্থা জনগণের খুব বেশি ক্ষতি করে থাকে তার মধ্যে মজুতদারি অন্যতম। মজুতদার স্বাভাবিক ব্যবসায়ী নয়। স্বাভাবিক ব্যবসায়ী মাল কিনে ও বিক্রি করে স্বাভাবিক মুনাফা করে থাকে। কিন্তু মজুতদার পণ্য কিনে বহুদিন ধরে আটকে রাখে যাতে বাজারে দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয় ও মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। মজুতদারির ফলে দ্রব্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অনেক সময় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। ফলে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে। নবী করিম (সা.) বলেছেন: 'যে ইহতিকার করল সে অপরাধী।'[১১]

'ইহতিকার' অর্থ অধিক লাভের আশায় পণ্য মজুত রাখা। খাদ্য দ্রব্যের ইহতিকার করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন। কাজেই ইসলামী সরকার মজুতদারকে শক্ত হাতে দমন করবে। এজন্য প্রয়োজনীয় আইন রচনা করতে

www.nagorikpathagar.org

হবে। যদি আগে হতে আইন থেকে থাকে তবে তা যথাযোগ্যভাবে সংশোধন ও প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন স্বাভাবিক মজুত ব্যবসায়ে কোনো অসুবিধা না হয়। এজন্য আইনে এমন ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে যার অধীনে ব্যবসায়ী কোনো মাল সর্বোচ্চ কত পরিমাণ কত দিন ধরে রাখতে পারবে, সময়ে সময়ে সরকার তা নির্ধারণ করে দেবেন। যেমন, কৃষিপণ্য ফসল উৎপাদনের সময় অধিক পরিমাণ বেশি দিন ধরে রাখার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। আবার যে সময় এ দ্রব্য কম পাওয়া যায় সে সময় মজুতের সময় ও পরিমাণ কমিয়ে দেয়া যেতে পারে। আমদানি ও শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপারে তেমনিভাবে মজুতের সময় ও পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে। আমদানি এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও বিক্রি মূল্য পত্রিকায় নিয়মিত ঘোষণা করতে বাধ্য করা যেতে পারে। ক্রেতারা কিনতে চাইলে এসব উৎপাদন ও আমদানি দ্রব্য যাতে আমদানিকারক ও উৎপাদক বিক্রি করতে বাধ্য থাকে, আইনে তার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। মজুতদারি বন্ধ করার জন্য সরকার অন্যসব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মুনাফাখোরী

ইসলামী শিক্ষার আলোকে ন্যায়সংগত মুনাফা হচ্ছে সেই মুনাফা,

ক. যা সাধারণ অবস্থায় স্বাভাবিক বাজারের (Market) চাহিদা ও যোগানের নিয়ম অনুযায়ী পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে অবস্থায় চাহিদা বা যোগানকে অস্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করা হয় না।

খ. যা মিল-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ক্ষেতে-খামারে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যায়সংগত মজুরি দেয়ার পর পাওয়া যায়।

গ. যা ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার খেয়াল রেখে অর্জন করা হয়।

এ ধরনের মুনাফাকেই ন্যায়সংগত মুনাফা বলা যেতে পারে। কাজেই যেসব ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি চাহিদা ও যোগানকে অস্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করে, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ও ক্রেতাদের শোষণ করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে চায়, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নানাভাবে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করবে এবং তা মানতে মালিক ও ব্যবসায়ীদের বাধ্য করবে। দোকান কর্মচারী ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য এখনো নানা আইন রয়েছে। এগুলোকে বাস্তবতা, ইনসাফ ও প্রয়োজনের আলোকে সংশোধন ও শক্তিশালী করা যেতে পারে। দ্রব্যমূল্য কমিয়ে আনার জন্য সরকার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক নিয়মসমূহের সুযোগ গ্রহণ করবেন। দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব না হলে বিদেশ হতে আমদানি বৃদ্ধি করে সরবরাহ বৃদ্ধি

www.nagorikpathagar.org

করার চেষ্টা করতে হবে। দেশে মালপত্রের অভ্যন্তরীণ চলাচলের উপর বিধিনিষেধ খুবই কম রাখতে হবে, কেননা এতে নানা অঞ্চলে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয় ও দুর্নীতির অবকাশ বৃদ্ধি পায়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

অবশ্য এ সবেও কাজ না হলে ইসলামী সরকারকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জনগণের কষ্ট ও তাদের উপর জুলুম বন্ধ করা সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব। স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামের নীতি নয়, কেননা ইসলাম স্বাভাবিক ও স্বাধীন অর্থব্যবস্থা পছন্দ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে কোনো জুলুম হয়। কিন্তু যদি ব্যবসায়ীরা অন্যায়ভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং তাতে জনগণের অসহনীয় কষ্ট হয় তবে দ্রব্যমূল্য বেঁধে দিতে হবে। এ সম্পর্কে কয়েকজন মনীষীর মত উল্লেখ করা হলো:

বিশেষ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে এবং এ অধিকারের বুনিয়াদ শরীয়তের এই নীতি যে, জনগণের অসুবিধা দূর করা অপরিহার্য।[১২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার 'আল হিসবা ফিল ইসলাম' বইতে কোন কোন অবস্থায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার আলোচনা তিনি সমাপ্ত করেছেন এভাবে, 'যদি স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য মূল্য ন্যায়সংগত পর্যায়ে নির্ধারিত না হয় তবে জনগণের জন্য ইনসাফের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে, কমও নয়, বেশিও নয়।'[১৩]

ফিকাহর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিদায়া'তে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'জনগণকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের অধীন করে দেয়া সরকারে জন্য ঠিক নয়, কেননা নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে না, কেননা আল্লাহ মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন, সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা সৃষ্টি করে থাকেন এবং রিজিক দিয়ে থাকেন।' কাজেই বাজারের মূল্য নির্ধারণ করা ক্রেতা ও বিক্রেতার কাজ। সরকারের এতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। একমাত্র জনগণের অসুবিধা দূর করার জন্যই তা করা যেতে পারে।'[১৪]

'আল্লাহ মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন' অর্থ চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নিয়মে (Market forces) তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম তাইমিয়া বলেছেন, "যে ব্যক্তি মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে নবী (সা.)-এর হাদিস থেকে এ ব্যাখ্যা করেন যে, মূল্য নির্ধারণ ছিল সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ, তিনি ভুল করেন। কেননা এটা ছিল একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত আদেশ, সাধারণ আদেশ ছিল না। এই হাদিসে একথা বলা হয়নি যে, কোনো ব্যক্তি এমন কোনো দ্রব্য বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিল কিনা যা বিক্রি করতে সে বাধ্য

www.nagorikpathagar.org

ছিল অথবা এমন কোনো কাজ করতে অস্বীকার করেছিল যা করা তার উপর ওয়াজিব ছিল অথবা সে স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দাবি করেছিল।[১৫]

মূল হাদিসটি হচ্ছে এই: নবী করিম (সা.)কে এক ব্যক্তি বলেছিল যে, মূল্য নির্ধারণ করে দিন। নবী (সা.) বললেন, মূল্য নির্ধারণ আল্লাহর কাজ, তিনিই সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা সৃষ্টি করেন ও রিজিক দিয়ে থাকেন। আমি খোদার কাছে এমনভাবে যেতে চাই যেন কারো হক আমার কাছে পাওনা না থাকে।[১৬]

এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ বলেন, 'আমি বলি যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এমন ইনসাফ 'যাতে কারো ক্ষতি না হয় অথবা সমান ক্ষতি হয়' কায়েম করা কষ্টকর ছিল। এজন্য নবী (সা.) এ সতর্কতা অবলম্বন করেন যাতে শাসকরা (মূল্য নির্ধারণকে) সাধারণ নিয়মে পরিণত না করে ফেলেন। এ সত্ত্বেও যদি ব্যবসায়ীদের পক্ষ হতে প্রকাশ্য জুলুম হয় যা সব সন্দেহ হতে মুক্ত, তবে তা বন্ধ করা জায়েজ, কেননা এতে দেশের ধ্বংস নিহিত।'[১৭]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক স্বার্থরক্ষা ও ইনসাফ কায়েম রাখার জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের কর্তব্য, এ কথা ইসলামের বহু পণ্ডিতই ব্যক্ত করেছেন।

মনোপলি ও কার্টেল

আজকাল শিল্পপতিরা মনোপলি ও কার্টেল কায়েম করে তার মাধ্যমেও জনগণকে শোষণ করে থাকে। যদি উৎপাদনের উপর উৎপাদকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে তবে তাকে মনোপলি বা একচেটিয়া কারবার বলে। যদি উৎপাদনের উপর মাত্র কয়েকজনের নিয়ন্ত্রণ থাকে তাতেও একচেটিয়া কারবারের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। যখন উৎপাদকরা সমিতিবদ্ধ হয়ে উৎপাদন, মূল্য ও বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে অবস্থাকে কার্টেল বলে।

মনোপলির কিছু ভালো দিকও আছে। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে এবং উৎপাদন খরচও কম হতে পারে। কার্টেলের কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা হয়ত আছে, কিন্তু সাধারণভাবে এ যুগে একে ক্রেতা ও জনগণকে শোষণ করতে ব্যবহার করা হয়। উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। অধিকাংশ সময় উৎপাদন খরচের সাথে সংগতি না রেখে অস্বাভাবিক মূল্যে জনগণকে মাল কিনতে বাধ্য করা হয়। এসব যে স্পষ্ট জুলুম তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অবশ্য সরকারি খাতে যেসব মনোপলি রয়েছে তাদের কথা স্বতন্ত্র। সে সব ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি বা জনগণকে শোষণের প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই সরকারি মনোপলি ছাড়া অন্য সব মনোপলি ও কার্টেলকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্ত আইন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে বর্তমান আইনসমূহকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। তেমনিভাবে অন্যান্য অবৈধ ব্যবসাকে (যেমন দ্রব্যে ভেজাল দেয়া) আইন প্রয়োগ করে শক্ত হাতে বন্ধ করতে হবে। আসল

www.nagorikpathagar.org

কথা, কোনো অন্যায় ও জুলুমমূলক এবং প্রবঞ্চণা ভিত্তিক ব্যবসায়ী নীতি চালু থাকতে দেয়া হবে না।

হিজরের আইন

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা যদি এসব আইন মেনে না চলে এবং আইন ভঙ্গ করে তবে সরকার তাদের সম্পত্তি সাময়িকভাবে নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে। ইসলামী পরিভাষায় এ ব্যবস্থাকে হিজর বলে। হিজর অর্থ নিরস্ত করা। শরীয়তের দৃষ্টিতে হিজর অর্থ কোনো ব্যক্তিকে অর্থসম্পদের অপব্যবহার থেকে থামিয়ে দেয়া।[১৮] হিজরের আইনের ভিত্তি হচ্ছে কুরআন মজীদের এই আয়াত:

> তোমরা তোমাদের মাল নির্বোধ লোকদের উপর ছেড়ে দিও না, কেননা আল্লাহ এ ধন-সম্পত্তি তোমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দাও সে সম্পত্তি হতে এবং তাদের ভালো নীতি শিক্ষা দান কর। (সূরা আন নিসা: আয়াত ৫)

এ আয়াতে নির্বোধ লোকদের নিকট থেকে তাদের আইনত মালিকানাধীন সম্পত্তি নিয়ে নেয়ার অধিকার সমাজকে দেয়া হয়েছে। অবশ্য সমাজের পক্ষ থেকে এ অধিকার সরকারই পালন করবে। ইসলামী আইন শাস্ত্রের দৃষ্টিতে নির্বোধ বলতে কেবল অবুঝ ও নাবালেগ ব্যক্তিকেই বুঝায় না। যারা মাল বরবাদ করে, জুলুমের জন্য ব্যবহার করে অথবা অনৈতিক কাজে ও অপরাধ বিস্তারে ব্যবহার করে তারাও নির্বোধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। এসব অবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারখানা, ব্যবসা বা অন্য সম্পত্তি মালিকের হাত হতে সরকারি কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য হিজর কতদিনের জন্য হবে তা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া উচিত। হিজর কালে সরকার মালিককে যথোপযুক্ত খোরপোষ দিতে কুরআন মোতাবেক বাধ্য।

কারখানা বা ব্যবসা তার পক্ষ থেকে সরকার পরিচালনা করবে এবং খরচের পর যে লাভ থাকবে তা মালিকের একাউন্টে জমা হবে। অবশ্য হিজর বলবৎ থাকা অবস্থায় মালিক টাকা তুলতে পারবে না। এ ব্যবস্থা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সব সময় সতর্ক থাকতে বাধ্য করবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে এক নৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে। এজন্য অবশ্য হিজর নীতির আলোকে একটি আধুনিক আইন রচনা করে সরকারকে তা আইন পরিষদ কর্তৃক পাশ করিয়ে নিতে হবে। এছাড়া হিজর কার্যকরী করা যাবে না।

শ্রমিকের অধিকার

ইসলামী সরকারের একটি প্রধান কর্তব্য হবে শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং তাদের উপর যাতে জুলুম না হতে পারে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নানা দিক দিয়ে এটি বর্তমান কালেও সরকারের বিশেষ নজর দাবি করে। শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সমাজের এক বিরাট

www.nagorikpathagar.org

অংশ শ্রমিক ও কর্মচারী হিসেবে কর্মে নিযুক্ত থাকে। বাংলাদেশেও শতকরা ২০ ভাগের মতো কর্মক্ষম জনশক্তি শ্রমিক ও কর্মচারী হিসেবে শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত মুসলিম দেশ তুরস্ক, মিশর, পাকিস্তান ও ইরানে এ সংখ্যা আরো অধিক হবে। কাজেই সমাজের জনশক্তির এই বিরাট অংশের স্বার্থকে কিছুতেই অবহেলা করা যাবে না। অন্যদিকে শ্রমিক ও কর্মচারীদের অধিকার নিয়ে যদি মালিকরা ছিনিমিনি খেলে বা মালিকরা যদি যথোপযুক্ত মজুরি না দেয় তাহলে প্রায়ই সমাজে ব্যাপক অশান্তি দেখা দেয়। এসব ফেতনা-ফাসাদ ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কাজেই যাতে সমাজে কোনো কারণে ফেতনা-ফাসাদ না হয় তার দিকে নজর রাখা ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের জন্য অপরিহার্য।

শ্রমিকদের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে যে, তারা হচ্ছে ভাই এবং তাদেরকে ভাইয়ের মতো ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মজুরি না ঠিক করে কাজে নিয়োগ করা এবং বেকার খাটানো ইসলামে জায়েজ নয়। কাজেই সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে শ্রমিকরা পর্যাপ্ত মজুরি পায়। এ প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে শ্রমকে অন্যান্য পণ্যের মতো বিবেচনা করা যেতে পারে না এবং বাজার দরের ভিত্তিতে তার মূল্য নির্ধারণ করা কখনো সংগত হবে না। অন্যান্য পণ্যকে যেমন তার মালিক হতে আলাদা করে বিবেচনা করা যেতে পারে, শ্রমকে তেমনিভাবে শ্রমিক হতে আলাদা করা যায় না। শ্রমিক শ্রমকে আলাদা করে বিক্রি করে অন্য কাজে লিপ্ত হতে পারে না। অপর দিকে শ্রমিকের অনুভূতি রয়েছে যা অন্যান্য পণ্যের নেই। শ্রমের ক্ষেত্রে আসল ব্যাপার হচ্ছে একটি পূর্ণ মানুষের ব্যবহার, কেবল তার শ্রমের ব্যবহার নয়। কাজেই শ্রমকে অন্যান্য পণ্য ও যন্ত্রের মতো কেনাবেচা করা যেতে পারে না বা তার অনুভূতিকে অবহেলা করা যেতে পারে না। তার মানবিক প্রয়োজন ও সম্মানকে কিছুতেই ক্ষুণ্ন করা যায় না। তার যথোপযুক্ত মজুরি ও সম্মান তাকে দিতেই হবে।

এসব নীতি ও মূল্যবোধকে সামনে রেখে সরকারকে একটি নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করে দিতে হবে যা অনুসরণ করতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা বাধ্য থাকবে। এজন্য সরকারের প্রয়োজন হবে একটি স্থায়ী মজুরি কমিশন নিয়োগ করা। কেননা, একদল এক্সপার্টের পক্ষেই বাজার দর পর্যালোচনা করে মজুরি কমিশনের সুপারিশকে আইন রচনা করে বা বর্তমান আইন সংশোধন করে কার্যকর করতে হবে। মজুরি কমিশন সব সময় বাজার দর পর্যালোচনা করতে থাকবে। যখনই বাজার দর বৃদ্ধি পাবে নিম্নতম মজুরির পর্যায়কেও সে সঙ্গে বাড়াতে হবে। বাস্তবতার প্রয়োজনে অবশ্য কমিশন বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজন হলে বিভিন্ন মজুরি হার নির্ধারণ করতে পারেন। কেননা ভারি শিল্পের পক্ষে শ্রমিককে যে বেতন দেয়া সম্ভব, ছোট শিল্পের জন্য তা সম্ভব নাও হতে পারে। আবার শিল্পের পক্ষে যে মজুরি দেয়া সম্ভব দোকানের পক্ষে তা দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

বাস্তবতার আলোকেই সরকার মজুরদের অন্যান্য সুবিধাদানের ব্যবস্থা সম্বলিত আইন রচনা করবেন। শ্রমিকদের স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন করার যথাযথ অধিকার ও বাসস্থান, চিকিৎসা, বোনাস ইত্যাদি সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা আইনে থাকতে হবে। কিন্তু বোনাস কেবল সে শিল্পের পক্ষেই দেয়া সম্ভব, যে প্রতিষ্ঠানে লাভ হয়ে থাকে। লোকসানের সময় বোনাসের প্রশ্ন উঠতে পারে না। তেমনি ছোট শিল্প ও দোকান মালিকদের পক্ষে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হওয়ারই কথা। কিন্তু বড় শিল্পের পক্ষে ক্রমে ক্রমে শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য কলোনি করা সম্ভবপর হওয়া উচিত। অর্থাৎ বাস্তবতার নিরিখেই সরকারকে শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত আইন রচনা করতে হবে। অবাস্তব আইন কার্যকরী করা যাবে না, তা যত সদুদ্দেশ্যমূলক হোক না কেন। এসব আইনের উদ্দেশ্য হবে শ্রমিকের সত্যিকার স্বার্থ রক্ষা করা, শিল্প ও ব্যবসার উপরে স্বাভাবিক বোঝা চাপিয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক উদ্যোগ নষ্ট করা নয়, কেননা তা অবশেষে বেকারত্ব ডেকে আনবে। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, একটি দেশের শ্রমিক সমাজের জীবনযাত্রার মান কৃষক বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী সমাজ হতে অস্বাভাবিক বেশি হওয়া সম্ভব নয়। একটি মুসলিম দেশ যতদিন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে উন্নত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কোনো শ্রেণির জীবনমানই বাঞ্ছিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

ইসলামী সরকারকে তাই সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিকে উন্নত করার জন্য সর্বপ্রকার উদ্যোগ নিতে হবে এবং সেজন্য আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, সংগঠন, পরিকল্পনা পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তা হবে ইসলামী সরকারের সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি। একই সঙ্গে প্রত্যেকটি মুসলিম সরকারকে তার দেশে বর্তমানে শ্রমিক সমাজ যেসব শোষণ ও জুলুমের শিকার হচ্ছে তার প্রতিবিধান করতে হবে।

জুলুমের প্রতিবিধান

বিভিন্ন দেশে শ্রমিক সমাজ নানাভাবে বঞ্চিত ও শোষিত হচ্ছে। প্রথমে শিল্প শ্রমিকের কথাই ধরা যাক। আজও শিল্প শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। সামান্য কারণে বা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য তার চাকরি চলে যায়। তাই শ্রমিকের কর্মের নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। শ্রম আদালতের এখতিয়ার ব্যাপক হওয়া উচিত। মালিকরা যাতে সহজে 'লে-অফ' করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করতে না পারে তার ব্যবস্থা আইনে রাখতে হবে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া কিছুতেই 'লে-অফ' করতে দেয়া উচিত নয়, কেননা তাতে উৎপাদনও হ্রাস পায়। 'লে-অফ'-এর বিরুদ্ধে শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক শ্রম আদালতে মামলা করার অধিকার থাকতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে যাতে শ্রম আদালত সাত দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করে তার বিধানও আইনে থাকা উচিত।

www.nagorikpathagar.org

তেমনিভাবে বোনাস না দিয়ে শ্রমিক সমাজকে যাতে মালিকরা বঞ্চিত না করতে পারে তার ব্যবস্থাও থাকা দরকার। যেহেতু লাভের উপর বোনাস নির্ভর করে, তাই মালিক যেন অপব্যয় ও হিসাবের কারচুপি করে লোকসান না দেখাতে পারে তার ব্যবস্থাও করা দরকার। অনেক সময় মালিকরা কারখানা হতে অতিরিক্ত ভাতা, যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ নিয়ে কারখানার খরচ বৃদ্ধি করে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত লোকসান দেখিয়ে শ্রমিকদের বোনাস থেকে বঞ্চিত করে থাকে। বিষয়টি সরকারকে ভালো করে পর্যালোচনা করতে হবে। ভাতা খুবই যুক্তিসংগত পর্যায়ের হওয়া উচিত। এসবকে কিছুতেই কারখানার খরচ বৃদ্ধির পন্থা হতে দেয়া উচিত নয়। প্রকৃত খরচাদির পর কারখানার লাভের একটি যুক্তিসংগত অংশ বোনাস হিসেবে শ্রমিকদের দেয়া উচিত। আইনে তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। এভাবে শ্রমিকদের শোষণের যত পন্থা আছে সব বন্ধ করে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ জুলুম ও জালেমকে পছন্দ করেন না। বাংলাদেশের মতো কিছু মুসলিম দেশে কৃষি শ্রমিকরা নানাভাবে শোষিত হচ্ছে। গ্রামের জনসাধারণের এক বিপুল অংশ ভূমিহীন অথবা প্রায় ভূমিহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য দুর্যোগে তাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষেত তৈরি ও ফসল কাটার মওসুমে তারা মোটামুটি মজুরি পেয়ে থাকে। অন্যান্য মওসুমে তাদেরকে অত্যন্ত কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়, কেননা তখন কাজের অভাব থাকে। এ অবস্থার আসল প্রতিকার নিশ্চয়ই কাজ সৃষ্টি করার মধ্যে রয়েছে। সেজন্য অবশ্য এসব দেশের সরকারকে যথাযোগ্য পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী সরকারের উচিত হবে কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাদের নিম্নতম মজুরি বেঁধে দেয়া। আইন করেই তা করতে হবে। আইন ছাড়া এ অবস্থার সংশোধন করা সম্ভব নয়। মজুরি নির্ধারণ অবশ্য বাস্তবতার আলোকেই করতে হবে। অবাস্তব মজুরি নির্ধারণ করা হলে কৃষি শ্রমিক হয়ত বা একেবারেই কাজ পাবে না। তাতে অবস্থার আরো অবনতি হতে পারে। কাজেই তাদের নিম্নতম মজুরি ফসলের মওসুমে কিছুটা বেশি ও অন্য সময়ের জন্য কিছু কম ধার্য করা যেতে পারে। এজন্য স্থায়ী মজুরি কমিশনকে দায়িত্ব দিতে হবে। বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতার আলোকেই তারা এসব মজুরি নির্ধারণ করবেন। সময় সময় সে মজুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করতে হবে।

দোকান কর্মচারীরাও অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। তাদের বারো ঘণ্টার বেশি পরিশ্রম করতে হয়। এটা কিছুতেই ইনসাফ হতে পারে না কেননা এটা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তাদের অসুবিধা লাঘব করার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। দোকান কর্মচারীদের জন্য কাজের শিফট ব্যবস্থা চালুর চিন্তা করা যেতে পারে। খুব ছোট দোকানে সম্ভব না হলেও বড় বড় দোকানের জন্য তা করা নিশ্চয়ই সম্ভব। কর্মে নিযুক্ত জনশক্তির একটি বিরাট অংশ হচ্ছে এই দোকান কর্মচারী। কাজেই তাদের যথার্থ অধিকারের ব্যবস্থা করা ইসলামী সরকারের বিশেষ দায়িত্ব

www.nagorikpathagar.org

হওয়া উচিত। অন্যান্য শ্রমিকদের মতো অবশ্য তাদের নিম্নতম বেতনও কমিশনকে বাস্তবতার আলোকে নির্ধারণ করে দিতে হবে। সরকারি কর্মচারীদেরকে ন্যায়সংগত মজুরি দেয়া সরকারের বিশেষ কর্তব্য হবে। গৃহকর্মীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাও আইনে থাকতে হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ

সমাজ হতে দারিদ্র্য দূর করা ইসলামী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব, কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দারিদ্র্য মুসলমানদের এক বিরাট অংশকে ইসলামের মূল দাওয়াত বুঝা, গ্রহণ করা ও কার্যকরী করার প্রচেষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। তারা এত সমস্যায় জর্জরিত যে, ইসলামী আদর্শবাদের কথা চিন্তা করতেও সময় পায় না। কাজেই সব উপায়ে মুসলিম বিশ্ব হতে দারিদ্র্যকে উৎখাত করতে হবে। এজন্য মুসলিম সরকারসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দারিদ্র্যকে এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

বেকার জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। বেকার সমস্যার সার্বিক সমাধান অবশ্য অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। এ জন্য সরকারকে সরকারি ও বেসরকারি অর্থনৈতিক উদ্যোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী সরকারের ভূমিকা যে কোনো গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক সরকার অপেক্ষা বেশি হওয়া উচিত। বেকার সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে সাময়িক কাজেরও ব্যবস্থা করতে হবে। সে জন্য বেকার জনসংখ্যাকে তালিকাবদ্ধ করে কর্মীবাহিনী (Work Brigade) গড়ে তুলে নদী খোদাই, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ, নদীর বাঁক কাটা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচ প্রকল্প ইত্যাদি বড় বড় কাজ করে নেয়া যেতে পারে।

অসহায় বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ শিশু ও বিধবা যারা খেটে খেতে পারে না তাদের পুনর্বাসনের জন্য অবশ্য আলাদা উদ্যোগ নিতে হবে। ইসলামী সরকারকে এজন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাতকে কায়েম করতে হবে। যাকাতের অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এতিমখানা, মহিলা ও বৃদ্ধ পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের ভরণপোষণের খরচও যাকাত হতে মেটাতে হবে। এসব লোকের মধ্যে যাদের আবাস রয়েছে, তাদের অবশ্য ভাতা দিলেই চলবে। যেসব অভাবী বেকারকে কাজ যোগাড় করে দেয়া যাবে না তাদেরকেও ভাতা দিতে হবে।

যাকাত কায়েম

যাকাত কায়েম করা সরকারের জন্য অপরিহার্য। যাকাত যে সরকারি পর্যায়ে কায়েম করতে হবে তার একটি বড় দলিল কুরআনে যাকাতের ব্যয়ের খাত হিসেবে যাকাত কর্মচারীদের উল্লেখ (সূরায়ে তওবা: আয়াত ৬০, ১০৩)। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কয়েক'শ বছর যাবত যাকাত কায়েম না থাকায় নতুন করে রাষ্ট্রীয়

www.nagorikpathagar.org

পর্যায়ে যাকাত ব্যবস্থা কায়েম করা নিঃসন্দেহে কিছুটা জটিল হবে। এজন্য ইজতিহাদের প্রয়োজন। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কায়েম করে আধুনিক আইনের সাহায্য নিয়ে বর্তমানের উপযোগী একটি যাকাত বিধি (Zakat Act) তৈরি করতে হবে।

শিল্পের জাতীয় নিয়ন্ত্রণ

ইসলামী সরকারকে যদি বেকারত্ব ও অভাব দূর করতে হয়, তবে তাকে ব্যাপক অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আজকের যুগে কেবল বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভর করলে সমস্যার সমাধান হবে না। এজন্য সরকারি খাতে ব্যাপক শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া সরকারের কর্তব্য। এজন্য প্রথমত মূল শিল্পের দিকে নজর দেয়া উচিত, কেননা মূল শিল্পগুলো গড়ে তুলতে বেসরকারি উদ্যোগের খুবই অভাব হয়ে থাকে। অথচ এসব শিল্প গড়ে তোলা জাতির জন্য অপরিহার্য। অন্য কথায়, এটা হচ্ছে সরকারের পক্ষ হতে 'ফরজে কেফায়া'র দায়িত্ব পালন। বর্তমান যুগে একটি মুসলিম দেশের মূল ও প্রধান শিল্প রাষ্ট্রের হাতেই থাকা উচিত। এ বিষয়টি নির্ভর করে সময়, পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার উপরে। বেসরকারি উদ্যোগ কিছুটা দক্ষ সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা প্রায়ই সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে থাকে, যা হচ্ছে জনগণের পাওনা। তারা মালের চড়া মূল্য আদায় করে এবং ভেজাল ও অবৈধ ব্যবসা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় শিল্পপতিদের জুলুমের শিকার হয়েছে। কাজেই সব কিছু বিবেচনা করে প্রধান শিল্পগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখাই সংগত হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতেও এটি নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ বৈধ। আমরা জানি যে ইসলামী রাষ্ট্র পানি, খনি, বন-জঙ্গল, চারণভূমি ইত্যাদির উপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে না।

এসব সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় দেয়া হলে সর্বসাধারণের অধিকার নষ্ট হতো এবং জনগণ কষ্টের সম্মুখীন হতো। শরীয়তের সিদ্ধান্ত হতে আমরা এ নীতি পাচ্ছি যে, যেসব সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় অর্পিত হলে জনগণের স্বার্থ নষ্ট হয় অথবা জনগণ অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা ব্যক্তি মালিকানায় থাকা কিছুতেই সঠিক নীতি হতে পারে না। এজন্য অতীত ইসলামী অর্থনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যেসব সম্পদ সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তা কারো ব্যক্তিগত মালিকানায় দান করার অধিকার রাষ্ট্রপতির নেই।[১৯]

কাজেই যেসব সম্পদ কারো ব্যক্তিগত মালিকানায় ছেড়ে দিলে সর্বসাধারণের কষ্ট বা অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা সবই রাষ্ট্রীয় অথবা সার্বজনীন মালিকানায় রাখতে হবে। বেসরকারি মালিকানায় যেসব ব্যবসা ও শিল্প সুফল না দিয়ে বরং জাতির সমূহ ক্ষতি করেছে বলে আমাদের অভিজ্ঞতা

www.nagorikpathagar.org

আছে, সেসব শিল্প ও ব্যবসা জাতীয় মালিকানায় নিয়ে নেয়াই সঠিক ও জনকল্যাণকর পদক্ষেপ হবে। অবশ্য কোন কোন শিল্প ও ব্যবসাকে জাতীয় মালিকানায় নেয়া জাতীয় কল্যাণ ও জুলুম বন্ধ করার জন্য জরুরি তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের পার্লামেন্টের। তবে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কোনো বৈধ মালিকানাই সরকার হরণ করতে পারবে না। জাতীয় মালিকানার ধরনও নানারকম হতে পারে। সরকার একাও মালিক হতে পারে অথবা জনগণের হাতে মালিকানার একটি অংশ শেয়ারের আকারে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম করা যেতে পারে না। এ বিষয়টি নির্ভর করবে প্রয়োজন, পরিবেশ, সময়, পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার উপরে।

এ যুগে ইসলামী সরকারের প্রধান দায়িত্ব হবে সুদবিহীন অর্থনীতির পুনঃপ্রবর্তন। সুদকে নির্মূল করা ইসলামের একটি প্রধান লক্ষ্য। বিশাল ইসলামী খেলাফত হতে সুদকে নির্মূল করা হয়েছিল এবং সুদ ছাড়াই অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সে যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র আব্বাসী খেলাফতের অর্থনীতি পরিচালিত হতো। আজও তা সম্ভব।

ইসলামী সরকারের প্রধান দায়িত্বসমূহ এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এ সরকারের অন্য অনেক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামী আইন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সরকারকে সেসব দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. ইমাম ইবনে কাইয়্যেম, ইলম আল মুয়াক্কিন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৯-৩১১।

২. ইমাম শাতিবি, আল মুয়াফিকাত ফি উসুলুস শরিয়াহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৮।

৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল হিসবা ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ১৭।

৪. আবু ওবায়েদ, কিতাবুল আমুয়াল, পৃষ্ঠা: ৬৯।

৫. সাইয়েদ কুতুব, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, বাংলা অনুবাদ ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৫১৬-৫১৯।

৬. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা: ১৩৮।

৭. আল মাওয়ার্দী, আল আহকামুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা: ২০৮।

৮. সিহাহ সিত্তাহ।

৯. সাইয়েদ কুতুব, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, পৃষ্ঠা: ৩০৯।

১০. সাইয়েদ মওদূদী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ, পৃষ্ঠা: ১৮২।

১১. আবু দাউদ, তিরমিজী।

www.nagorikpathagar.org

১২. ইবনে নথীম হানফী, আল হিসবা ওয়া নাজায়ের, পৃষ্ঠা: ১২১-১২৯।

১৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল হিসবা ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৩৭।

১৪. হিদায়া।

১৫. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল হিসবা ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ২৭-২৯।

১৬. আবু দাউদ, তিরমিজী।

১৭. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।

১৮. ইবনে কুদামা, আল মুগনী।

১৯. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৪৭।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ঃ ঐতিহাসিক ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা, বিশেষ করে বাংলাদেশে এর পটভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা যায়। আমার বিশেষ করে মনে পড়ে, আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম এবং একটি ছাত্র সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলাম তখন দু'টি প্রশ্ন মনে উদয় হতো এবং বিব্রত করতো। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে যখন ঢাকা কলেজে ছিলাম তখনও হতো। একটি প্রশ্ন ছিল যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং যেহেতু ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্ভব নয় সুতরাং একটি ইসলামী রাষ্ট্রও সম্ভব নয়। যেহেতু ইসলামী সংগঠন থেকে বলা হতো যে, আমাদের দাবি হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র বা হুকুমাতে ইলাহিয়া অর্থাৎ খেলাফত কায়েম করা। খেলাফত অর্থ এই নয় যে, শুধু একজন খলিফা মনোনয়ন করা। খেলাফত মানে খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম করা। এই খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল - যার মধ্যে মানবতা থাকবে, যার মধ্যে ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সকল বৈশিষ্ট্য থাকবে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগতো যে, এটি সম্ভব নয়। কিন্তু যখন পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়ে গেল এবং শাসনতন্ত্র দেশের আলিম সমাজও গ্রহণ করলেন তখন ইসলামী শাসনতন্ত্র তথা ইসলামী রাষ্ট্র সম্ভব নয় - এই প্রশ্ন সবার মন থেকে সরে গেল। যে ভাবনা সারাক্ষণ তাড়া করতো, ইসলামী শাসনতন্ত্র বা ইসলামী রাষ্ট্র একেবারেই সম্ভব নয় - তা আর রইল না। এমনকি আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে যে ব্যক্তি একসময় বলেছিলেন যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব নয়, সম্ভব হলে আপনারা প্রণয়ন করে দেখান, যখন ১৯৫২ সালে সকল মতের আলিম একত্রিত হলেন এবং তাঁরা ২২ দফা মূলনীতি তৈরি করে দিলেন তখন (এই ব্যক্তি মরহুম এ কে ব্রোহী) তিনি পরবর্তীকালে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে দাঁড়ান এবং পরবর্তীকালে তিনি একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবেই পরিচিত হয়ে যান। এটা ছিল একটা দিক।

দ্বিতীয় দিক যেটা লোকে মনে করত (আমাদের ছাত্র জীবনে), যেহেতু ইসলাম সুদকে স্বীকার করে না, সেহেতু ইসলামী ব্যাংক সম্ভব নয় এবং যেহেতু ব্যাংক সম্ভব নয় সুতরাং ইসলামী অর্থনীতিও সম্ভব নয়। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের এই যে ধারণা, তা আমাদের পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহপাকের

www.nagorikpathagar.org

অসংখ্য মেহেরবানী, যে প্রশ্নটি আমাদেরকে বিব্রত করেছিল ১৯৭০ পর্যন্ত এমনকি ১৯৭৪-৭৫ পর্যন্ত - যখন ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল মধ্যপ্রাচ্যে এবং তারপরে যখন এ ধারণা বাংলাদেশে নিয়ে আসা হলো, এই ধারণা যখন ব্যাপক হলো এবং আল্টিম্যাটলি যখন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে চালু হয়ে গেল, তখন থেকে লক্ষ্য করছি আমরা যে প্রশ্নে বিব্রত হচ্ছিলাম তা আর রইল না।

ব্যাংক যখন হয়ে গেল এবং কাজ শুরু করলো (১৯৮৩) এবং বাংলাদেশে যখন ইসলামী ব্যাংকের কাজের মাধ্যমে জনগণ দেখলো যে, ইসলামী ব্যাংক একটি প্র্যাকটিকেবল মাধ্যম এবং এরা ভালো করে একটি ব্যাংক চালাতে পারে, তারপর থেকে লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশে ইসলামপন্থী লোকদের বিরুদ্ধে বা ইসলামপন্থী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে বা ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে যাই বলা হোক না কেন কিন্তু এ কথা আর বলা হচ্ছে না যে, ইসলামী ব্যাংক সম্ভব নয়। এ কথা বলা হচ্ছে না যে, ইসলামী অর্থনীতি সম্ভব নয়। এটা যে কত বড় বিপ্লব তা আমরা অনুধাবন করতে পারছি না। আমরা যদি ঐতিহাসিকভাবে এটাকে দেখি পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া এবং ইরানে ১৯৭৯ সালে শাসনতন্ত্র হয়ে যাওয়ার ফলে একটা মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি হলো। যার ফলে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্ভব নয় - এই যে ধারণা, তা চলে গেল।

এখন এ কথাটি তারা বলতে পারেন যে, আমরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা আমাদের জন্যে গ্রহণযোগ্য মনে করি না, এটা হলো অন্য প্রশ্ন। কিন্তু ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্ভব নয়, ইসলামী অর্থনীতি সম্ভব নয় - এই অভিযোগ চলে না। আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া যে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এবং বিশ্বব্যাপী এই চিন্তা নেই যে, ইসলামী অর্থনীতি অচল। যতটুকু মনে পড়ে, ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় ইকোনোমিস্টে 'সার্ভে অব ইসলাম' নামে একটি দশ-বারো পৃষ্ঠার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তারা অনেকটা বিস্তৃত আলোচনা করে, সেটা আমাদের অনেকের দেখা দরকার ছিল। তারা সে লেখায় বলে যে, দুইটি জিনিস এখন আমরা ইসলাম থেকে নিতে পারি। তার মধ্যে একটি হলো, আমরা ইসলামী ব্যাংকিং নিতে পারি। তার মানে তারা মেনে নিয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং ইজ সুপিরিয়র টু কনভেনশনাল ওয়েস্টার্ন মডার্ন ব্যাংকিং। কারণ ওয়েস্টার্ন মডার্ন ব্যাংকিংয়ের যে সঙ্কীর্ণতা বা অসুবিধা অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, ওয়েস্টার্ন মডার্ন ব্যাংকের যে সুবিধা তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু সুবিধা আছে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায়। মুদারাবা, মুশারাকা, বাই মুয়াজ্জাল–এসব ভালো ভালো ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যা তারা গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে তারা যুক্তি দেখিয়েছে যে, অতীতে আমরা ইসলাম থেকে ইউনিভার্সিটির আইডিয়া নিয়েছিলাম। স্পেন, আন্দালুসিয়া থেকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির অনেক

www.nagorikpathagar.org

উন্নত বিষয়ের আইডিয়া নিয়েছিলাম। এখন আমরা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আইডিয়াও গ্রহণ করতে পারি।

এই আলোচনার সারসংক্ষেপ বলতে পারি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর ইম্প্যাক্ট এটা হয়েছে যে, তারা ট্রেড ফাইন্যান্স করতে পেরেছে এবং ফাইন্যান্স সফলভাবেই করেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স করেছে সফলভাবে। ট্রেড ফাইন্যান্স মুরাবাহার ভিত্তিতে, বাই মুয়াজ্জালের ভিত্তিতে করেছে। তারা রুরাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও একটা বড় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাই ইসলামী ব্যাংকিং এদেশে মোটামুটি সফল -এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। ক্যাশ ওয়াকফ (সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ) ব্যবস্থায় ক্যাশ নামে যে ধারণাটি নিয়ে আসছে, এটি হিস্টোরিক্যাল। ইসলামী অর্থনীতিতে এটা আছে, সেটা এরা নিয়ে এসেছে। আপনি আপনার ক্যাশ যেমন ধরুন এক লক্ষ টাকা ওয়াকফ করে দিতে পারেন এবং ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারেন যে, এটা এই এই খাতে বা কর্মে এভাবে ব্যয় করতে হবে। ইসলামের এই চালু নেই ব্যবস্থাটাও বর্তমানে তারা চালু করেছে।

বাংলাদেশে লক্ষ্য করছি ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষাসমূহ আস্তে আস্তে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন আজকে অনেক লোক জানে যে, মুশারাকা কি, মুরাবাহা কি, মুদারাবা কি। একটা সময় ছিল যে, এগুলো আমি নিজেও জানতাম না। আমি ইসলামী মুভমেন্ট করি ১৯৫৭ থেকে কিন্তু আমি ইসলামী ইকোনমির এই টার্মগুলো সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত। অথচ এই সময় পর্যন্ত আমি ইসলামী মুভমেন্টে ছিলাম। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা এগুলোর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করাননি। এটা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে। আলিমরাও করাননি। কোনো খুতবাতেও আমি কোনদিন শুনিনি আলিমরা কোনদিন কোনো খুতবায় বলেছে যে, মুশারাকা কি, মুদারাবা কি, বাই মুয়াজ্জাল কি? এটাও তো আলিমদের তথা সমাজের একটা ব্যর্থতা। দুশো, তিনশো বছর ধরে আমরা জনগণকে ইসলামের পরিচিত টার্মগুলো, বিজনেস টার্মগুলোর সঙ্গে পরিচিত করাতে পারিনি। কাজেই মুসলমান হয়েও কত অন্ধত্বের মধ্যে যে অনেকেই আছেন তা কিন্তু তারা জানেন না।

আজকে এই ইসলামী টার্মগুলো পরিচিত হয়ে গেছে। যদিও এগুলোর সম্পর্কে একটা প্রপাগান্ডা আছে (ট্রেডিং মোডটা তারা বুঝতে পারে না)। ব্যবসায় লাভ আর সুদের টাকার উপর টাকা দেয়া যে এক জিনিস নয়, এটা তারা এখনো বুঝতে পারে না। তারা অনেকেই বলেন যে, আমরা একটু ঘুরিয়ে খাই এই যা। এই ভ্রান্ত ধারণাটাও আমাদের প্রচারের মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে দূর করতে হবে। এলিটরা ইসলামী টার্মগুলো মেনে নিয়েছেন। এই দেশে যারা সবচেয়ে বড় পুঁজিপতি, একশ' কোটি, দুইশ' কোটি টাকার মালিক তারাও আজকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে আগ্রহ ভরে অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য

www.nagorikpathagar.org

করছেন। এলিটরা বুঝেছেন যে, এটা সুবিধাজনক, এতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং, আমি মনে করি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আমরা একটা বিরাট কাজ করেছি। যারা এই আন্দোলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তারা খুব বড় এবং মহান কাজ করেছেন বলে আমি মনে করি। এটা ইসলামের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় পজিশন এনে দিয়েছে। ইসলামী মুভমেন্টের ক্ষেত্রে বড় একটা বাধা ছিল ইসলামী ইকোনমি। এই বাধাটাই তারা দূর করে দিয়েছেন।

সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, আমি যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছিলাম তখন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ সমসাময়িক অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যে রেটিংয়ের দিক থেকে নাম্বার ওয়ান ব্যাংকে পরিণত হয়।

ইসলামের আদর্শ হলো নম্র, ভদ্র এবং শালীনতার আদর্শ। সেটা ছিল আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। এই আদর্শ দিয়ে আমাদেরকে জনগণের কাছে পৌছাতে হবে। এরপরও আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাত্র শুরু বলা যায়। তবুও এটা বর্তমানে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাতে তারা এদেশের অর্থনীতি ও জনগণের ভাগ্য অনেকটা বদলে দিতে পারবে। ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি দাঁড়ানোর কাজ এই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার দ্বারা হয়েছে। এটা যে কত বড় একটা কাজ তা আমি ভাষায় বলতে পারবো না।

আসলে আগে আমাদের বুঝতে হবে যে, ব্যাংকিং কি? আগে ব্যাংকিং, তারপর ইসলামী ব্যাংকিং। আগে রাষ্ট্র, তারপর ইসলামী রাষ্ট্র। আগে মানুষ, তারপর ইসলামী মানুষ। এখন ব্যাংকিং না বুঝলে সমস্যা হবে। ব্যাংকস আর ডিলিং উইথ দ্য পিপলস মানি - জনগণ কি চায়, এটা আপনাকে আরো জানতে হবে। আপনি ভালো ব্যবসা করবেন, সঠিক ব্যবসা করবেন এবং ইসলামী আদর্শ অনুসারে করবেন, করে যতটা প্রফিট সম্ভব করবেন। এটা জনগণের মতামত। এটা ইসলামবিরোধী নয়। সুতরাং, আপনাকে সমন্বয় করতে হবে প্রফিট এবং আদর্শের।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী ব্যাংকিং ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনার পূর্বে আমি এর সংজ্ঞা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করতে চাই।

সংজ্ঞা

ইসলামী ব্যাংকিং হচ্ছে এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) মতে–

> ইসলামী ব্যাংক হলো - এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার মর্যাদা, নিয়ম ও নীতিমালায় ইসলামী শরিয়াহ আইনের প্রতি অঙ্গীকার এবং যে কোনো কর্মকাণ্ডে সুদ গ্রহণ ও প্রদান নিষিদ্ধের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে।

১৯৮৩ সালে প্রণীত মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং আইনে বলা হয়েছে–

> ইসলামী ব্যাংক হলো এমন এক কোম্পানি যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনা করে ... ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় মানে যে ব্যাংকিং ব্যবসার লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ডে ইসলাম ধর্মে অননুমোদিত কোনো উপাদান যুক্ত নেই।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

কেবল মুনাফা অর্জনই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উদ্দেশ্য নয়। জনগণের কল্যাণ এর লক্ষ্য। ইসলামী চেতনা হলো অর্থ, আয় ও সম্পদের মালিকানা আল্লাহর। তাই এই সম্পদ ব্যবহৃত হবে সমাজের ভালোর জন্য। ইসলামে লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারিত্বের যে নীতিমালা রয়েছে এবং অন্যান্য অনুমোদিত বিনিয়োগ মডেলের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক পরিচালিত হয়। এতে সুদ কঠোরভাবে পরিত্যাজ্য যা সকল শোষণের মূল ও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের জন্য দায়ী। ইসলামী ব্যাংকিং অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে বৈষম্য দূর করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ইতিহাস

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, এটা যখন কেবল ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত, যখন এটা কোথাও বেসরকারি উদ্যোগ এবং কোথাও কোথাও আইনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ নেয়।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারণা

সাম্প্রতিক অতীতে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের দিকে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের স্থলে ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। পরের দু'দশকে ইসলামী ব্যাংকিং অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করে। সত্তর দশকের প্রথম দিকে এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সম্পৃক্তির কারণে বাস্তবে অনুশীলন শুরু হয় তত্ত্ব এবং যার ফল হলো ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। এই প্রক্রিয়ায় ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্মলাভ

বিভিন্ন মুসলিম দেশের ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে প্রথম বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক 'দুবাই ইসলামিক ব্যাংক'ও প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। মিসর ও সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' নামে ১৯৭৭ সালে আরো দু'টি বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর কুয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা করে 'কুয়েত ফিন্যান্স হাউজ'। দুবাইয়ের প্রথম বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ১০ বছরের মধ্যে ৫০টিরও বেশি ইসলামী ব্যাংক জন্মলাভ করে। মুসলিম দেশ ছাড়াও ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিকাংশ দেশে বেসরকারি উদ্যোগ কাজ করে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পেছনে এবং এর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকেই সীমাবদ্ধ থাকে। ইরান ও পাকিস্তানে সরকারি উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয় এবং দেশের সকল ব্যাংক এর আওতায় আসে। এ দু'দেশই ১৯৮১ সালে ইসলামী ব্যাংকিং চালুর পদক্ষেপ নেয়।

বর্তমানে যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংক রয়েছেঃ

০১. আফগানিস্তান	০২. আজারবাইজান	০৩. আয়ারল্যান্ড
০৪. আলজেরিয়া	০৫. আলবেনিয়া	০৬. আর্জেন্টিনা
০৭. অস্ট্রেলিয়া	০৮. বাহামা	০৯. বাহরাইন
১০. বাংলাদেশ	১১. বসনিয়া হার্জেগোভিনা	১২. ব্রুনাই
১৩. কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ	১৪. চীন	১৫. সাইপ্রাস

www.nagorikpathagar.org

১৬. ডেনমার্ক	১৭. ইথিওপিয়া	১৮. জিবুতি
১৯. মিসর	২০. ফ্রান্স	২১. জার্মানি
২২. গিনি	২৩. গাম্বিয়া	২৪. হংকং
২৫. ভারত	২৬. ইন্দোনেশিয়া	২৭. ইরান
২৮. ইরাক	২৯. জর্ডান	৩০. কাজাখস্তান
৩১. কেনিয়া	৩২. কিবরিস টার্কিস রিপাবলিক	
৩৩. কুয়েত	৩৪. লেবানন	৩৫. লিবিয়া
৩৬. লিচেনস্টেইন	৩৭. লুক্সেমবার্গ	৩৮. মালয়েশিয়া
৩৯. মালদ্বীপ	৪০. মরিশাস	৪১. মৌরিতানিয়া
৪২. মরক্কো	৪৩. নাইজেরিয়া	৪৪. ওমান
৪৫. পাকিস্তান	৪৬. ফিলিস্তিন	৪৭. ফিলিপাইন
৪৮. কাতার	৪৯. রাশিয়া	৫০. সউদি আরব
৫১. সেনেগাল	৫২. সিরিয়া	৫৩. দক্ষিণ আফ্রিকা
৫৪. শ্রিলংকা	৫৫. সুদান	৫৬. সুইজারল্যান্ড
৫৭. থাইল্যান্ড	৫৮. তানজানিয়া	৫৯. তিউনিসিয়া
৬০. ত্রিনিদাদ ও টোবাগো		৬১. তুরস্ক
৬২. সংযুক্ত আরব আমিরাত		৬৩. যুক্তরাজ্য
৬৪. যুক্তরাষ্ট্র	৬৫. উগান্ডা	৬৬. ইয়েমেন
৬৭. জাম্বিয়া		

ইসলামী ব্যাংকগুলোকে যেসব সমস্যার সমাধান করতে হয়

অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক, বিনিয়োগের জন্য মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জল, বাই সালাম, ইসতিসনা, হায়ার পারচেজ/লীজ এসব পদ্ধতি অবলম্বন করে। ইসলামী ব্যাংক সর্বদা শরিয়াহ আইনের আওতায় লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ফলে অনেক সময় অর্থনীতিবিদ ও সাধারণ জনগণ ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে না।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বিনিয়োগের মুদারাবা ও মুশারাকা ধরন হলো আদর্শ। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক এ দু'টো ধরন অনুসরণ করে না। এর কারণ – উপরোক্ত দু'টি ধরন প্রচলনের জন্য কোনো নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণ ও গবেষণা যেমন হয়নি তেমনি নেয়া হয়নি প্রকৃত প্রচেষ্টা। অবশ্য পেশাদাররা নিম্নোক্ত কারণগুলোকে দায়ী করেনঃ

ক) একনিষ্ঠ উদ্যোক্তার ঘাটতি,

খ) সৃজনশীল একনিষ্ঠ পেশাদারের অভাব,

www.nagorikpathagar.org

গ) পদ্ধতি প্রক্রিয়া,

ঘ) একনিষ্ঠ স্পন্সরের অভাব, যারা কিনা পেশাদারদের এ ব্যাপারে চাপের মুখে রাখতে পারে,

ঙ) দক্ষ পেশাদার জনবলের অভাব।

আগাম চুক্তি বৈদেশিক মুদ্রা বুকিংয়ে সমস্যা

বাংলাদেশে মার্কিন ডলার, পাউন্ড, ইউরো ও অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার মান নির্দিষ্ট নয়। এগুলোর দাম প্রায়ই ওঠানামা করে। আমাদের অধিকাংশ আমদানি-রফতানি হয় মার্কিন ডলারে। শক্তিশালী মুদ্রা হিসেবে মার্কিন ডলার সবসময় সামনে এগিয়ে থাকে এবং দেশের আমদানিকারকদের তুলনায় রফতানিকারকরা ভালো অবস্থায় আছেন। ভারী প্রকল্প-যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে এক বছর বা ৬ মাস লাগতে পারে। এমন দীর্ঘ সময়ের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার মানের তারতম্য সামলানোর জন্য বাংলাদেশে আগাম বুকিং প্রয়োজন হয়। কিন্তু শরিয়াহর বিধি-নিষেধের কারণে ইসলামী ব্যাংক আগাম চুক্তি করে বৈদেশিক মুদ্রা মানের তারতম্য এড়ানোর ঝুঁকি দূর করতে পারে না। আগাম বুকিংয়ের অনুমতি শরিয়াহ দেয় না। শরিয়াহ অনুযায়ী মুদ্রা বিনিময় হতে হবে শরিয়াহ কর্তৃক 'সরফ'-এর লিখিত সুনির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে। ইনল্যান্ড বিল পারচেজ/ফরেন বিল পারচেজ ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা। দেখা যায় যখন রফতানিকারকরা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের জন্য বিল পরিপক্বতা লাভের আগেই রফতানিকৃত পণ্যের মূল্যের জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতি বছর ব্যাংকে শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। কিন্তু এটা কেন বা কি ধরনের বিনিয়োগ? বিল সংগ্রহের সামান্য ফি ছাড়া ব্যাংক রফতানিকারককে দেয়া তহবিলের জন্য কিছু গ্রহণ করতে পারে না।

ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির সাথে পরিচিতির অভাব

গত ৪০ বছর ধরে ইসলামী ব্যাংকের বিস্তার সত্ত্বেও মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বের অনেকেই বোঝেন না ইসলামী ব্যাংকিং আসলে কি, এটা প্রথম সমস্যা। অথচ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূলনীতি পরিষ্কার। টাকা থেকে টাকা বানানো ইসলামী আইনের পরিপন্থী। ব্যবসা ও ভূসম্পত্তির মালিকানা থেকে সম্পদ আয় করতে হবে। তবে কোনটি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উৎপাদন, আর কোনটি নয় তার কোনো একক সংজ্ঞা আজো নেই। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একক সংজ্ঞাও এখনো কেউ দিতে পারেনি। এখানে একটি বড় ব্যাপার হচ্ছে, প্রতিটি ব্যাংকের শরিয়াহ কাউন্সিল বা বোর্ড নির্ধারণ করে কোনটি ইসলামী ব্যাংকিং আর কোনটি নয়, ব্যবসায় কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্য ঝুঁকিপুর্ণ আরো সহজভাবে বলতে গেলে, কি হবে আর কি হবে না। এই অনিশ্চয়তার কারণে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এখনো মান প্রমিতকরণ করা

www.nagorikpathagar.org

যায়নি। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের জন্যও এটা কঠিন। কারণ, তারা জানতে চান তারা আসলে কিসের কর্তৃত্ব প্রদান করছেন। বাজারে নতুন আসা গ্রাহকদের পরিচিত করে তোলার বিষয়টিও এই ব্যাংকের জন্য একটি অতিরিক্ত সমস্যা।

পোর্টফলিও ব্যবস্থাপনা

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রতিনিধির আচরণ নির্ধারিত হয় অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান সীমাবদ্ধতা দ্বারা। অনেক দেশেই ইসলামী ব্যাংক এখনো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে বেড়ে উঠছে। সীমাবদ্ধতা হলো, অনেক দেশেই ইসলামী ব্যাংক তাদের পছন্দসই ও সবচেয়ে অনুকূল সংজ্ঞা বেছে নিতে পারে না। ফলে গ্রাহকের চাহিদা থাকলেই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যায় না এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিবেশে কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় পরিচিত পছন্দসই পরিবর্তনও করা যায় না। যেমন, পরিপক্কতা লাভের পরও স্বল্পমেয়াদী তহবিলের একটা অংশ সাধারণত উত্তোলন করা হয় না। মধ্যম বা দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের জন্য এই তহবিল ব্যবহার করা হয়। ম্যাচিউরিটি ট্রান্সফরমেশন বা পরিপক্কতা রূপান্তরের পূর্বশর্ত হলো - অপ্রত্যাশিত প্রত্যাহার বা অন্য কোনো কারণে একটি ব্যাংক বাইরের উৎস থেকে তারল্য গ্রহণে সক্ষম হবে। সুদমুক্ত ইসলামী অর্থ ও পুঁজিবাজার না থাকায় এ ধরনের কার্যকর পরিপক্কতা রূপান্তরের পূর্ব শর্ত পূরণের মতো যথার্থ ব্যবস্থা ইসলামী ব্যাংকগুলোর নেই। অন্যদিকে সুদমুক্ত বন্ড মার্কেট বা ইসলামী ফিনান্সিয়াল পেপারসের জন্য একটি মাধ্যমিক বাজার থাকলে ইসলামী ব্যাংক টার্ম ট্রান্সফরমেশন জোরদার করতে পারে। এখনো অনেক আর্থিক পদ্ধতি উদ্ভাবন ঘটাতে হবে, তা না হলে আর্থিক মধ্যস্থতা বিশেষ করে ঝুঁকি ও ম্যাচিউরিটি ট্রান্সফরমেশন যথাযথভাবে কাজ করবে না।

নিয়ন্ত্রণকারী পরিবেশ

ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক একটি স্পর্শকাতর বিষয়। প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের জন্য তৈরি একই আইন-কানুনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ইসলামী ব্যাংক এমন এক পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যেখানে আইন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও মনোভাব গড়ে উঠেছে সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সহায়তা করার জন্য। ইসলামী ব্যাংকগুলোর লাভ-লোকসানভিত্তিক কর্মতৎপরতা, আসলে বর্তমান দেওয়ানী আইনের আওতায় পুরোপুরি আসে না। বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজন দেখা দিলে, দেখা যায় দেওয়ানী আদালত ইসলামী ব্যাংকিং তৎপরতার যৌক্তিকতা সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞাত নয়।

ক) আমানত, যা লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা করে। এতে রয়েছে শতভাগ রিজার্ভ এবং তা নিরাপদ। ফলে ঝুঁকি এড়ানো যায়।

www.nagorikpathagar.org

খ) লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব বা ইক্যুইটি হিসাবে আমানতকারীদের বিবেচনা করা হয় ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারদের মতোই। এখানে লাভের হারের বা শেয়ারের মূল্যের নিশ্চয়তা নেই।

অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অনুমতিদানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো খুবই কঠোর। এসব দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের বাড়তি শর্তাবলীও পূরণ করতে হয় (আইনগত বিধি-নিষেধ ছাড়াও বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অমুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকে দুরূহ করে তোলে)। মুসলিম দেশেও অর্থনৈতিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় ইসলামী ব্যাংকের। তহবিল যোগান ছাড়াও গ্রহণযোগ্য বিনিয়োগ ক্ষেত্র খুঁজে বের করা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তারল্য উপাদানের অনুপস্থিতি

অনেক ইসলামী ব্যাংকে ট্রেজারি বিল ও অন্যান্য বিপনণযোগ্য সিকিউরিটিজের মতো লিকুইডিটি ইন্সট্রুমেন্ট বা তারল্য উপকরণের অভাব রয়েছে। এসব উপকরণ তারল্য ঘাটতি বা অতিরিক্ত তারল্য সামাল দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ে ভিন্নতর পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক কাজ করায় এই অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এই অসামঞ্জস্যতার ফলে ইসলামী ব্যাংকে যদি তারল্য ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একে নিয়ন্ত্রণ বা সমর্থন যোগাতে পারে না। তাই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে জড়িত কর্তৃপক্ষের উচিত তারল্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা ও সমাধানের পথ খোঁজা।

আধুনিক প্রযুক্তি ও সংবাদ মাধ্যমের ব্যবহার

গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকেরই প্রডাক্ট এসেনশিয়ালের কোনো বৈচিত্র্য নেই। কোনো পণ্যের মানোন্নয়ন এবং এর ব্যবহার বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী ব্যাংকে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সাধন, ব্যবস্থাপনা ও নীতি নির্ধারণী কাঠামো ঢেলে সাজানো এবং সর্বোপরি এর প্রতিটি পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলন ঘটাতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে। অথচ এটা শুধু সম্ভাবনার পূর্ণ পরিস্ফুটনের জন্য নয়; তীব্র প্রতিযোগিতা, স্পর্শকাতর বাজার এবং সচেতন গ্রাহকদের এই যুগে ব্যাংকগুলোর টিকে থাকার জন্যও জরুরি।

পেশাদার ব্যাংকারের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী ব্যাংকে পেশাদার ব্যাংকার বা ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয়তা এখন পর্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হচ্ছে না। এখনো অনেক ব্যাংক মালিক নিজেই সরাসরি পরিচালনা করেন বা এমন লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয় যাদের ইসলামী ব্যাংকিং

www.nagorikpathagar.org

কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তেমন অভিজ্ঞতা নেই অথবা যারা প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতিতেই অধিক অভ্যস্ত। ফলে অনেক ইসলামী ব্যাংকই চ্যালেঞ্জ ও তীব্র প্রতিযোগিতা মোকাবিলায় সক্ষম হয় না। পেশার প্রতি একনিষ্ঠ যোগ্য ব্যাংকারদের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়িয়ে ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডে পেশাদারিত্ব তৈরি করা প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত পেশাদারদের বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে তাদের শিল্প, প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীর ধারণা অর্জন করতে হবে। ব্যবসায়িক উদ্যোগের পাশাপাশি বিনিয়োগের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রয়োগ সম্পর্কেও তাদের ধারণা থাকতে হবে। ব্যাংকিং পেশাদারদের ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণও দিতে হবে।

অধিকাংশ ব্যাংকের জনশক্তি প্রচলিত অর্থনীতিতে প্রশিক্ষিত। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের দূরদৃষ্টি ও নিষ্ঠায় ঘাটতি রয়েছে। বর্তমান ইসলামী ব্যাংকগুলো অনেকটা স্থবির। গতিশীল কর্মসূচির অভাবই শুধু নয় এসব ব্যাংক এখন পর্যন্ত সংবাদ মাধ্যমকেও যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছে না। এই বিশ্বে যে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা চালু রয়েছে মুসলমানরাও সে ব্যাপারে খুব একটা সচেতন নয়। নিজেদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে ইসলামী ব্যাংকগুলো এখন পর্যন্ত মিডিয়াকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। ইসলামী ব্যাংকগুলোর কর্তৃপক্ষকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিষয়টির ওপর নজর দেয়া উচিত।

প্রচলিত ব্যাংকারদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামী পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি গুলিয়ে ফেলা

পেশাগত প্রকৃতির কারণেই ব্যাংকাররা বাস্তববাদী ও প্রয়োগমুখী। ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত ব্যাংকারদের প্রবণতা হচ্ছে ইসলামী নীতিগুলোকে উপস্থিত লেনদেনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এমনভাবে সাজিয়ে নেয়া। অধিকন্তু প্রতিদিনের ব্যস্ততার ফাঁকে কোনো গবেষণা করার সময় তাদের কমই থাকে। অথচ এ গবেষণা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারত। অন্যদিকে যেসব বুদ্ধিজীবী ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স নিয়ে গবেষণা করেন তাদের মনোভাব অনেকটা পদ্ধতিগত। অর্থাৎ কি হওয়া উচিত, এটা নিয়েই তারা অধিক ব্যস্ত। ব্যাংকিং বা গ্রাহকদের চাহিদা সম্পর্কে তাদের খুব কম জনেরই ধারণা আছে।

ইসলামী অর্থবাজারের অনুপস্থিতি

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থবাজারের অনুপস্থিতির কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করতে পারে না। এই তহবিল ব্যবহার করা যায় না বলে আয়ের বদলে তা অলস ফেলে রাখতে হয়। কারণ, বাংলাদেশে সরকারি ট্রেজারি বিল, অনুমোদিত সিকিউরিটিজ ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিল - সব কিছুই সুদ উৎপাদক। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী ইনভেস্টমেন্ট বন্ড' চালু করে। ইসলামী ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে। এর ফলে এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে।

উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের অনুপস্থিতি

ইসলামী ব্যাংকগুলোর উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের অনুপস্থিতির প্রমাণ স্বল্পমেয়াদী লেনদেনযোগ্য আর্থিক উপাদনের স্বল্পতার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আন্তঃব্যাংক বাজারের মতো কোনো স্থান নেই যেখানে কোনো ব্যাংক গিয়ে দৈনন্দিন উদ্বৃত্ত তহবিল হাজির করতে পারে অথবা সাময়িক তারল্য ঘাটতি পূরণের জন্য যেখান থেকে তহবিল গ্রহণ করা যায়। আবার পরিপক্কতার আগ পর্যন্ত যেখানে লাভের হার জানা যায় না সেখানে ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্ট লেনদেনের ব্যবস্থা করাও কঠিন। তাছাড়া বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো নতুন ধরনের ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করতে পারে কি না তাও পরিষ্কার নয়। প্রকৃত অর্থে এসব কার্যকারণ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংকে বেশ প্রতিকূল অবস্থায় ফেলেছে।

সহায়ক ও সংযোগ প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা

যত সমন্বিতই হোক না কেন, কোনো ব্যবস্থাই কেবল নিজস্ব উপায়-উপাদানের ওপর টিকে থাকতে পারে না। উপযুক্ত প্রকল্প চিহ্নিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকিং লাভজনকভাবেই অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, বীমা কোম্পানি, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, নিরীক্ষক ইত্যাদি পেশাদারের সেবা গ্রহণ করতে পারে। গ্রাহকদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা তৈরির জন্য ব্যাংকগুলোর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ফোরাম থাকা প্রয়োজন। পুরোপুরে ইসলামী ব্যাংকিংমুখী এ ধরনের সহায়ক সেবা এখনো বাংলাদেশে গড়ে উঠেনি।

বিদেশী ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা হলো, বিদেশী ব্যাংকগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। আরো সহজভাবে বলতে গেলে, কিভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা তৎপরতা চালানো হবে। এটা অবশ্যই নতুন কোনো আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরির সাথে জড়িত যে ইনস্ট্রুমেন্ট একই সাথে ইসলামী নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুদভিত্তিক ব্যাংক, তথা বিদেশী ব্যাংকগুলোর কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে।

দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন

সরকারের মূল্য নির্ধারণ নীতির সাথে ইসলামী ব্যাংকগুলো গভীরভাবে যুক্ত থাকে কোনো যৌক্তিকতা ছাড়াই। উদ্যোক্তাদের মূল্যস্তর বাড়িয়ে দেয়ার মতো গোপন কস্ট ও ইনপুট থেকে এরা লাভবান হতে পারে না। অন্যদিকে, বিনিয়োগকৃত প্রকল্পের ব্যর্থতার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

ব্যাংকগুলো লাভসহ তহবিল ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা, প্রকল্পের সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। অসততা ও উপেক্ষার মাধ্যমে অংশীদারের কাছ থেকে নিরাপত্তা আদায় করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

সম্ভাবনা

আমার মতে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। দেশের ব্যাংকিং খাতের অন্তত ২১-২৪ ভাগ বাজার ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণে। এর পরিধি ক্রমেই বাড়ছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি প্রচলিত ব্যাংকগুলো ঝুঁকছে। বর্তমানে ৮টি ইসলামী ব্যাংক ও ১৭টি প্রচলিত ব্যাংকে পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং উইং চালু আছে। এদের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকও রয়েছে। সারাদেশে শুধু ইসলামী ব্যাংকেরই ২৮০টি শাখা রয়েছে। ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক মিলিয়ে এ সংখ্যা ৭৬৪ (আগস্ট ২০১৪)।

সব দেশে অবস্থা সমান না-ও হতে পারে। যদি কোনো একটি দেশেও ইসলামী ব্যাংক সফল হতে পারে, তাহলে আমার মতে প্রত্যেক মুসলিম দেশের অবস্থা একই হবে। এর মানে, কোনো দেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংকটিকে দক্ষতার সাথে পরিচালিত এবং সফল হতে হবে। যাতে, জনগণ এর ওপর আস্থা রাখতে পারে। নতুন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরনোগুলোর উচিত দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা ধার দিয়ে সাহায্য করা।

উপরে যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে উত্তরণ অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। আরও আন্তরিকতাপূর্ণ চেষ্টা ও গবেষণার মাধ্যমে এর অধিকাংশ সমস্যা দূর করা সম্ভব। আইডিবি, ওআইসি, ফিকাহ একাডেমি, আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের উচিত ইসলামী ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স ও অর্থনৈতিক ইস্যুগুলোতে গবেষণার জন্য আরো খরচ করা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারি সহায়তার প্রয়োজন হবে।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ব আর্থিক সংকট
অংশীদারিত্ব ব্যাংকিংই একমাত্র সমাধান

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এখন উল্লেখ করার মতো আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। এ সংকট ১৯৩০-এর দশকের মতো ব্যাংকগুলোকে অচল অথবা ব্যাংকিং খাতের ব্যর্থতাকে নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য করে না তুললেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন অর্থ সংকটে ভুগছে। এ ধরনের সংকট গত ৫০ বছরে কখনও দেখা যায়নি।

আইএমএফ-এর সমীক্ষা অনুযায়ী আইএমএফ-এর সদস্য দেশসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি রাষ্ট্র উল্লেখ করার মতো আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। ব্যাংকিং খাতের সংকটের কারণে সৃষ্ট উচ্চমূল্য ও সামষ্টিক অর্থনীতির নানা প্রতিবন্ধকতা আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহের বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ হয়ে আছে।

সাম্প্রতিককালে এশিয়ার কিছু কিছু দেশ মারাত্মক মুদ্রা ও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। কয়েক দশকের সময়কার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পর এশীয় দেশগুলো এ ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয়। সর্বশেষ ২০০৮ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ক্রাইসিস দেখা দেয়। শেয়ার মার্কেটের পতন হয়, অসংখ্য ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়, শিল্প বন্ধ হয় এবং লোকজন বেকার হয়। এটা চলছে।

বর্তমান সংকটের পূর্ব পর্যন্ত উন্নয়নশীল বিশ্বের মূলধন প্রবাহের অর্ধেকই এসেছে এশিয়ায়। বিগত দশকে বিশ্ববাজারে এশিয়ার বিকাশমান ও উন্নয়নশীল বাজার অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণে উন্নীত হয়ে বিশ্ব রপ্তানির এক-পঞ্চমাংশে পৌঁছে। এ ধরনের প্রবৃদ্ধির রেকর্ড ও শক্তিশালী বাণিজ্য সাফল্যের নজীর অভূতপূর্ব এবং ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রশ্ন হলো, বহু বছরের অসাধারণ সাফল্যের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসব ঘটনা কিভাবে ঘটল? ভুলটি হয়েছিল কোথায়?

বহু দিক থেকে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও কোরিয়া প্রায় একই ধরনের সংকটের মোকাবিলা করছে। এসব দেশ আস্থার সংকটে ভুগছে এবং তাদের মুদ্রা ব্যাপক অবমূল্যায়নের শিকার। অধিকন্তু প্রতিটি দেশের দুর্বল আর্থিক

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ বেসরকারি খাতের অতিমাত্রায় বিদেশী ঋণগ্রহণ এবং স্বচ্ছতার অভাব সংকটের সৃষ্টি করেছে এবং তা নিরসনের প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলেছে (আইএমএফ সমীক্ষা, বিভিন্ন সংখ্যা)।

১৯৯০-এর দশকে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ আর্থিক খাতের সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সংকটের বৈশিষ্ট্য ছিল অব্যাহতভাবে আমানত প্রত্যাহার, পুঁজি নিয়ে সরে পড়া এবং ব্যাংকিং খাতের ব্যর্থতা। ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে ভেনিজুয়েলার সংকট মুদ্রাস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধির ওপর সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বস্তুত সামষ্টিক ব্যবস্থাপনার ভারসাম্যহীনতা, অসম্পূর্ণ আর্থিক উদারীকরণ, ব্যাপক হারে আভ্যন্তরীণ ঋণগ্রহণ, জালিয়াতিকে গোপন করে রাখার সুযোগ না পাবার মতো প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং তত্ত্বাবধানের অভাব ইত্যাদির সম্মিলিত ফল হিসেবে আলোচ্য সংকটের সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিকে সূচিত আর্জেন্টিনার আর্থিক খাতের সংকটের সময় ব্যাপক আকারে পুঁজির বহির্গমন লক্ষ্য করা যায়। মেক্সিকান অবমূল্যায়নের প্রভাব, চলতি হিসেবের ঘাটতি, নিম্নপর্যায়ের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও অবনতিশীল রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সালে শুরু হওয়া প্যারাগুয়ের ব্যাংকিং সংকটের সৃষ্টি হয় প্রধানত পর্যাপ্ত ব্যাংক সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই আর্থিক উদারীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। এতে অপর্যাপ্ত পুঁজিসর্বস্ব একটি আর্থিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক মুদ্রা বিপর্যয়, পুঁজির প্রবাহ বর্ধিত এবং আর্থিক বাজারের ক্রমাগত বিশ্বায়নে উন্নয়নশীল দেশের বিশেষত বিকাশমান অর্থনীতির দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে উদারভাবে মুদ্রা ব্যবস্থাপনা সাজানোর উদ্যোগ প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়েছে।

আর্থিক সংকটের বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের দিক নির্দেশনা

পূর্ব এশিয়ার সাম্প্রতিক আর্থিক সংকটের কারণসমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সংকটের সমাধানের জন্য আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, সংকট নিরসনের জন্য দেয়া এসব পরামর্শ কতটুকু যথার্থ এবং তা কতটা ইসলামী নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অর্থনীতিবিদের প্রস্তাবিত সমাধান কতটা আমরা গ্রহণ করতে পারি? এসব সমাধান কি ইসলামী ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য এবং অর্থনীতির তত্ত্ব ও ধারণাসমূহ কি অপরিহার্যভাবে মূল্য নিরপেক্ষ? আর্থিক সংকট দূর করা বা তা প্রতিহত করার ব্যাপারে কি বিশেষ ইসলামী কৌশল ও কর্মসূচি রয়েছে?

১৯৯৭-৯৮ এর এশীয় আর্থিক সংকটকে সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অর্থনীতিবিদ, আইএমএফ কর্মকর্তা ও অন্যরা প্রধানত নিম্নে উল্লেখিত কারণগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে, এসব

www.nagorikpathagar.org

দেশের অধিকাংশতেই কৃত্রিম বিনিময় হার বজায় রাখার মাধ্যমে স্থানীয় মুদ্রাকে অতিমূল্যায়িত করে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সময়মত ও যথাযথভাবে মুদ্রার অবমূল্যায়ন অনুমোদন করেনি। এর ফলে অধিকাংশ দেশেই চলতি হিসাবের ঘাটতি স্ফীত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বিনিময় হারের পতন ঘটেছে। একই সময়ে মুদ্রার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের আন্দাজ-অনুমান এবং ভবিষ্যত বাণীও আস্থায় চিড় ধরিয়েছে। এটি মুদ্রার বিনিময় হারকে দ্রুত নিচে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, এসব দেশ বিপুল অংকের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেছে, যার অধিকাংশ নেয়া হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। এসব ঋণের সিংহভাগ স্বল্প মেয়াদের জন্য গ্রহণ করে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করা হয়। আর্থিক সংকটের সামান্য আভাস পাবার পর বিদেশী পুঁজির ব্যাপক বহির্গমন শুরু হয়। যা থেকে বড় আকারের তারল্য সংকটের সূত্রপাত ঘটে। সংকট কবলিত দেশগুলোর মধ্যে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার উদ্ধার প্যাকেজ সহায়তা ছাড়া উক্ত ঋণ ফেরত দানেও অসমর্থ হয়ে পড়ে। বিদেশী পুঁজির আকস্মিক নির্গমনের ফলে স্থানীয় মুদ্রার মূল্যমান দ্রুত পড়ে যায়, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়, প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়, বেকারত্ব বাড়তে থাকে, আয় কমে যায়, সামাজিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, এমনকি কোথাও কোথাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যায়।

তৃতীয়ত, এসব দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রেও মারাত্মক সমস্যা ছিল। বিদেশ থেকে নেয়া তহবিলসহ বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয় মন্দ খাতে। এ কারণে এসব দেশ ১৯৯৭-৯৮ সালের সংকট দেখা দেয়ার আগে থেকেও মন্দ ঋণের সমস্যার সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও তত্ত্বাবধান এবং বিধিগত অনুশাসনমূলক দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। ফলে সংকটের সৃষ্টি হবার পর অধিকাংশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তা অথবা বিদেশ থেকে কোনো উদ্ধার প্যাকেজ ব্যতিরেকে তাদের বৈদেশিক দায় মেটাতে ব্যর্থ হয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আর্থিক সংকটের সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব করেছেন তার মূল বক্তব্য নিচে দেয়া হলোঃ

এক. যেসব দেশ মুক্তভাবে অথবা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে নমনীয় বিনিময় হার অনুসরণ করেছিল তা তাদের বজায় রাখা উচিত। আমার বিবেচনায়, এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত কার্যক্রম হবে। তা না হলে অতিমূল্যায়িত মুদ্রার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সামনেও অব্যাহত থাকবে।

দুই. বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবাহকে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদী বেসরকারি পুঁজি অত্যন্ত সতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিত।

প্রকৃত খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা দরকার। প্রয়োজনবোধে দেশে স্বল্পমেয়াদী পুঁজি প্রবাহের পর্যায় ও শর্তাবলী কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

আমার বিবেচনায় বেসরকারি পুঁজিপ্রবাহ, বিশেষভাবে স্বল্পমেয়াদী বেসরকারি পুঁজিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদী বাজারে নানা সমস্যা দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপেক্ষা করতে পারে না।

তিন. আর্থিক ব্যবস্থার সব ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমনভাবে ব্যাংকগুলোকে পরিচালনা করা উচিত যাতে মন্দ ঋণ সমস্যা ও তারল্য সংকটের কারণে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে - এমন মন্দ বিনিয়োগ কোনোভাবেই এসব ব্যাংক করতে না পারে। আর্থিক সংকটে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, একটি শক্তিশালী ও কার্যকর কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং গতিশীল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কত বেশি।

ভবিষ্যতে যে কোনো দেশ যাতে আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা পেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পর্কে উপরে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এসব সমাধানকে ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী সরকারও অন্যদের সাথে অনুসরণ করতে পারেন। বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে এসব কর্মসূচিকে সংযুক্ত করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধান, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম, বিনিময়নীতি, হার প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ইসলামী বা অ-ইসলামী শাসনে একই রকম থাকতে পারে। একই সাথে এটাও বলা যায় যে, অর্থনীতির অধিকাংশ তত্ত্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয় (কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে), অবশ্য ইসলামী অবকাঠামোতে ন্যায়বিচার ও নৈতিক মানদন্ডসহ আরো কিছু বিষয় বিবেচনায় আনা হয়। অনেক কারণে উপরে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত আর্থিক সংকট থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়। ভালো ব্যবস্থাপনা ও যুক্তিযুক্ত তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করে 'ইকোনমিস্ট' (লন্ডন) বলেছেঃ 'পাশ্চাত্য আধুনিক যুগেও ইসলামের কাছ থেকে ইকুইটি ব্যাংকিং বা অংশীদারিত্বের ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিতে পারে' (দি ইকোনমিস্ট, আগস্ট ১৯৯৪, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মন্দ বিনিয়োগের সম্ভাবনা অনেক হ্রাস পায়। এ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের ব্যাপারে অনেক বেশি তত্ত্বাবধান করা হয় বলে যে কোনো ইকুইটি স্কিমে মন্দ ঋণের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। 'মুশারাকা' ব্যবস্থায় বিদেশী তহবিল নেয়া হলে এ ধরনের পুঁজির অসময়ে পালিয়ে যাওয়া বা প্রত্যাহার করে নেয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী ব্যবস্থায় ধারণা-অনুমানের আচরণ (Speculation) অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইসলাম জুয়াকে নিষিদ্ধ করেছে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামে অনুমাননির্ভর ব্যবস্থাকে দারুণভাবে অপছন্দ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এটি সত্য যে, অনেকসময় স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও অনুমানের মধ্যে পার্থক্য করে অনুমানকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবুও ইসলামী ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক কর্তৃপক্ষ অনুমানভিত্তিক তৎপরতার (শেয়ার বাজার অথবা মুদ্রা বাজার অথবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন) উপর ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ অথবা দিকনির্দেশনা জারি করতে পারে। যদি সবকিছুকে মুক্ত রাখার পক্ষপাতি একশ্রেণীর অর্থনীতিবিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও অর্থনীতির স্বার্থে প্রয়োজন হয় অথবা জনগণ চায় তাহলে এ পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থনীতির আকস্মিক পরিবর্তনশীলতা ইসলামী অর্থনীতিতে কম দেখা যায়। এটা স্বীকৃত যে, ভালো ব্যবস্থাপনার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আর্থিক সংকট থেকে রেহাই পাবার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থার যে সুবিধা তা অন্য কোনোভাবে পাওয়ার সুযোগ নেই।

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনে অর্থনীতি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আমানতের খেয়ানত প্রসঙ্গে

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهٖ إِلَيْكَ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ
لَا يُؤَدِّهٖ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي
الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ * بَلٰى مَنْ أَوْفٰى
بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ *

কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দেবে, আবার এমন লোকও আছে, যার কাছে একটি দিনারও আমানত রাখলে তার পেছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দেবে না, এটা এই কারণে যে, তারা বলে নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং তারা জেনে শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। হ্যাঁ, কেউ তার অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং সাবধান হয়ে চললে আল্লাহ মুত্তাকীকে ভালোবাসেন।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৭৫-৭৬)

ভূমিকা

সূরা আলে ইমরানের ৭৫ নং আয়াতে তৎকালীন ইহুদিদের নৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক মানসিকতা ও স্বার্থপরতার কথা বলা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যেও ভালো লোক ছিল, কিন্তু আয়াতে যেভাবে তাদের মানসিকতার উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তাদের অধিকাংশই ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর এবং আমানতের খেয়ানতকারী। এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষিতে আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা যামাখশারী তার তাফসীরে কাশ্‌শাফে ও আল্লামা আলূসী তার তাফসীর রূহুল মা'আনীতে আমানতের খেয়ানতের ব্যাপারে তৎকালীন ইহুদিদের নীচ আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন।

উম্মী শব্দের অর্থ

আয়াতে ব্যবহৃত 'উম্মী' শব্দের অর্থ যদিও নিরক্ষর তথাপি পরিভাষার দিক থেকে এ শব্দটি ইহুদি ব্যতীত অন্য সবার জন্য ইহুদিরা ব্যবহার করত। অর্থনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

বিষয়াদিতে বনী ইসরাঈলরা ইহুদিদের জন্য এক আইন এবং অন্যদের জন্য অন্য আইন প্রয়োগ করত (দ্রষ্টব্যঃ তাফহীমুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৪ নং টীকা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা)। এই বৈষম্যমূলক আচরণকে তারা সঠিক মনে করত বলেই তারা নিজেদের মধ্যে রক্ষিত আমানতকে আদায় করত এবং অন্যদের রাখা আমানতকে তারা আদায় করত না। এ বৈষম্যমূলক আচরণকে তারা তাদের শরিয়ত মোতাবেক বৈধ মনে করত - যেমন আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ অথবা আমানতের খেয়ানত আল্লাহ কখনো করতে বলেননি। এ ব্যাপারে তারা যা বলে তা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ মাত্র। ৭৫ নং আয়াতে ইহুদিদের খেয়ানতের মানসিকতা উল্লেখ করার পর আল্লাহ পাক ৭৬ নং আয়াতে আমানতদারী ও তাকওয়া গ্রহণ পর্যায়ে একটি সাধারণ তাৎপর্যবোধক ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলছেন - যে কেউ অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলবে তাকে আল্লাহ ভালোবাসেন। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, অঙ্গীকার রক্ষা করা (যার মধ্যে আমানত রক্ষা করা, খেয়ানত না করাও শামিল) আল্লাহ পছন্দ করেন। এখানে আল্লাহ কেবল অঙ্গীকার পূরণ করতে, চুক্তি রক্ষা করতে উৎসাহিত করছেন। একই বিষয়কে আল্লাহ পাক সূরা মায়িদাতে ফরজ ঘোষণা করছেন এ ভাষায় ঃ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের চুক্তিসমূহ মেনে চল।

(সূরা মায়িদা: আয়াত ১)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সূরা মায়িদার এ আয়াত আলোচনার সময় চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ও এসবের সঙ্গে সম্পাদিত আইন-কানুন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এ কথা বলাই যথেষ্ট হবে যে, অঙ্গীকার পূরণ করাকে ইসলাম অত্যন্ত জরুরি মনে করে। সব ধরনের অঙ্গীকার রক্ষা করার উপর সমাজ ও অর্থনীতির সুস্থতা ও ভারসাম্য নির্ভর করে। অঙ্গীকার রক্ষা না হলে সমাজ ও অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে ও অর্থনীতিতে স্বাধীন ইচ্ছায় এবং শরিয়তসম্মত যেসব অঙ্গীকার করা হবে, তা রক্ষা করতে সবাইকে বাধ্য করা হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-আদালতের তা অন্যতম দায়িত্ব হবে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, ৭৬ নং আয়াতের লক্ষ্য কেবল ইহুদিরা নয় বরং সকল মানুষ এ আয়াতে সাধারণ তাৎপর্যবোধক বা 'আম' পর্যায়ের। আল্লামা যামাখশারীও আয়াতটিকে 'আম' বলেছেন। আয়াতের মধ্যকার শব্দের বিচারেও তা স্পষ্ট। কাজেই আয়াতের নির্দেশ সবার প্রতি প্রযোজ্য। মুসলমানদেরকে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং জীবন ও সমাজে এ নির্দেশকে কার্যকর করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

এতিম ও নারীদের সমস্যা এবং অধিকার সম্পর্কে

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى
الْكِتٰبِ فِى يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ط وَمَا
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا * وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ
إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ط وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا *

এবং লোকেরা তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন এবং (সে সঙ্গে সে হুকুমগুলোও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন) এই কিতাবে বর্ণিত যে এতিম মেয়েদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান করো না, তাদের বিবাহ করতে তোমরা আগ্রহ পোষণ করো না এবং (সেই হুকুমগুলোও) যা অসহায়-অক্ষম শিশুদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। তোমরা এতিমদের প্রতি ন্যায়বিচার করবে। তোমরা যে কল্যাণকর কাজ করবে, তা আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। কোনো নারী যদি তার স্বামীর দিক থেকে নিষ্ঠুর ব্যবহার কিংবা তাকে পরিত্যাগের আশংকা করে, তখন স্বামী-স্ত্রী যদি তাদের মধ্যে পারস্পরিক আপোষে মিটমাট করে তবে তাতে দোষ নেই। এরূপ মীমাংসাই উত্তম। যদিও মানুষের মন লালসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু তোমরা যদি ইহসান অবলম্বন কর ও আত্মসংযমী হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কর্মনীতি সম্পর্কে অবহিত আছেন। (সূরা আন-নিসা: আয়াত ১২৭-১২৮)

প্রেক্ষিত

সূরা নিসায় ব্যাপকভাবে পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, নারী ও এতিমদের অধিকার ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াত দু'টিতেও এতিম ও নারীদের

www.nagorikpathagar.org

সমস্যা, তাদের অধিকার ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা আলূসী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মিরাসের আয়াত নাযিল হলে বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। কেননা এটা তাদের কঠিন মনে হলো। তারা প্রশ্ন করতে লাগলো, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে অক্ষম-অযোগ্য কম বয়সী ছেলেরাও কি ওয়ারিশ হবে? কম বয়সী মেয়েরাও কি উত্তরাধিকার পাবে? আসলে তারা আশা করছিল যে, এ ব্যাপারে আসমান থেকে কোনো সংশোধনী আসবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে করতে তারা দেখল যে, কোনো ওহি আর এলো না। তখন তারা ভাবলো, এ বিষয়ে যা হবার তা হয়েই গেছে তবে তো মিরাস সংক্রান্ত হুকুম মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তারা বলাবলি করলো, চল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবার প্রশ্ন করা যাক। এ প্রস্তাব অনুসারে তাঁকে তারা পুনরায় প্রশ্ন করায় এ (১২৭ নং) আয়াত নাযিল হয়।[১]

সাধারণ তাৎপর্য

আয়াতদ্বয়ে নারীদের অধিকার সম্পর্কে যে সব বিধান ও নির্দেশ এ সূরার শুরুতে দেয়া হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও এতিম ছেলে-মেয়েদের সম্পত্তি ও অন্যান্য অধিকারের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এতিম ও নারীদের আর্থ-সামাজিক অধিকারের বেশ কিছু আলোচনা সূরা নিসার পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে বলা হয়েছে। ১২৮ নং আয়াতে নতুন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে তালাক ও বিচ্ছেদের পরিবর্তে পারস্পরিক অধিকারের কিছু কম-বেশির ভিত্তিতে মীমাংসা করে নেয়াকে উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মানসিক সংকীর্ণতাকে নিন্দা করা হয়েছে। স্ত্রীর সদ্ব্যবহার বা ইহসানকে উৎসাহিত করা হয়েছে।[২]

আর্থ সামাজিক তাৎপর্য

পারিবারিক সংগঠন ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য পারিবারিক শান্তি রক্ষা সংক্রান্ত বিস্তৃত বিধি-বিধান ইসলাম দিয়েছে। এর বিরাট অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। মজবুত পারিবারিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত কল্যাণকর। এর মাধ্যমে কেবল সামাজিক শান্তিই রক্ষা পায় না, অনেক অসহায় লোকেরও ব্যবস্থা হয়। যে সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থা শক্তিশালী, সেখানে দুঃস্থ লোকের দায়-দায়িত্ব সরকার ও সমাজকে কম বহন করতে হবে। ১২৮ নং আয়াতে উল্লিখিত তালাকের পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আপোষ-মীমাংসার বিধান এ জন্যই দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে ১২৭ নং আয়াতে এতিম শিশুদের কথা ও এতিম মেয়েদের কথা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করে তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়া, তাদের সম্পত্তি তাদের প্রত্যার্পণ করা, তাদের অন্যান্য দান পাওয়ার (যেসব বিষয় সূরা নিসার প্রথম দু' রুকুতে আলোচিত হয়েছে) অধিকারের কথা জোরের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে - এসব বিষয়কে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুদের সব অধিকার সংরক্ষণ করা।

গ্রন্থপঞ্জী

১. তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬১, সূরা আন-নিসার ১২৭-১২৮ নং আয়াতের তাফসীর।

২. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন-নিসার ১২৭-১২৮ নং আয়াতের তাফসীরের সারাংশ।

www.nagorikpathagar.org

কালালা'র সম্পত্তি বণ্টন প্রসঙ্গে

يَسْتَفْتُونَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ
اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ *

লোকেরা তোমার নিকট কালালা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। কোনো ব্যক্তি যদি সন্তানহীন অবস্থায় মরে যায় এবং তার একজন বোন থাকে তবে সে (বোন) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধেক পাবে এবং বোন যদি সন্তানহীনা অবস্থায় মারা যায় তবে ভাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দু'বোন হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই বোন কয়েকজন হয়, তবে পুরুষের অংশ নারীর দ্বিগুণ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য আইন-কানুন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশংকায়। আল্লাহ সবকিছু জ্ঞাত ও অবহিত। (সূরা আন-নিসা: আয়াত ১৭৬)

ভূমিকা

আয়াতটি সূরা নিসার অন্যান্য আয়াত নাযিলের বহু পরে নাযিল হয়েছে। হাদিসের কোনো কোনো বর্ণনা হতে মনে করা যায় যে, এ আয়াত কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। এ বর্ণনা সহিহ প্রমাণিত না হলেও বস্তুত পক্ষে এতটুকু প্রমাণিত যে, এ আয়াত নবম হিজরিতে নাযিল হয়েছিল। সূরা নিসা পূর্ব হতেই একটি সম্পূর্ণ সূরা হিসেবে পঠিত হয়ে আসছিল। এ কারণে সূরার শুরুতে মিরাস সংক্রান্ত আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতার সঙ্গে এ আয়াতকে শামিল করা হয়নি, বরং সূরার শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে রাখা হয়েছে।[১]

www.nagorikpathagar.org

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ 'কালালা' সম্পর্কে আলোচনা

'কালালা' كَلَالَة শব্দের অর্থ কি, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো কারো মতে, 'কালালা' সে ব্যক্তি যার কোনো সন্তান নেই এবং বাপ-দাদাও জীবিত নেই। কারো কারো মতে, 'কালালা' সেই ব্যক্তি যে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছে। সাধারণ ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা)-এর মতকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, 'কালালা' হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার কোনো সন্তান নেই এবং বাপ-দাদাও জীবিত নেই। কুরআন হতেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা কুরআনে 'কালালা'র বোনকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের অধিকারিণী করা হয়েছে অথচ কারো পিতা জীবিত থাকলে সে বোন কোনো কিছুই পায় না।[২]

আয়াতের আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সূরা নিসার ১১ ও ১২ আয়াতে মিরাসের বিস্তারিত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।

এ আয়াত প্রসঙ্গে ফিকহবিদগণ একমত হয়েছেন যে, এখানে সে সব ভাই-বোনের মিরাসের কথা বলা হয়েছে যারা মা-বাপ উভয় দিক বা বাপের দিক দিয়ে ভাই-বোন। এর অর্থ হলো যে, সূরা নিসার দ্বিতীয় রুকুতে যে ভাই-বোনের মিরাসের উল্লেখ করা হয়েছে তারা হচ্ছেন কেবল মায়ের দিক দিয়ে ভাই বা বোন। এখানে এ কথাও স্পষ্ট যে ছেলে হোক, মেয়ে হোক, একজন সন্তান থাকলেও মৃতের ভাইবোন উত্তরাধিকার পাবে না।

মিরাসী আইন ইসলামী বিধানের একটি মূল অংশ। এটি ইসলামী অর্থনীতির বণ্টন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত রাখাই সঙ্গত হবে। ইসলাম ব্যাপক বণ্টনকে সমর্থন করেছে। মৃতের সম্পত্তির ব্যাপক বণ্টন হিংসা, বিদ্বেষ ও বঞ্চনার মনোভাব দূর করতে সাহায্য করে এবং তা সামাজিক সৌহার্দ্যের ও শান্তির সহায়ক। ব্যাপক বণ্টন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কল্যাণকর। মিরাসী আইনের মাধ্যমে অনেক দরিদ্র আত্মীয়ের পুনর্বাসন হয়ে থাকে। যে সমাজে মিরাসী আইন যথাযথভাবে কার্যকর হয় সে সমাজে সংশ্লিষ্ট লোকদের পুনর্বাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান অনেক সহজতর হয়ে আসে আর এরা সরকারের উপরও এ ক্ষেত্রে তেমন একটা বোঝা বলে প্রতীয়মান হয় না।

এর ফলে সমাজের অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল হয়। অন্যদিকে ব্যাপকভাবে সম্পদ বণ্টনের ফলে সমাজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই পুঁজিহীন মানুষের সংখ্যা কম থাকে। তাতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে একটা সুস্থ ও প্রগতিশীল ধারা প্রবাহিত থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা অংশ দ্রষ্টব্য।

২. তাফহীমুল কুরআন, প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ *

আর পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও তামাশার ব্যাপার ব্যতীত কিছুই নয়। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়। তবে কি তোমরা তা অনুধাবন কর না?

(সূরা আল আন'আম: আয়াত ৩২)

শব্দের আলোচনা

لهو ও لعب শব্দ দু'টি সমার্থক, কেননা উভয়ই বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে অবান্তর কাজে উৎসাহ দান করে এবং হালাল হারাম নির্বিশেষে অযথা চিত্তবিনোদন বা আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত করে।[১]

لعب খেলাধুলা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন يلعب فلان অর্থ অমুক ব্যক্তি খেলছে।

لهو বলতে ঐ বস্তুকে বোঝায় যা মানুষকে কষ্টের কাজে লিপ্ত করে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে।[২]

মুফাসসিরদের মতামত

ক. আল্লামা আলূসী (র) লিখেছেন, পূর্বের আয়াতে এ পার্থিব জীবনের পেছনে বিপদসংকুল আর একটি জীবন আছে তা বলার পর এ উভয় জীবনের মধ্যে মূলত কি পার্থক্য আছে এ আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব উদ্দেশ্যে, পার্থিব জীবনের কাজ এবং ফলাফল ক্ষণস্থায়ী হওয়ার দৃষ্টিতে ক্রীড়া-কৌতুকের সমতুল্য ছাড়া কিছু নয়। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এবাদত, নেক আমল ও জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম ও শ্রম একথার আওতা বহির্ভূত হয়ে যাবে।[৩]

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, আয়াতের বক্তব্য একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য; কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে জীবনের সংগঠন সহজসাধ্য নয়।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের দৃষ্টিতে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। ইসলামী ধ্যান-ধারণা জীবনের যে জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি পেশ করে তাতে পার্থিব জীবনের কোনো অংশ তুচ্ছ ও অবহেলিত হবে না এবং প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই বর্জন করা হবে না। এ ব্যাপারে সাহাবিদের জীবনকে আদর্শ মনে করতে হবে। সম্পূর্ণ জীবন সম্পর্কে এরূপ ধারণার অবস্থান লালন ও বাস্তবায়ন তাঁদেরকে সফল করেছিল ইহলোকের জীবনেও এবং পরলোকের জীবনেও। তাঁরা দুনিয়ার দাস হয়ে বাস করেননি। দুনিয়ার উপর তাঁরা আরোহণ করেছিলেন, দুনিয়া তাঁদের উপর আরোহণ করেনি।[৪]

ইমাম ফখরুদ্দীন আর রাযী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এখানে حيوة অর্থ মুশরিক ও কাফিরদের জীবন, কারণ মু'মিনের জীবন নেক আমলসম্বলিত বিধায় তা ক্রীড়া-কৌতুকতুল্য হতে পারে না।[৫]

সামাজিক তাৎপর্য

ইহকালীন জীবনে মুসলিম জাতির দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে - এ আয়াত থেকে তার স্পষ্ট দিগ্‌দর্শন পাওয়া যায়। এ জীবন পরকালীন জীবনের তুলনায় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। জীবনের স্বার্থের জন্য কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা সমাজ পরকালীন জীবনের কল্যাণকে পরিত্যাগ করতে পারে না।

কুরআনের প্রায় প্রতি সূরাতেই এ ধরনের আয়াত রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ হচ্ছে ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের বৈষয়িক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হতে হবে। যদি তা হয়, তাহলে একজন মুসলিম এ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহের জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করবে না এবং সে জন্য কোনো বাতিল পন্থা বা উপায় অবলম্বন করবে না। মুসলমানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেও এ নীতি অবলম্বিত হবে। এ নীতির প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার, সাম্য, ত্যাগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

কেননা, পরকালের প্রাধান্য ভিত্তিক দর্শন জুলুম, অত্যাচার, অবিচার ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে ব্যক্তিকে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং সমাজকে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থ-সামাজিক জীবনের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। বর্তমানে তা যে হচ্ছে না, তার কারণ সমাজে ইসলামী শিক্ষা সঠিকভাবে প্রসার লাভ করেনি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তার কোনো প্রতিফলন নেই। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনেও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হয়নি।

এ শিক্ষা এবং আদর্শ বাস্তবায়িত হলে সমাজ ও রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা কায়েম করবে, যাতে কোনোরূপ শোষণ ও জুলুমের মাধ্যমে কেউ ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহ করতে না পারে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় এরূপ কোনো পরিকল্পনা

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণ করা হবে না, যাতে সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক বিত্তশালী লোকের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী যোগানের সুযোগ বেশী হয়। কারণ এ আদর্শ ও শিক্ষা ভোগবাদের মূলোৎপাটন করে একটা সরল ও মধ্যপন্থী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজকে অনুপ্রাণিত করে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. তাফসীরে রূহুল মা'আনী, মাহমূদ আলূসী (র.)।

২. আল-মুফরাদাত, রাগের ইস্পহানী, পৃষ্ঠা ৪৫০-৪৫৪।

৩. তাফসীরে রূহুল মা'আনী, মাহমূদ আলূসী (র.), ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪।

৪. সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র), ফী-যিলালিল কুরআন, ২য় খণ্ড।

৫. তাফসীরে কবীর, ইমাম ফখরুদ্দীন আর রাযী (র), ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০-২০২।

www.nagorikpathagar.org

কতিপয় নিষিদ্ধ কাজ ঃ অর্থনৈতিক তাৎপর্য

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ *

বলুন! এসো, আমি তোমাদেরকে ঐ সব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে, নিজেদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দেই। নির্লজ্জতার কাছেও যেও না, প্রকাশ্য হোক কি অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না, অবশ্য সত্য ও ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা বুঝে কাজ কর। এতিমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না, কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত দায়িত্বের বোঝা দেই না। আর যখন কথা বল ইনসাফের সাথে কথা বল, যদিও সে আত্মীয় হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এ সব বিষয়েই আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

(সূরা আল আন'আম: আয়াত ১৫১-১৫২)

আয়াতদ্বয়ের সাধারণ তাৎপর্য

সূরা আন'আমের এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্ পাক নয়টি কাজকে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করেছেন এবং এসব কাজ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর নির্দেশ মত চলা ও এসব কাজ থেকে বিরত থাকা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। প্রথমত, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করাকে হারাম করা হয়েছে। শিরক অর্থ আল্লাহর বিশেষ গুণাবলী, আল্লাহর ক্ষমতা, এখতিয়ার ও অধিকারে অন্যকে অংশীদার করা। যেমন আল্লাহর বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি সবকিছু জানেন ও শোনেন। অন্য কারো সম্পর্কে এ ধারণা করা যে, তিনিও গায়েব জানেন বা সবকিছু শোনেন ও জানেন - এরূপ মনে করলে শিরক করা হবে। তেমনিভাবে কারো সম্পর্কে ধারণা করা যে, তিনিও অতি-প্রাকৃতিক উপায়ে কারো ভাগ্য রচনা বা নষ্ট করতে পারেন বা অতি-প্রাকৃতিক উপায়ে কারো উপকার বা অপকার করতে পারেন তা শিরক বলে গণ্য হবে। আল্লাহর জন্য যেমন আমরা রুকু, সিজদা করি বা যে বিনয়ের সঙ্গে তাঁর সামনে দাঁড়াই, অন্যের জন্য এমন করাও শিরক হবে।

তারপর পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের আদেশ করা হয়েছে অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হারাম। এ আয়াতে দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরবে ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে অনেক সময় জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে নিজ হাতে সন্তানদের হত্যা করা হত। আল্লাহ পাক এ জঘন্য প্রথা হারাম করে দিয়েছেন।

তারপর ফাওয়াহেশ বা নির্লজ্জ কাজ কারবার সবই নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যেই হোক কি গোপনেই হোক। কুরআন, হাদিসের পরিভাষায় 'ফাহেশা' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ যার অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী, যাবতীয় বড় গোনাহ এর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থ নেয়া হলে যাবতীয় বদ অভ্যাস, মুখ, হাত, পা ও অন্তরের যাবতীয় গুণাহই এর আওতায় এসে যায়। ফাহেশা কাজের নিকটে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাকা এবং ঐ সব পন্থা থেকে দূরে থাকা, যা দ্বারা ঐসব গুণাহের পথ খুলে যায়।

তারপর আল্লাহ পাক বৈধ কারণ ছাড়া অন্য সব হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন কেউ যদি অন্যকে হত্যা করে তাকে হত্যা করা যাবে। অবশ্য আইন মোতাবেক বিচার ফয়সালার মাধ্যমেই তা করতে হবে। বিনা কারণে মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, অমুসলিমকে হত্যা করাও তেমনি হারাম।

তারপর এতিমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এতিমদের অভিভাবকদের মূলত সম্বোধন করা হয়েছে, যেন তারা অবৈধভাবে এতিমদের মাল নষ্ট না করে। অর্থাৎ এতিমের মাল সংরক্ষণ করা এবং কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা অভিভাবকের কর্তব্য। অবশ্য বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের এ দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

তারপর সঠিক ওজন ও মাপ দিতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ ওজন ও মাপে ক্রুটি করা ও কম করা হারাম।

www.nagorikpathagar.org

তারপর কথা বলার সময় ইনসাফের সঙ্গে কথা বলতে আদেশ করা হয়েছে তা যদি আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও হয়। অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা হারাম গণ্য করা হয়েছে। সাক্ষ্য কিংবা ফয়সালায় কারও বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা এবং শত্রুতা ও বিরোধিতার কোনো প্রভাব থাকা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (স) মিথ্যা সাক্ষ্যকে শিরকের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১] রাসূলুল্লাহ (স) অসত্য ফয়সালাকারী বিচারককে জাহান্নামী বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

সর্বশেষ আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম। আল্লাহর অঙ্গীকার বলা হয়েছে যার অর্থ আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ও আল্লাহর নামে করা অঙ্গীকার। ঈমান আনার অর্থই হচ্ছে আল্লাহকে সব বিষয়ে মেনে চলার অঙ্গীকার। সৃষ্টির শুরুতেও আদমের সব সন্তানের রূহ আল্লাহকে মেনে চলার অঙ্গীকার করেছিল। এ সব অঙ্গীকারই রক্ষা করা ফরজ। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর দেয়া এসব বিধিনিষেধকেই সহজ সরল পথ বলা হয়েছে এবং তা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।[৩]

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ সব আয়াতে আল্লাহ পাক মানবতাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। শিরক না করার আদেশের মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, অর্থনীতি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তার শিক্ষা ও মূলনীতি আল্লাহ পাক থেকেই নিতে হবে। আয়াত দু'টিতে যে নয়টি বিষয়ের নির্দেশ রয়েছে তার প্রত্যেকটিরই আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, শিরক এড়িয়ে চলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে (বিশেষ করে ইকবাল, মওদূদী, আবুল হাশিম, সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মদ কুতুব প্রমুখ আধুনিক চিন্তানায়কের রচনায় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। পূর্বতন চিন্তানায়কদের মধ্যে শায়খ আহমদ সরহিন্দ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব সমধিক খ্যাত)। সমাজ ব্যবস্থা, রুচি প্রভৃতি সব ব্যাপারেই শিরকের প্রভাব এড়িয়ে চলা মুসলিম জীবনে অপরিহার্য।

এখানে পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। এখানে যে নীতি দেয়া হয়েছে এবং কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য বিধি-বিধানের আলোকে যে সব পিতা-মাতা তাদের নিজেদের ভরণপোষণ করতে সক্ষম নন, তাদের ভরণপোষণ সন্তানদের উপর ওয়াজিব। ইসলাম এমন এক সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় যেখানে পিতা-মাতারা বিপদাপন্ন হবেন না এবং যেখানে অক্ষম বৃদ্ধদের চাপ সরকারের উপর নিপতিত হবে না। সরকারের উপর অতিরিক্ত বোঝা কোনো সমাজের জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না। তাই সন্তানরা সক্ষম হলে ইসলাম অক্ষম পিতা-মাতার দায়িত্ব সন্তানদের উপর দিয়েছে। যদিও এসব বিষয়ে আমাদের ফিকহের গ্রন্থসমূহে অনেক আলোচনা রয়েছে। তথাপি কার্যকর করার সুবিধার্থে এ ব্যাপারে পার্লামেন্ট কর্তৃক বিস্তৃত আইন রচনা করা প্রয়োজন। যা সহজেই এমনকি প্রয়োজন হলে কোর্টসমূহও কার্যকর করতে পারবে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়ত, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে শুধু ভরণপোষণের দায়িত্ব সূচকই নয় অধিকন্তু আধুনিক social security system অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করার দ্যোতক। যাতে মায়া-মমতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-দয়া প্রভৃতি মানবিক গুণসহ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা থাকে।

তৃতীয়ত, একমাত্র আল্লাহই যে রিযিকদাতা - এ সত্যের উপলব্ধি মানুষের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন এবং তদানুসারে তাদের আচরণ তওহিদী যুক্তিভিত্তিক হওয়া উচিত। এটা শুধু পরিবার পরিকল্পনার প্রশ্নে নয় সর্ববিষয়ের আচরণেই হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় নীতি, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আচরণ সবই এভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

হত্যা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক নির্দেশের সঙ্গেই বিচার ও কুরআন নির্দেশিত শাসন ব্যবস্থার প্রশ্ন আছে। এ বিষয়ে ইজতিহাদ প্রয়োজন।

দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা এ আয়াতে সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে, তা যেভাবেই হোক। কাজেই জনশক্তি পরিকল্পনায় যে কোনো ধরনের গর্ভপাত বা ভ্রূণ হত্যার স্থান থাকতে পারে না।

এখানে নির্লজ্জতা হারাম করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির উৎপাদন ব্যবস্থায় এর বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। অশ্লীল দ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রি, আমদানি, রপ্তানি সবই ইসলামী রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে এসব উৎপাদন করা যাবে না। এসব উৎপাদনে ব্যাংকসমূহও বিনিয়োগ করতে পারে না।

এতিমদের ধন সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্র বিশেষ খেয়াল রাখবে। তা সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজনে আইন রচনা করবে। এতিম ও অন্য বঞ্চিতজনের সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর যে শিক্ষা রয়েছে তাতে প্রমাণ হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র সর্বাবস্থায় অক্ষম, দরিদ্র ও বঞ্চিতদের ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখবে। এটি ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এখানে সঠিক মাপ ও পরিমাণ দেয়া ফরজ করা হয়েছে। সঠিক মাপ ও পরিমাণের উপর অর্থনীতির অগ্রগতি নির্ভর করে। সঠিক মাপ ও পরিমাণ না থাকলে পরবর্তীতে কোনো আস্থা থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্র তা পুরোপুরি রক্ষা করার চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে যারা ইসলামী আইনকে ভঙ্গ করবে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি রক্ষার জন্য তা অপরিহার্য। যদি শ্রমিক-কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দেয়, তাও মাপে কম দেয়ার আওতায় আসে। শ্রমিক-কর্মচারীদের এ বিষয়ে ইসলামী সমাজে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে। তেমনি শ্রমিক-কর্মচারীকে উপযুক্ত বেতন না দেয়াও এর আওতায় আসে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় অবশ্যই শ্রমিক-কর্মচারীকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে। অবশ্য সাধ্যের বাইরে নয়। কেননা আল্লাহ কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত করতে বাধ্য করেন না।

www.nagorikpathagar.org

১৫২ নং আয়াতের 'আমি কাউকে সাধ্যাতিরিক্ত দায়িত্ব দেই না' বাক্যাংশের ব্যাপক অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে কর আরোপ, কাজের সময় নির্ধারণ, পারিশ্রমিক নির্ধারণ ও অন্য সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামর্থ্যের দিকে খেয়াল রেখে করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন, পার্লামেন্ট, বিচার বিভাগ সবাইকে এ মূলনীতি সামনে রাখতে হবে। তেমনি সুবিচার করা এবং আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করাও অর্থনৈতিক তাৎপর্যবহ। সুবিচার করা অর্থনীতিতে আস্থা ও শৃঙ্খলা নিয়ে আসে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার মধ্যে গোটা ইসলামী শিক্ষা মেনে চলাই অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ অবশ্যই অর্থনীতিতে সততা, বিশ্বস্ততা, উদ্যোগ, ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতা আনবে। তবে তা কেবল কথায় হবে না, আইনের মাধ্যমে সব ইসলামী শিক্ষাকে কার্যকর করতে হবে।

আল্লাহর অঙ্গীকার বা আল্লাহর সঙ্গে মানুষের কৃত অঙ্গীকার অত্যন্ত বড় দায়িত্ব দ্যোতক। 'খলিফাতুল্লাহ' হিসেবেও এরূপ মানুষের এ বড় দায়িত্ববোধটা তার ছোট ছোট প্রয়োজনের বা কল্পিত প্রয়োজনের চাপে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। কুরআনের শিক্ষা অবলম্বন করে মানুষের এ ভুলটা ভাঙতে পারে।

আলোচ্য আয়াত দু'টিতে যেসব মূলনীতি দেয়া হয়েছে তার যেমন রয়েছে নৈতিক, সামাজিক ও ব্যাপক সাধারণ তাৎপর্য, তেমনি রয়েছে ব্যাপক অর্থনৈতিক তাৎপর্য। এ সব মূলনীতি অনুসরণ অর্থনীতিকে উন্নত ও দক্ষ রাখতে বাধ্য। এভাবেই এ আয়াত দু'টি মানুষের সঠিক পথ-নির্দেশের জন্য। এ থেকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোত্রগত, জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ও সর্বাধিক দায়িত্ব বিষয়ে হেদায়াত পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আবু দাউদ ও ইবন মাজা।

২. আবু দাউদ।

৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন।

৪. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন।

www.nagorikpathagar.org

অপব্যয় সম্পর্কে

يٰبَنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ
هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ * قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى
اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ *

হে বনী আদম! প্রত্যেক এবাদতের সময় ও ক্ষেত্রে তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। খাও এবং পান কর কিন্তু অপব্যয় করো না। আল্লাহ্ অপব্যয়ীকে পছন্দ করেন না। বল, আল্লাহ্ তাঁর স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব সুন্দর বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে? বল, পার্থিব জীবনেও এসব জিনিস ঈমানদারদের জন্য, আর কিয়ামতের দিনে এগুলোতো একান্তভাবে তাদের জন্য হবে। এরূপে যারা বুঝে সে লোকদের জন্য আমার নিদর্শনগুলো আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি। বল, আমার প্রতিপালক যে সকল বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন তা হল প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করা যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। (সূরা আল আ'রাফ: আয়াত ৩১-৩৩)

শাব্দিক ব্যাখ্যা

যিনাত زينة শব্দের অর্থ সৌন্দর্য, পোশাক, অলঙ্কার। মুফাসসিরদের মতে, এ আয়াতসমূহে 'যিনাত' طيب অর্থ পোশাক-পরিচ্ছদ। তাইয়্যেব শব্দের অর্থ পাক-পবিত্র, উৎকৃষ্ট, কল্যাণকর, যা ক্ষতিকর নয়। 'ইসরাফ' اسرف শব্দের অর্থ অপব্যয়, অমিতাচার, সীমালংঘন, বাস্তবিকই যার প্রয়োজন নেই।

www.nagorikpathagar.org

মুফাসসিরদের মতে, ৩১ নং আয়াতে উল্লেখিত 'ইসরাফ' শব্দের অর্থ হারাম খাওয়া, অমিতাচার (অপব্যয়) করা ও সীমালংঘন করা।

আয়াত নাযিলের প্রেক্ষিত

তদানীন্তন জাহিলী যুগে আরবের পুরুষেরা দিনে ও নারীরা রাতের বেলায় উলঙ্গ হয়ে কাবা ঘরের তাওয়াফ করতো। তারা বলতো, যে পোশাকে আমরা গুনাহ করেছি সে পোশাকে আমরা তাওয়াফ করবো না। আবার কেউ কেউ বলতো - এ কাজ আমরা শুভ বিবেচনা করে থাকি অর্থাৎ যেমন আমরা কাপড়শূন্য তেমনি আমরা পাপশূন্য হয়ে যাবো। হজ্জের সময় তারা হজ্জের সম্মানার্থে শুধু প্রাণে বাঁচার জন্য সামান্য আহার করতো, চর্বি আদৌ খেতো না। এসব দেখে মুসলমানরা বলল - ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমরা মুসলমান, আমরাই তো এ ধরনের পদ্ধতি পালনের বেশি হকদার। এ প্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

তাফসীরকারদের মতামত

ক. كلوا واشربوا ولا تسرفوا আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর। তোমার উপর দোষারোপ নেই; কিন্তু দু'টি অভ্যাস বড় খারাপ। এক. অমিতাচার বা সীমালংঘন, দুই. অহংকার বা অহমিকা।

আবদুর রহামন ইবন যায়েদ বলেন: ولا تسرفوا শব্দের অর্থ তোমরা খাও কিন্তু হারাম খেয়ো না। কেননা এটা বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন।[২]

খ. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র) লিখেছেন, এখানে 'যিনাত' শব্দের অর্থ কাপড় পরিধান করা বোঝানো হয়েছে خذوا زينتكم عند كل مسجد' আয়াতের দাবি হচ্ছে প্রতিটি নামাজে পুরিপূর্ণ লেবাস পরিধান করা ওয়াজিব। কেননা পরিপূর্ণ লেবাসকেই 'যিনাত' বলা হয়। كلوا واشربوا ولا تسرفوا আয়াত পরিভাষাগত দিক দিয়ে মুতলাক অর্থাৎ সব সময় ও সব অবস্থাকেই বোঝায় এবং সব রকম খাদ্য-খাবার ও পানীয় বস্তুকেই অন্তর্ভুক্ত করে যতক্ষণ না এর ব্যতিক্রমে কোনো স্বতন্ত্র দলিল পাওয়া যায়। 'যিনাত' শব্দটি সব রকমের সাজ-সজ্জাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব সবদিক দিয়ে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বিধান করা, যানবাহন ব্যবহার এবং নানাবিধ অলংকার ব্যবহারও এর অন্তর্ভুক্ত।[৩]

গ. আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী তাফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন, এখানে 'যিনাত' অর্থ পোশাক-পরিচ্ছদ। তাফসীরকারদের ঐক্যমতে তাই বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ, কালবী ও ইবন আব্বাসেরও তাই মত।

'মসজিদ' অর্থ এখানে সিজদার স্থান বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটির অর্থ করা হয়েছে, তোমরা প্রত্যেক মসজিদেই কাপড় পরিধান কর তা তাওয়াফের জন্যই হোক বা নামাজের জন্য। গোটা নামাজকেই বোঝানো হয়েছে ...।

www.nagorikpathagar.org

এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, পানাহার ও আচ্ছাদনের পর্যায়ে অনুসৃত নীতি (উসূল) হচ্ছে সব বস্তুই হালাল, যে পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত না হয়।

ঘ. ফি-যিলালিল কুরআন প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) লিখেছেন, আয়াতটির তাৎপর্য কেবল সালাতের সময় বেশভূষা এবং পবিত্র বস্তু পানাহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ঐসব যিনাতের সামগ্রী যা বান্দার জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তা হারাম করাকে নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহর দেয়া পোশাক ও পবিত্র খাবার কেউ স্বাধীন ইচ্ছামত হারাম করে নিক - এটা নিন্দনীয় ব্যাপার। কেননা আল্লাহর দেয়া শরিয়ত ব্যতীত কারো এ ব্যাপারে কোনো অধিকার নেই।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

ইসলামী অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত বেশকিছু নীতি ও শিক্ষা এ আয়াত ক'টিতে বলা হয়েছে। ৩১ নং আয়াতে ইসলামে ভোগ (Consumption)-এর নীতি ও সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, খাওয়া ও পানকে কেবল হালালই করা হয়নি বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ইসলামে বৈরাগ্যবাদ বা জীবন বিমুখতার কোনো স্থান নেই। এ নীতির ফলে ইসলামী সমাজে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আল্লাহর নির্দেশাবলীর সীমার মধ্য থেকে আনন্দময় ভোগ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অবশ্য ভোগ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসরাফকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'ইসরাফ' বলতে মুফাসসিরগণ বুঝিয়েছেন 'হারাম খাওয়া' ও 'অতিরিক্ত পানাহার করা'। 'ইসরাফ' না করার নীতির ব্যাপক ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ের তাৎপর্য রয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটি একটি নৈতিক নীতি হিসেবে কাজ করবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের পর্যায়ে ঠিক করবে যে, তার কি ভোগ-ব্যবহার করা উচিৎ এবং কি করা উচিত নয়। অবশ্য এ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নীতিও আইনের সীমার মধ্যেই সে প্রয়োগ করতে পারবে। এ কথাও সত্য যে, ব্যক্তি পর্যায়ে ইসরাফ স্থান, কাল, পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল হবে। এ জন্যই এর কোনো সর্বকালীন সীমা কোনো আইনে বা বিধিতে ঠিক করে দেয়া সম্ভব হবে না।

সামাজিক পর্যায়ে 'ইসরাফ' সংক্রান্ত নীতি আরো ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবে। সরকারের পরিকল্পনা, আদমানি-রপ্তানি, উৎপাদন, বণ্টননীতি এমনভাবে তৈরি হতে হবে, যাতে সে সময়ের প্রেক্ষিতে সে দেশে 'ইসরাফ' উৎসাহিত না হয় এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ইসরাফ করার সুযোগ কমে যায়। সরকার নিজেও 'ইসরাফ' পরিহার করবেন। ইসলামী নীতিতে তা-ই আদর্শ ও কাম্য। এ আয়াতে এ কথাও স্পষ্ট যে, Consumerism ইসলামের নীতি নয়। সম্পদ থাকলেও নয়। কেননা তাতে মানুষ বস্তুবাদী ও ভোগবাদী হয়ে যায় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যাবার বেশী আশঙ্কা থাকে। এ ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতিতে মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে হবে। সরকারি পর্যায়ে 'ইসরাফ' বর্জনের নীতিতে একদিকে তথাকথিত Prestige

www.nagorikpathagar.org

প্রকল্পের পরিবর্তে এমন সব প্রকল্প হাতে নিতে হবে যাতে দরিদ্র ও অপেক্ষাকৃত ভাগ্যাহত লোকদের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হয়, অপরদিকে জনসাধারণের উপর আরোপিত কল্যাণহীন করের বোঝা অপেক্ষাকৃত হালকা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যারা অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ করতে অক্ষম এবং নগ্ন কিংবা অর্ধনগ্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করতে (বা নামাজ পড়তে) বাধ্য হচ্ছে কিংবা অনাহার, অর্ধাহার, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবে জীবন যাপন করছে, তাদের সমস্যা সমাধানেও সমাজ তথা রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামী সমাজে যতদিন পর্যন্ত একজন লোকও এ জাতীয় সমস্যার আবর্তে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কোনো মুসলমানের পক্ষে তার নিজের ও পরিবারবর্গের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত কোনো খরচ 'ইসরাফ' বলে গণ্য হতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন মান উন্নত হবে, এটাই কাম্য।

'আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর স্বীয় নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন।' ৩২নং আয়াতে 'পবিত্র' কথাটির উল্লেখ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী অর্থনীতিতে অপবিত্র, মানুষের স্বাস্থ্য ও মানসিকতার জন্য ক্ষতিকর কোনো বস্তুর স্থান নেই। এ শব্দটি সেদিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ নীতিও কার্যকর করতে হবে। এ আয়াত ও পরবর্তী ৩৩ নং আয়াত প্রমাণ করে যে, মূলত কোনো জিনিসকে হারাম করার অধিকার কেবল আল্লাহর। রাসূল (স) যা কিছু হারাম করেন তাও আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা বলেই। যেমন সূরা আ'রাফেই ১৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে - উম্মী নবী তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে। তবে রাসূল কর্তৃক খুব কম দ্রব্যই হারাম করা হয়েছে। এছাড়া বাকী সবই হালাল। এ নীতি মানুষ ও অর্থনীতির জন্য খুবই কল্যাণকর হয়েছে। বস্তুত মানব জীবন ও সমাজের জন্য অকল্যাণকর দ্রব্যাদি এবং কার্যাবলী হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বিরাট ইহসান করেছেন। অন্যদিকে নির্দিষ্ট কতিপয় হারাম ছাড়া বাকী সবই হালালের পর্যায়ে রেখেও আল্লাহ আমাদের অর্থনৈতিক জীবন তথা উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন নির্বাচনের এক বিশাল ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নে অতীব সহায়ক।

গ্রন্থপঞ্জী

১. তাফসীরে কবীর, সূরা আ'রাফের ৩১-৩৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২. তাফসীর ইবন কাসীর, সূরা আ'রাফের ৩১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩. তাফসীরে কবীর, সূরা আ'রাফের ৩১ নং আয়াতের তাফসীর।

৪. তাফসীরে মাযহারী।

www.nagorikpathagar.org

সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষার সামগ্রী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ *
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ *

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। নিজেদের আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। আর জেনে রাখ তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী। আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহাপুরস্কার। (সূরা আনফাল: আয়াত ২৭ ও ২৮)

আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

২৭ নং আয়াতে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদত - উভয়ই উল্লিখিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্বে এ বিষয়ে চেতনা এত কম যে, তা শূন্যের কোঠায়; তাই আয়াতটির প্রাসঙ্গিকতা সুস্পষ্ট। হকুক সমন্ধে অজ্ঞতা ও অনীহা উভয়ই এ জন্য দায়ী। তবে এ আয়াতে জ্ঞাতসারে অনীহার কথা উল্লিখিত হয়েছে। স্পষ্টতই এটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। ২৮ নং আয়াতে ২৭ নং আয়াতের বক্তব্যের জের টেনেই বলা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ লাভ ও সন্তান-সন্ততির কল্যাণ কামনাহেতু লোকে হকুক ভুলে যায়। এতে করে তারা আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই ভুল করে বসে। পার্থিব জীবনে যা লাভ বলে মনে হয় তা প্রকৃত লাভ নাও হতে পারে। প্রকৃত পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছেই, আর তার গুণগত মান অতি উচ্চ, পরিমাণও বিপুল।

এই যে আল্লাহর কালামে উল্লিখিত সত্য, ঈমানদার ব্যক্তির উত্তম আচরণ নিশ্চিতকরণের জন্য এটা যথেষ্ট হবার কথা। মু'মিনদের আর্থ-সামাজিক জীবন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য এটাই পথ-নির্দেশ। এখানেই আয়াত দু'টির বিশেষ গুরুত্ব।

তাফসীরকারদের আলোচনা

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেনঃ 'নিজেদের আমানত বলতে সেই সব দায়িত্ব বোঝানো হয়েছে, যা সবার প্রতি আস্থা স্থাপন করে তার উপর ন্যস্ত করা

www.nagorikpathagar.org

হয়। তা ওয়াদা পূরণের দায়িত্ব হতে পারে। কিংবা কোনো সংস্থার অভ্যন্তরীণ গোপন তথ্য হতে পারে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদ হতে পারে। কারো প্রতি ভরসা করে জনসমাজ যদি তাকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে তবে তাও এর মধ্যে শামিল বলে মনে করতে হবে। মানুষের ঈমানের প্রতি নিষ্ঠা ও সততায় সাধারণত যে জিনিস দোষ-ক্রটির উদ্ভব করে আর যে কারণে প্রায়ই মানুষ মুনাফিকী, বিশ্বাসঘাতকতা ও খিয়ানতে লিপ্ত হয় তা হলো অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সন্তান-সন্ততির স্বার্থের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ ও উৎসাহ। এ কারণে এখানে বলা হয়েছে যে, এ ধন-সম্পদ যার ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে তোমরা সাধারণত সত্য ও সততার পথ হতে গোমরাহ হয়ে যাও, তা আসলে এ দুনিয়ার পরীক্ষাগারে তোমাদের পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। তোমরা যাকে পুত্র বা কন্যা বলো তা আসলে পরীক্ষার একটি কাগজ মাত্র। আর যাকে তোমরা জমি-জায়গা ও ব্যবসার সম্পত্তি মনে কর, তা আসল পরীক্ষার আরেকটি কাগজবিশেষ। এসব জিনিস তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, এ সবের দ্বারা তোমাদেরকে যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে।[১]

মুফতী মুহাম্মদ শফী লিখেছেনঃ ২৭ নং আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার হকসমূহ কিংবা পারস্পরিকভাবে বান্দার হকসমূহের খেয়ানত করো না। হক আদায়ই করবে না কিংবা আদায় করলেও কোনো রকমে শৈথিল্যের সাথে আদায় করবে - এমন যেন না হয়। আয়াতের শেষভাগে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তো খেয়ানতের অপকারিতা ও বিপদ সম্পর্কে জানোই। তারপরেও সেদিকে পদক্ষেপ না নেয়া মোটেও বুদ্ধিমত্তার কথা নয়। আর যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফলতি ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণ মানুষের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে; এ কথা জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা।

'ফিতনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়, আযাবও হয়। এছাড়া এমন সব বিষয়কেও 'ফিতনা' বলা হয় যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কুরআন মজিদের বিভিন্ন জায়গায় এ তিন অর্থেই ফিতনা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুত এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে।[২]

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ দু'টি আয়াতে ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে খেয়ানত না করার তাৎপর্য হচ্ছে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষা মানতে বাধ্য। কোনো অবস্থাতেই আমরা তা ভঙ্গ করতে পারি না বা পাশ কাটিয়ে যেতে পারি না। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম দেশের পার্লামেন্টকে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

২৭ নং আয়াতে আমানতে পারস্পরিক বিশ্বাস ভঙ্গ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমানতের ব্যাপক অর্থ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আমানতের এ গুরুত্ব ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক বিষয়। অর্থনীতির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা বিশ্বাস বা আমানতদারীর উপর নির্ভর করে। অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলা হয় credit worthiness, এটা আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ভিত্তি। ইসলাম সমাজ ও অর্থনীতিতে এরই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যদি অর্থনীতিতে আমানতদারী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋণ দান, ঋণ গ্রহণ, বিনিয়োগ সবই নিরাপদ ও সহজ হয়ে যাবে। সে অবস্থায় উৎপাদন ও সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্রকে শিক্ষা, তথ্য-মাধ্যম ও সামাজিক পত্রিকায় প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে আমানতদারী সৃষ্টি করতে হবে। তবেই তার ফল পাওয়া যাবে।

২৮নং আয়াতে লোভ-লালসা ও স্বজনের অতিরিক্ত প্রীতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। ধন-সম্পদ পরীক্ষার সামগ্রী। এর তাৎপর্য এই যে, ধন-সম্পদকে সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য ব্যবহার করতে হবে। ধন-সম্পদকে অবৈধভাবে ও অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা যাবেনা। ধন-সম্পদ অপব্যয় ও নষ্ট করা যাবেনা। মানব কল্যাণেই তার প্রয়োগ হতে হবে। এখানে ভোগ্য ব্যবহারের (consumption) কি নীতি হবে, তারও ইঙ্গিত রয়েছে। এ নীতিকে ভিত্তি করে পরিকল্পনা কমিশনও জাতির জন্য ভোগ্য ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ করতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনফালের ২২ ও ২৩ নং টীকা।

২. মা'আরেফুল কুরআন, সূরা আনফালের ২৭-২৮ আয়াতের তাফসীর।

www.nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা প্রসঙ্গে

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ نِ
اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ *

বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, সন্তান, ভ্রাতা, পত্নী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য যার মাঝে মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত। আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধচারীদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

(সূরা আত-তাওবা: আয়াত ২৪)

প্রেক্ষিত

২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, জন-সম্পদ ও অর্থ-সম্পদ যদি আল্লাহর ভালোবাসা, রাসূলের ভালোবাসা ও আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তবে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

আয়াতের সাধারণ তাৎপর্য

আয়াতে মু'মিনের জীবনে আল্লাহর পথে জিহাদের গুরুত্বের আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক মু'মিনের নিকট অবশ্যই আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ সব ধরনের রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা, ধন-সম্পদ, দেশ, বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা প্রাধান্য পেতে হবে। আত্মীয়তা ও ধন-সম্পদ কখনো

www.nagorikpathagar.org

মু'মিনের নিকট আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের উপর প্রাধান্য পেতে পারে না। যদি কখনো আত্মীয়তা, ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা হলে আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদকেই গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর পথে জিহাদ বলতে বোঝায় নিজেকে ইসলামের উপর কায়েম রেখে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে ব্যস্ত রাখা ও জুলুম, নিপীড়নের উৎখাত এবং মজলুমদের সাহায্য করার জন্য সংগ্রাম করা। আল্লাহ কুরআনের বহু আয়াতে ও আল্লাহর রাসূল তাঁর হাদিসে এসবের জন্য জিহাদ করার তাকিদ দিয়েছেন।

তাফসীরকারদের আলোচনা

এ আয়াতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিখ্যাত তাফসীরকার সাইয়েদ কুতুব লিখেছেন, এটা কখনো জীবনের উদ্দেশ্য নয় যে, একজন মুসলিম পরিবার-পরিজন, আত্মীয়তার সম্পর্ক, ধন-সম্পদ, পার্থিব ভোগ বর্জন করবে এবং জীবনে বৈরাগ্য অবলম্বন করবে আর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা প্রাধান্য পাবে। যখন তা সম্পন্ন হবে তখন তার জন্য জীবনের সর্ববিধ পবিত্র বস্তু থেকে উপকৃত ও লাভবান হওয়াতে কোনো দোষ নেই। মূল প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কি তোমার ঈমানী আকিদা দ্বারা পরিচালিত হবে, না দুনিয়ার ভোগ ব্যবহার তোমাকে পরিচালিত করবে? যখন মুসলমান এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, তার আকিদা ও ধ্যান-ধারণা পরিশোধিত হয়ে গেছে তখন তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র থেকে লাভবান হওয়া দোষণীয় নয়। অনুরূপভাবে দোষণীয় নয় ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহাদি থেকে লাভবান হওয়া যদি এ সবের ভোগ ব্যবহারে ইনসাফ থাকে ও অহংকার না থাকে। বরং এসব থেকে উপকৃত হওয়া সম্পূর্ণ বৈধ ও মুস্তাহাব। কারণ এ নিয়ামত পাওয়ার পর তা শোকরগুজারীর রূপ নেয়। এভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় রক্ত ও বংশের সম্পর্ক, ছিন্ন হয়ে যায় অধিকার সম্পর্ক। অতএব আল্লাহর জন্যই প্রাথমিক নৈকট্য আর এর উপরই রচিত হয় মানবীয় সকল সম্পর্ক।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ আয়াত থেকে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড পাওয়া যায়। ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ, সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নিশ্চয়ই গুরুত্ব রয়েছে, যা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ও হাদিসে বর্ণিত আছে। কিন্তু এসব কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ও রাসূল অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যাবে না। অন্য কথায়, অর্থ-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই আল্লাহ ও রাসূলের নির্ধারিত আইন, বিধান, সীমা ও নির্দেশনার অধীনে হবে। সম্পদের ভোগ-ব্যবহার উন্নয়ন, বিনিময়, ব্যয় সবকিছুই আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষার অধীন হবে।

আমাদের অর্থনীতিবিদ, আমাদের পরিকল্পনা কমিশন ও সরকারকে তাঁদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি ও কার্যকর করার সময় এই নীতিটি মনে রাখতে

www.nagorikpathagar.org

হবে। এটা করা তাদের উপর ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক। তা না করা হলে এ আয়াতে যেমন বলা হয়েছে তারা আল্লাহ তা'আলার আযাবের উপযুক্ত গণ্য হবে।

এ আয়াতে অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে জিহাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থ কিভাবে সমন্বিত হবে। অথবা জিহাদের সময় অর্থনীতিকে কিভাবে বিন্যাস করা হবে। এখানে অবশ্য শরিয়ত সমর্থিত জিহাদের কথা বলা হচ্ছে, অবৈধ যুদ্ধের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এ আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, জিহাদের প্রয়োজনে প্রত্যেক মু'মিনকে তার ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বা সম্পদের ক্ষতি কোনো মু'মিনকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় না। নীতিগতভাবে রাষ্ট্র ও গোটা মুসলিম সমাজের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য। আয়াতে গোটা মু'মিন সমাজকেই সম্বোধন করা হয়েছে, এ কথাও লক্ষ্যণীয়। জিহাদের প্রয়োজনে অথবা জিহাদ করা যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তখন ইসলামী রাষ্ট্রকে তার জিহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য সব অর্থনৈতিক ক্ষতি সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আরো বলা যায় যে, জিহাদের সময়ে জিহাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে সফলভাবে জিহাদ পরিচালনা করা যায়। কাজেই সূরা তাওবার এ আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে - এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফি যিলালিল কুরআন, মিসর।

২. প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

খিলাফতের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ *

অতঃপর আমরা তাদের পর পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কি প্রকার আচরণ কর তা দেখার জন্য।

(সূরা ইউনূস: আয়াত ১৪)

'খলিফা' শব্দের ব্যাখ্যা

এ আয়াতে 'খালায়েফ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর একবচন হচ্ছে 'খলিফা'। এটি কুরআন মজিদে ব্যবহৃত একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। 'খলিফা' শব্দের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেনঃ 'খলিফা' তাকে বলা হয়, যে অন্য কারো মালিকানায় তারই প্রদত্ত ক্ষমতা, এখতিয়ার ব্যবহার করে। খলিফা কখনো মালিক হতে পারে না। প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা, কামনা অনুসরণ করা তার কর্তব্য হয়।

এমতাবস্থায়, সে যদি নিজে মালিক হওয়ার দাবী করে বসে এবং মালিক প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ খামখেয়ালীভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে কিংবা প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক মনে করে তারই ইচ্ছা বাসনা অনুসরণ এবং তারই আদর্শ পালন করতে শুরু করে, তবে তা হবে বিশ্বাসঘাতকতামূলক পদক্ষেপ।

তাফসীরকারদের মতামত

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী লিখেছেন, 'পূর্ববর্তী জাতি সম্প্রদায়ের ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি এবং পৃথিবীর খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করেছি। কিন্তু তাই বলে এ কথা মনে করো না যে, পৃথিবীতে খিলাফতী কেবল ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। বরং এই মর্যাদা ও সম্মান দানের আসল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পরীক্ষা নেয়া, তোমরা কি বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থা সংশোধন কর, না

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্র ও ধন-দৌলতের নেশায় উম্মত্ত হয়ে পড়। এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো অহঙ্কারের বিষয় নয় বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়-দায়িত্ব। (মা'আরেফুল কুরআন, সূরা ইউনুসের ১৪নং আয়াতের তাফসীর।)

আয়াতের সাধারণ অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সূরা ইউনূসের ১১-১৩ নং আয়াতে আল্লাহকে অমান্যকারীদের পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ১৪নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তীদের পরিবর্তে নতুন লোকদের পৃথিবীতে দায়িত্ব দিয়েছেন, যাতে তিনি তাদের আচরণ লক্ষ্য করতে পারেন।

এ আয়াতে মানুষের আচরণের (behaviour) গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের আচরণের ভাল-মন্দের জন্যই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে এক জাতির পর অন্য জাতির উত্থান করেন, অর্থাৎ মানুষের আচরণ ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের বড় কারণ। কুরআনের অন্যান্য আয়াতে মানুষের ঈমান বা সঠিক বিশ্বাসকেও জাতির কল্যাণ অকল্যাণের কারণ বলা হয়েছে। সূরা আসরে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেনঃ

> সময়ের সাক্ষ্য। মানুষ সবসময় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, ভাল কাজ করেছে, একে-অপরকে সত্যের পথে এবং ধৈর্য্য ধারণের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে।

খিলাফতের অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রথম বলা হচ্ছে যে, মানুষ রাব্বুল আলামীন আল্লাহর খলিফা। রাব্বুল আলামীন-এর অন্যতম অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সব জীবের প্রতিপালক। তাই রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে প্রত্যেক মানুষকে অন্য সব মানুষ ও জীবের জীবিকা ও প্রয়োজন পূরণের দ্বায়িত্ব পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের উল্লেখ করা যায়।

> পৃথিবীর সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর।
>
> (সূরা হুদ: আয়াত ৬)

> আমার ইচ্ছা যে, দুনিয়াতে যারা বিস্তৃত তাদের উপর মেহেরবানী করব এবং তাদেরকে দুনিয়াতে ইমাম বানাব, দুনিয়াতে তাদেরকে আমার উত্তরাধিকারী করব এবং পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতা দান করব।
>
> (সূরা কাসাস: আয়াত ৫)

আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে আমার রিযিক পাওয়ার সুযোগ করে দেয়া বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব বিশেষ করে মুসলিম সরকারের আরো বেশি। কেননা তারা গোটা জাতির পক্ষ থেকেও দায়িত্বপ্রাপ্ত। তেমনিভাবে নির্যাতিত জনগণের নির্যাতন দূর করাও খলিফা হিসেবে সবার এবং বিশেষ করে সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, খিলাফতের নীতিই প্রধান গুরুত্বের দাবীদার। তাতে কোনো পরিবর্তন হবে না। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বা জনগণের মতামতের ভিত্তিতে কাজ করতে গেলে অবস্থাবিশেষে পরিবর্তন করা যেতে পারে, যদি তাতে শরিয়তের কোনো প্রমাণিত নীতির লংঘন না হয়। এ আয়াতে যে খিলাফতের কথা বলা হয়েছে তাতে অর্থনৈতিক খিলাফতের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক খিলাফতের নীতিও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। খিলাফতের অর্থনৈতিক নীতি হচ্ছে দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জনগণের সম্মতিতে গ্রহণ করতে হবে। জাতির অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত হতে জনগণকে বাদ দেয়া যাবে না। এ যুগে তা করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। স্বাধীন পত্র-পত্রিকাও এ ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এ আয়াতের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। আল্লাহ্ পাক মানুষের আচরণ লক্ষ্য করেন। এ আচরণের মধ্যে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক আচরণও অন্তর্ভুক্ত। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের জন্য সে আল্লাহর নিকট দায়ী। মানুষকে তার অর্থনৈতিক আচরণের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। মুসলিম সরকার ও মুসলিম শাসকগণ সম্পর্কেও একই কথা। তাই মানুষ যদি আল্লাহর অনুগত হয়, তাহলে সে অবশ্যই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুসরণ করবে। কোনো অর্থনৈতিক জুলুম করবে না বরং অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের জন্য জবাবদিহি (accountability) ইসলামের বৈশিষ্ট্য, যা এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

নূহ (আ)-এর যুগের সামাজিক তাৎপর্য

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ج وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ * قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ط اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ * وَيٰقَوْمِ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ط اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ * وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ * وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَا اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ اَنْفُسِهِمْ صلے اِنِّيْ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ *

তখন তার কওমের কাফিরপ্রধানরা বললঃ আমরা তো তোমাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না, আর আমাদের মধ্যে যারা হীন ও নীচ তারা ব্যতীত কাউকে তো তোমার আনুগত্য করতে দেখিনা, এবং আমাদের উপর তোমাদের কোনো প্রাধান্য দেখি না, বরং তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি। নূহ বললেনঃ হে আমার জাতি! দেখ তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট দলিলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন তারপরও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে আমি কি তা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি? আর হে আমার জাতি! আমি তো এ জন্য তোমাদের কাছে কোনো অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে। ঈমানদারদের তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়, তারা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। বরং আমি দেখছি তোমরা এক

www.nagorikpathagar.org

অজ্ঞ সম্প্রদায়। আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ্ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না? আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে এবং এ কথাও বলি না যে, আমি গায়েবী খবরও জানি। এ কথা বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা, আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত, আল্লাহ্ তাদের কোনো কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব।

(সূরা হূদ: আয়াত ২৭-২৯)

সাধারণ তাৎপর্য

উপরের কয়েকটি আয়াতে হযরত নূহ (আ)-এর জাতি তার নবুওতের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছিল এবং হযরত নূহ (আ) তার যে সব জওয়াব দিয়েছিলেন, তা আলোচনা করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ)-এর জাতির কথা ছিল যে, হযরত নূহ (আ) একজন মানুষ ব্যতীত কিছু নন এবং তাঁকে অনুসরণ করে কেবল হীন, নীচ এবং স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা। সুতরাং নূহ (আ)-এর নবুওত গ্রহণযোগ্য নয়। এর জওয়াবে হযরত নূহ (আ) বলেন যে, তিনি আল্লাহ্র থেকে পাওয়া সুস্পষ্ট দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনি প্রকৃত সত্য ওহির মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছেন। তাই তাদের উচিত তাকে মেনে নেয়া। তিনি কেবল তাদের সত্য গ্রহণ কামনা করেন, তাদের নিকট থেকে কোনো ধন-সম্পদ কামনা করেন না। তিনি অবশ্যই ফেরেশতা নন এবং আল্লাহর ভাণ্ডার তাঁর কাছে রয়েছে - এমন দাবীও তিনি করছেন না। এসব নবী হওয়ার জন্য প্রযোজ্যও নয়। তিনি সাধারণ লোকদেরকে তাঁর নিকট থেকে দূরে সরাতে পারেন না। সাধারণ লোকেরা কোনো অপরাধ করেনি। সত্য গ্রহণ করা কোনো অপরাধ হতে পারে না। তাদের সঙ্গে তিনি খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না। তা করলে তিনি আল্লাহ্ পাকের নিকট কোনো জওয়াব দিতে পারবেন না।

এসব আয়াতে প্রমাণ হয় যে, নবীরা আল্লাহ্ থেকে ওহি পাওয়ার পূর্বেই বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য করে তওহিদের মূল নিগূঢ় তত্ত্বের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভে সমর্থ হন। পরে আল্লাহ্ পাক ওহী দানে তাদেরকে ধন্য করেন। এসব আয়াতে আরো প্রমাণ হয় যে, সাধারণ লোকদের যেহেতু কোনো কায়েমী স্বার্থ থাকে না তাই তারা সহজেই সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করতে পারেন। কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং তাদের নেতৃবৃন্দ সহজে কখনো সত্যকে মেনে নিতে পারে না। এখানে আরো প্রমাণ হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থই প্রকৃত সম্পদ নয় বরং ঈমানই মূল সম্পদ, যা আল্লাহর নিকট মূল্য পাবে। (তাফহীমূল কুরআন ও মা'আরেফুল কুরআন তাফসীরদ্বয় অবলম্বনে)

www.nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই হযরত নূহ (আ)-এর যুগের সামাজিক চিত্র তুলে ধরা যায়। হযরত নূহ (আ)-এর সময়ে সুস্পষ্টভাবে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল উচ্চবিত্ত লোকেরা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব উচ্চবিত্ত লোকদের নিকট ছিল। এসব নেতা নিম্নবিত্তের লোকদের ঘৃণার চোখে দেখত। এদিক থেকে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা গুণগতভাবে ওহি নাযিলকালীন সময় থেকে ভিন্ন ছিল না। আজকেও বিশ্বের অনেক স্থানে একই অবস্থা বিরাজ করছে। অবশ্য আধুনিক যুগে অনেক স্থানে অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগের পরিবর্তে রাজনৈতিক শ্রেণী বিভাগ জন্ম নিয়েছে।

এ আয়াতসমূহে অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথাও রয়েছে। এখানে সুস্পষ্ট হয় যে, নিম্নবিত্ত সাধারণ লোক এবং ধনীদের মধ্যে আল্লাহর নিকট কোনো পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে নবীকে বলা হয়নি; বরং তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হলে তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য ছিল। দারিদ্র্যের কারণেই তারা নির্যাতিত হতো। এ কারণেই ইসলামের বাণীকে তারা সহজে গ্রহণ করেছিল। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক অধিকারের বেলায়ও যথাসম্ভব সমতা রক্ষা করাই আল্লাহর পছন্দ এবং ইসলামী সরকারের তাই দায়িত্ব হবে। সব মহলের সুযোগ-সুবিধার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। অবশ্য ইসলাম যোগ্যতার নীতিকে কোথাও অস্বীকার করেনি। তাই শিল্প উদ্যোগ বা চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতার নীতিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু সাধারণ অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ধনী-গরীব বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণী পার্থক্য করা সঙ্গত হবে না।

এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত সাধারণ লোকের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই - এ কথা বলা যায় না। এ কথার অবশ্যই ব্যাপক ধর্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু এর অর্থনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। সাধারণ লোকেরাই সমাজে বেশী। তারাই সমাজের মূল জনশক্তি। এ জনশক্তির অনেক গুরুত্ব আছে। তারা কর্মী হিসেবে সমাজের অনেক কল্যাণ সাধন করতে পারে। অবশ্য তাদেরকে যথাযোগ্যভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারলে তার নিদর্শন স্পষ্ট হয়। দেশের উন্নয়ন এই জনশক্তির ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বিশ্বাসী সাধারণ জনগণ অনেক নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। তাদের সততা আর কর্মপ্রিয়তা দেশের কাজে লাগে। ইসলামী সরকারের দায়িত্ব সাধারণ জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে ব্যবহার করা। ইতিহাসেও দেখা যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগে আরবের সাধারণ লোকেরাই তৎকালীন বিশ্বকে জয় করেছিল। তারাই শাসক হিসেবে বিশ্বকে শাসন করেছিল। জ্ঞান জিজ্ঞাসা সব ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সাধন করেছিল। এতে প্রমাণ হয়, ইসলামে এমন এক নৈতিক

www.nagorikpathagar.org

শক্তি আছে, যা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মোচিত করে। তাকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। আজও তা সম্ভব, যদি সঠিকভাবে এ শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। মু'মিনের প্রাপ্য কেবল দুনিয়াতে নয় বরং আখিরাতেও রয়েছে। আখিরাতের প্রাপ্য প্রকৃত প্রাপ্য। সুতরাং মু'মিন কখনো তার কাজে কেবল দুনিয়ার প্রাপ্যকে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে সে দুনিয়াতে ক্ষতিও বরদাশত করে নেয়।

www.nagorikpathagar.org

সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রসঙ্গে

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَاۤ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۞

তারা বলল, হে শুআইব, তোমার নামাজ কি এটাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা এসব মাবুদ পরিত্যাগ করব যাদের এবাদত আমাদের বাপ-দাদারা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু আমরা করে থাকি তা ছেড়ে দেব? শুধু তুমিই একজন মহৎ ও সৎ ব্যক্তি থেকে গেলে। (সূরা হূদ: আয়াত ৮৭)

তাফসীরকারদের আলোচনা

এ আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে মুফতী মুহাম্মদ শফী লিখেছেনঃ 'ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, ওরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করত। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোনো স্থান দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন-সম্পদ যেমন খুশি ভোগ-দখল করতে পারে; এ ক্ষেত্রে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়, যেমন বর্তমান যুগেও কোনো কোনো অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়। (মা'আরেফুল কুরআন, সূরা হূদের ৮৭ নং আয়াতের তাফসীর)

এ আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন, 'এ বক্তব্যটি ইসলামের মুকাবিলায় জাহিলি মতবাদের পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরছে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল, আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া যে পথ ও পন্থাই গৃহীত হবে তাই ভুল এবং তার অনুসরণ করা কিছুতেই উচিত নয়। কেননা অপর কোনো পথ ও পন্থার স্বপক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিদ্যা-বিজ্ঞান ও আসমানী কিতাবসমূহে কোনোই দলিল বা প্রমাণ নেই। আর দ্বিতীয়ত, আল্লাহর বন্দেগী শুধুমাত্র একটি সংকীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় - হওয়া উচিত নয়। বরং তামাদ্দুন, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির ন্যায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়িত করতে হবে। কেননা দুনিয়ার মানুষের নিকট যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

মালিকানাধীন। মানুষ কোনো জিনিসেরই উপর আল্লাহর মর্জি হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ইচ্ছামূলক হস্তক্ষেপ করার অধিকারী নয়।

জাহিলিয়াতের মত ও পথ এর বিপরীত। তা হলো বাপ-দাদার আমল হতে যে রীতি ও পন্থা চলে এসেছে, তাই মানুষের পালন করে চলা কর্তব্য। আর তা মেনে চলার ব্যাপারে এর অতিরিক্ত অপর কোনো দলিলের প্রয়োজনই নেই। উপরন্তু দীন ও ধর্ম বলতে শুধু পূজা-উপাসনালয়ই বোঝায়। জীবনের সাধারণ ব্যাপারে তো আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা যা আবশ্যক, আমরা যেখানে যা ইচ্ছা তাই করবার অধিকারী।

এ থেকে এ কথারও ধারণা করা যায় যে, জীবনকে ধর্মীয় ও বৈষয়িক এই দুই স্বতন্ত্র বৃত্তে বিভক্ত করা কোনো নতুন ধারণা নয়! আজ হতে তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে হযরত শু'আইবের জাতিও এই রূপ ভাগ-বাটোয়ারা করারই দাবি জানিয়েছিল, যেমন বর্তমানের পাশ্চাত্য দেশ ও তাদের প্রাচ্য শাগরিদরা দাবী জানাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো নতুন আলো নয় । আসলে এটা অতি পুরাতন কথা। হাজার বছর পূর্বেকার জাহিলিয়াতেও এটা প্রচারিত হয়েছিল এবং এর বিরুদ্ধে ইসলামের প্রবল ভূমিকা, সংগ্রামও পৃথিবীতে আজ নতুন নয়। বরং এও অতি প্রাচীন ব্যাপার।' (সূরা হূদের তাফসীর, ৯৭ নং টীকা)।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের জন্য এটি একটি দিক-নির্দেশকারী আয়াত। এ আয়াতে স্পষ্টভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। শু'আইবের কওম মনে করত যে, তাদের কাছে যে সম্পদ রয়েছে তার নিরঙ্কুশ মালিক তারাই এবং তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ধন-সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। এ ব্যাপারে তারা কোনো ধর্মীয় আইনের বা সৃষ্টিকর্তার বিধানের অধীন নয়। নামাজের সঙ্গে বা ধর্মীয় এবাদতের সঙ্গে অর্থনৈতিক কায়-কারবারের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে - তা তারা বুঝতেও পারত না, মানতেও চাইত না। হযরত শু'আইবকে এ জন্য তারা উপহাস করেছিল। কিন্তু কুরআন বলছে যে, আল্লাহর বিধানে এ ধরনের চিন্তার কোনো সমর্থন নেই। ইসলাম ধর্মকে এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে আলাদা ও সম্পর্ক বর্জিত মনে করে না। ইসলামের মতে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-নিষেধের প্রয়োগ থাকবে। জীবনকে কৃত্রিমভাবে ভাগ করা কুরআন স্বীকার করে না। আল্লাহ ও নবীর অনানুগত্য, সর্বপ্রকার বিধিনির্দেশই অমান্য করা নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কুরআনের সংশ্লিষ্ট কিছু আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

> 'হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের ...।'
>
> (সূরা নিসা: আয়াত ৫৯)

www.nagorikpathagar.org

'বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই।' (সূরা ইউসুফ: আয়াত ৪০)

'জেনে রাখ, সৃষ্টি তার (আল্লাহর) এবং আদেশ দেয়ার অধিকারও তারই।' (সূরা আ'রাফ: আয়াত ৫৪)

'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর।' (সূরা আ'রাফ: আয়াত ৩)

'আল্লাহ যা বিধান দিয়েছেন, সে মোতাবেক যারা সঠিক বিচার করে না তারা কাফির, জালিম, তারা ফাসিক।'

(সূরা মায়িদা: আয়াত ৪৩, ৪৫ ও ৪৭)

এসব আয়াতে সুস্পষ্ট হয় যে, অর্থনৈতিক জীবনও আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের অধীন হবে। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের বেলায় কোনো শর্তারোপ করা হয়নি অর্থাৎ নিঃশর্তভাবে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ব্যক্তিজীবন থেকে আরম্ভ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মেনে চলতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রযোজ্য ইসলামের বিধান মেনে চলতে বাধ্য। মুসলিম রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব জাতীয় অর্থনীতিতে ইসলামের বিধান ও লক্ষ্যের কাঠামোতে নীতি-নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন করা।

বর্তমান কালে সারা বিশ্বেই ইসলামী অর্থনীতিকে সমাজ বিজ্ঞানরূপে বিশ্লেষণ করার গবেষণা চলছে। সে দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আলোচ্য আয়াতে একটি গভীরধর্মী মৌল নির্দেশনা রয়েছে। আধুনিককালের অমুসলিম অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে দু'ভাগে ভাগ করে বিবেচনা করেন। একভাবে হলো Positive economics অর্থাৎ যা যেমন আছে Something is as it is তারই রূপ প্রদর্শন। অন্যভাবে হলো Normative economics অর্থাৎ যেমন এর থাকা বাঞ্ছনীয় as it should be. পরবর্তী ভাগে সাধারণত কোনো সমস্যার বিশ্লেষণ করে সমাধানের সুপারিশ পরিবেশনের প্রচেষ্টা হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো মুল্যবোধ আগে থেকেই প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে ধর্তব্য থাকে। তারই প্রেক্ষিতে ভালোমন্দ বিচার করে সমাজের জন্য বা কোনো পণ্যেল মূল্য নির্ধারণ বা বিপন্ন ইত্যাদি ব্যাপারে সুপারিশ পরিবেশন করে বিশ্লেষণকারী। আর Positive economics- এর ব্যাপারে কোনো বিষয়ে কিছু ঘটনা ঘটা বা কোনো আচরণকে উপলব্ধি করার জন্য প্রথমে একটা সম্ভাব্য কারণ চিন্তা করতে হয়। তাকে hypothesis ধরে নিয়ে তার কাঠামোতে যুক্তিবাদ দাঁড় করানো হয়। সে যুক্তিবাদ দিয়ে যদি ঘটনা বা আচরণের কারণ বিশ্বাস্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে সেই আগের ধর্তব্য কারণই তত্ত্ববাদের যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য সত্যে পরিণত হয়। কিন্তু সে গ্রহণযোগ্যতা সাময়িক। অন্য তত্ত্ববাদী ভিন্ন রকম যুক্তিবাদ দাঁড় করিয়ে গৃহীত তত্ত্বকে ভুল প্রমাণও করতে পারে। তখন পরবর্তী তত্ত্বটিই নতুন সত্যে পরিণত হবে। আগেরটি বর্জিত হবে। এমনি পদ্ধতিতে কোনো অপরিবর্তনীয় ধর্তব্য সত্যের কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তেমনি পদ্ধতি সে

www.nagorikpathagar.org

কারণেই কোনো অপার্থিব সত্তার দেয়া সৃষ্টি জগতের বিধানের প্রতি বিশ্বাসকেও প্রশ্নাতীত মনে করে না। তখন জ্ঞান ও তত্ত্ব সবকিছু ধর্মনিরপেক্ষই শুধু হয় না, দিক-নির্দেশনাহীন এবং লক্ষ্যহীন হয়। সে জন্যেই জ্ঞানকে ধ্বংসের লক্ষ্যে ও অকল্যাণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হতে থাকে।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনীতি, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকে মানুষের অর্থনীতি-বহির্ভূত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং চেতনা থেকে বিছিন্ন করে বিজ্ঞানের রূপ দিয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বর্জিত তত্ত্বজ্ঞান বা তার ব্যবহারকে মানুষের জীবনোপযোগী করার জন্য কোনোই পদ্ধতি সংস্কার করেনি। সে সংস্কার সম্ভব শুধু নৈতিক ও ইসলামী মৌল বিশ্বাস এবং বিধানের ধর্তব্যকে আর ভাব-ধারণাকে অনুশীলন ও গবেষণার অন্তর্গত করে। এগুলোকে বলা হয় Fundamental Assumptions and Concepats।

www.nagorikpathagar.org

সৎ পথে ব্যয় প্রসঙ্গে

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا
وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ط اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ *

যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম রয়েছে।

(সূরা রা'দ: আয়াত ২২)

শব্দের ব্যাখ্যা

رزق অর্থ - খাদ্য, উপায়, সম্পদ, জীবনোপকরণ, বৃত্তি, পেশা, নিয়ামত, অনুগ্রহ ইত্যাদি। (আরবি-ইংরেজি অভিধান)

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী শফী (র) লিখেছেন, উর্দু ভাষায় কোনো বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবর বলে মনে করা হয়। কিন্তু আরবি ভাষায় এর অর্থ আরো ব্যাপক। কারণ এর আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া। বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। 'যারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আল্লাহর নামেও ব্যয় করে।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না, বরং নিজেরই দেয়া রিযিকের কিছু অংশ চান। এটা দেয়ার ব্যাপারে তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়। অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সাথে سرا وعلانية শব্দ দু'টি যুক্ত হওয়ায় বোঝা যায় যে, সদকা-খয়রাত সর্বত্র গোপন করাই সুন্নত নয়, বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। (মা'আরেফুল কুরআন, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৮-২০৯)।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতে ব্যয়কে সৎ লোকদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যয় সম্পর্কে এর পূর্বেও অনেক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামে ব্যয়ের প্রথম

www.nagorikpathagar.org

মূলনীতিই হল তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। অবশ্য ইসলামে সব ভালো কাজই এ উদ্দেশ্যে করতে হয়। ইসলামে ব্যয়ের অন্যান্য মূলনীতি কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও অপচয়কে নিন্দা করেছে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

> এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না। বস্তুত যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই ...। (সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ২৬-২৭)

এ ব্যয় করতে হবে অতিরিক্ত সম্পদ থেকে, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۔ قُلِ الْعَفْوَ

> তারা তোমাকে কি খরচ করবে তা জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

এ ব্যয় করতে হবে আল্লাহর পথে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও তা ব্যয় করা যাবে, কেননা ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল। আত্মীয়-স্বজন এবং দরিদ্র জনগণের জন্যও ব্যয় করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করাকে মু'মিনের গুণ বলা হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ কথার ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে অর্থনৈতিক মন্দকেও আইন মোতাবেক শৃঙ্খলার মাধ্যমে দূর করতে হবে। অপরিকল্পিতভাবে তা করা যাবে না। তাহলে সমাজে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

সম্পদ বণ্টন সম্পর্কিত আল্লাহর নীতি প্রসঙ্গে

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ *

আল্লাহ্ যাকে চান রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণ রিযিক দেন। এ লোকেরা দুনিয়ার জীবনে আনন্দে নিমগ্ন হয়ে থাকে অথচ দুনিয়ার জীবন পরকালের তুলনায় সামান্য পরিমাণ সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা রা'দ: আয়াত ২৬)

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

মাওলানা আবুল আলা মওদূদী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ এ আয়াতের পটভূমি এই যে, মূসার সময়ের কাফিরগণও সাধারণ মূর্খদের ন্যায় আকিদা ও আমলের ভালো-মন্দ দেখার পরিবর্তে ধনী ও দরিদ্র হওয়ার দৃষ্টিতে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারণ করত। তাদের ধারণা ছিল, যে লোক দুনিয়ার আরাম-আয়েশের দ্রব্যসামগ্রীর অধিকারী, সে লোক বুঝি আল্লাহরও প্রিয় কার্যত সে যতই পথভ্রষ্ট ও অনাচারী হোক না কেন। পক্ষান্তরে যার অবস্থা দীন-দরিদ্র সে আল্লাহরও অপ্রিয়, অভিশপ্ত লোক, তার আমল, আখলাক, যতই উন্নত ও পবিত্র হোক না কেন।

এ কারণেই অবিশ্বাসীরা কুরাইশ সম্প্রদায়কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের তুলনায় অনেক মর্যাদাবান ও সম্মানী মনে করত। তারা বলত, 'এই দেখই না, আল্লাহ কাদের সঙ্গে রয়েছেন।' এ সম্পর্কে আল্লাহ সাবধান করে দিয়েছেন। বলেছেন, রিযিকের কম বেশী হওয়া তো আল্লাহর অপর এক নিয়মের অধীন। অপর দিক দিয়ে অসংখ্য রকমের বিবেচনার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা কাউকে বেশি, কাউকে কম দান করেন। কিন্তু মানুষের অভ্যন্তরীণ নৈতিক মানদণ্ডের জন্য এটা কোনো মানদণ্ড নয়। মানুষের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যকরণের আসল ভিত্তি এবং সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যশালী হওয়ার আসল মাপকাঠি হচ্ছে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পন্থা কে গ্রহণ করেছে, কে

www.nagorikpathagar.org

উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হয়েছে, আর কে খারাপ গুণাবলীর। কিন্তু অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা এ ভিত্তি ও মাপকাঠি বাদ দিয়ে কাকে ধন-সম্পদ বেশী দেয়া হয়েছে আর কাকে কম - তারই ভিত্তিতে বিচার করে থাকে।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী লিখেছেনঃ পৃথিবীতে বেশি সম্পদ ও অর্থ হওয়া ভালো ভাগ্য বা মন্দ ভাগ্যের ব্যাপার নির্ধারণ করে না। এটা সব সময় সত্য নয় যে, যাদের বেশি ধন-সম্পদ আছে তারা আল্লাহর অধিক প্রিয়। আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা দারিদ্র্যে জীবন কাটায়, অন্যদিকে অনেক অপরাধী লোক আরাম-আয়েশে দুনিয়ায় থাকে। এটিই আখিরাত সংগঠন করার কারণ। সুনিশ্চিতভাবে আরেকটি জগত আছে যেখানে ভালো-মন্দ কাজের ফল পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে পৃথিবীর অভাব বা প্রাচুর্য আল্লাহর কাছে গ্রহণ বর্জনের মানদণ্ড হতে পারে না।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সূরা রা'দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। এই সূরায় নানাভাবে তওহিদ, পরকাল ও নবুওত-রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এই সূরার ৩য় রুকুতে সৎ ও মন্দ লোকদের গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে। সৎ লোকদের গুণাবলী পর্যায়ে বলা হয়েছে - তারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূরণ করে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক বহাল রাখতে বলেছেন তা বহাল রাখে, ধৈর্য ধারণ করে, নামাজ কায়েম করে, আল্লাহর দেয়া রিযিক হতে প্রকাশ্য ও গোপনে খরচ করে এবং অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। এইসব লোকের জন্য রয়েছে পরকালে বিশেষভাবে পুরস্কার। সৎ লোক দুনিয়াতে পুরস্কার পেতে পারে আবার নাও পেতে পারে। আল্লাহর নানা নিয়মে তা ঘটতে পারে। যেমন আল্লাহ পাক সূরা বাকারায় বলেছেনঃ

> আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদিগকে। (সূরা বাকারা: আয়াত ১৫৫)

দুনিয়াতে কোনো সৎ লোকের কম ধন-সম্পদ হওয়া তার আল্লাহর নিকট অপ্রিয় হওয়ার লক্ষণ নয়। তেমনিভাবে কারো বেশি ধন-সম্পদ হওয়া আল্লাহর নিকট প্রিয় হওয়ার লক্ষণ নয় - যেমন মক্কার কাফিররা বিশ্বাস করত। আজ-কালও পাশ্চাত্যের উন্নত জৌলুসে প্রভাবিত লোকেরা এ ধারণা বিশ্বাস ও প্রচার করে থাকে। এ বিশ্বাস ও যুক্তির অসারতা ঘোষণা করেই আল্লাহ পাক বলছেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন আর যাকে ইচ্ছা রিযিক কম দেন। এসব ঘটে থাকে আল্লাহর পরিকল্পনা ও নৈতিক আইনের অধীনে।

অবশ্য এখানে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রিযিক অর্জন ও ধন বণ্টন সম্পর্কিত আল্লাহর আইনের অন্যান্য দিকও রয়েছে। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে

www.nagorikpathagar.org

তার রিযিকের জন্য চেষ্টা করতে হবে (সূরা জুমু'আ: আয়াত ১০; সূরা নিসা: আয়াত ৩২; সূরা হাশর: আয়াত ৭)। তেমনিভাবে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমাজ ও রাষ্ট্র দেখাশুনা করবে এবং তার অভাব দূর করবে।

আলোচ্য আয়াতে ধন বন্টন সম্পর্কিত আল্লাহর একটি মৌলিক নীতি সুস্পষ্ট হয়। ইসলামের ধন বন্টন নীতি সম্পর্কিত অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ আয়াতের বক্তব্যকেও ইসলামী অর্থ ও সমাজ নীতিবিদদের মনে রাখতে হবে।

অর্থাৎ এ আয়াত থেকে একথা মোটেই বোঝায় না যে, সম্পদে মানুষের হিস্যার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে থাকেন বলে তাকে সম্পদ অর্জনের জন্য কোনো চেষ্টা তদবির করতে হবে না। কেননা এখানে উল্লিখিত বিষয়টি হলো প্রাকৃতিক ও নৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আর সম্পদ অর্জনের জন্য চেষ্টা করা সাধারণ নীতিমালার অন্তর্গত। এ দু'য়ের সমন্বয়েই ইসলামী জীবন দর্শন পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং এতেই ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিহিত।

www.nagorikpathagar.org

কালেমা তাইয়্যেবার অর্থনৈতিক তাৎপর্য

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا
فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِيْ أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ
الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ * يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ج وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ *

তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিসের সঙ্গে কালেমায়ে তাইয়্যেবার তুলনা করেছেন। এটার দৃষ্টান্ত এই, যেন একটি ভালো জাতের গাছ যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ় নিবদ্ধ হয়ে আছে এবং শাখাগুলো আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা প্রত্যেক মওসুমে তার ফল দান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। এইসব উদাহরণ আল্লাহ এই জন্য দিয়েছেন যেন মানুষ এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর নাপাক কালেমার উদাহরণ হচ্ছে, একটি খারাপ জাতের গাছ, যা মাটির উপরিভাগ হতে উপড়ে ফেলা যায়, এর কোনো দৃঢ়তা নেই। যারা প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত বাক্যে বিশ্বাসী আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত - দু'জায়গাতেই প্রতিষ্ঠা দান করবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (সূরা ইবরাহিম: আয়াত ২৪-২৭)

শব্দের তাৎপর্য

'কালেমা তাইয়্যেবা'র শাব্দিক অর্থ হল পাক ও পবিত্র কথা। কিন্তু এর তাৎপর্য হল সত্য কথা ও নেক নির্মল আকিদা বিশ্বাস, যা পুরাপুরি প্রকৃত সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর ভিত্তিশীল হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ হলো তওহিদের স্বীকৃতি। কেননা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আসল সত্য কথা। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহিমের তাফসীর)

কালেমায়ে খবিসা - এটা কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিপরীত। প্রত্যেক সত্যবিপরীত ও ভুলভিত্তিক কথা বা বিষয়কেই খবিসা কালেমা বলা চলে।

www.nagorikpathagar.org

এখানে এর অর্থ প্রত্যেক ভুল মতবাদ যাকে ভিত্তি করে মানুষ নিজের জীবন গড়ে তোলে। তা নিছক নাস্তিকতাও হতে পারে, হতে পারে শিরক-বিদ'আত বা নবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত নয় এমন মতবাদ। (প্রাগুক্ত)।

কাওলে সাবিত - এর অর্থ প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণিত কথা। এখানে এর অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' (নাসাফী, কাশশাফ)।

তাফসীরকারদের আলোচনা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী একটি আয়াতের উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, কালেমায়ে তাইয়্যেবা হচ্ছে মহাসত্য। আসমান হতে যমীন পর্যন্ত গোটা সৃষ্টি এ মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে প্রাকৃতিক আইন ও নিয়ম কোনোদিক দিয়েই এর সঙ্গে সংঘর্ষশীল হয় না। এটি এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ কালেমা, যে ব্যক্তি বা জাতিই একে ভিত্তি করে নিজ জীবনের ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, সে সব সময় এর সুফল লাভ করবে। সে চিন্তায় পরিপূর্ণতা, স্বভাব-চরিত্রে নির্মলতা, প্রকৃতিতে ভারসাম্য, নীতির দৃঢ়তা ও নৈতিক পবিত্রতা, পারস্পরিক কাজকর্মে ন্যায়পরায়ণতা, ওয়াদা, প্রতিশ্রুতিতে পরিপক্কতা, সামাজিক সুনীতি, অর্থনীতিতে ইনসাফ ও সহানুভূতি, রাজনীতিতে বিশ্বস্ততা, যুদ্ধে ন্যায্যতা, সন্ধিতে আন্তরিকতা ও চুক্তিতে নিষ্ঠা সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে 'খবিস কালেমা' বা ভুল বিশ্বাস মূল সত্যের বিপরীত। তা প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এটা কেবল তিক্ত ফলই দিতে পারে। কালেমা তাইয়্যেবা সবসময় একই ছিল অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা। কিন্তু খবিস কালেমা অসংখ্য। কালেমা তাইয়্যেবাকে কখনো সমূলে বিনাশ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে নিত্য নতুন খবিস কালেমা পয়দা হয়েছে। ইতিহাস অসংখ্য মৃত ও বিলুপ্ত খবিস কালেমাতে পূর্ণ।

কালেমা তাইয়্যেবা একটি দৃঢ়স্থায়ী দৃষ্টিকোণ দেয়। মানুষের সব সমস্যার সমাধান এ মহামন্ত্রে রয়েছে। কালের আকর্ষণ এটার ভিত্তিকে শিথিল করতে পারে না। অপরদিকে চলার পথে এটা বিভ্রান্ত হওয়া হতে রক্ষা করে। যখন দুনিয়ার জীবন অতিক্রম করে সে পরকালে পদার্পণ করে, সেখানেও তাকে কোনো প্রকার দুঃশ্চিন্তা এবং দুঃখের সম্মুখীন হতে হয় না। (তাফহীমুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ-৬ষ্ঠ খণ্ড)।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সূরা ইবরাহিমের এ ক'টি আয়াতে ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন, তত্ত্ব এবং নীতির মূল ভিত্তি পাওয়া যায়। কালেমা তাইয়্যেবাতে তার অন্তর্নিহিত দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। কালেমা তাইয়্যেবাতে একদিকে তওহিদের অর্থাৎ এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে আল্লাহর সর্বশেষ বিশুদ্ধ বিধানের নির্দেশ মানব জাতির জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। এইসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, একটি সঠিক বিশ্বাসই ভালো ফল দিতে পারে। মন্দ বিশ্বাস থেকে কোনো ভালো ফল আশা করা যায় না। কাজেই যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য একটি যথার্থ বিশ্বাসের ভিত্তিমূল প্রয়োজন। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সে বিশ্বাস হচ্ছে তওহিদ। তওহিদের উপর, আল-কুরআনের মতে, কেবল অর্থনীতির নয় - গোটা জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। তাতেই সমাজ জীবনে কল্যাণ অর্জিত হবে।

উপরোক্ত সাধারণ উক্তি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে, ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে সংগঠিত করা হলে তার স্বরূপ কেন প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ভিন্নধর্মী হবে, তারই মৌল সত্যটির দিকে আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কালক্রমে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান সন্ধানের জন্য নতুন নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। অর্থনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও তা করা সম্ভব। এসব ব্যাপারে গবেষক ও তত্ত্ববিদগণ একটি সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য একটি রূপকে তাদের নিজস্ব জ্ঞানলব্ধ যুক্তির সাহায্যে প্রাথমিকভাবে ধরে নেন এবং তাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রের পরিধিতে প্রয়োগ করে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হন। প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে অন্য সম্ভাব্য বিকল্পকে ধরে আবার নতুন প্রয়াস শুরু করেন। কিন্তু অর্থনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রয়াসে প্রমাণের সাফল্য ঠিক বৈজ্ঞানিকভাবে পূর্ণ ও সঠিক না হওয়ারই কথা। তার কারণ, মানুষের আচরণ ও সমাজের অসংখ্য জটিলতার কাঠামোতে আচরণের নানা সংঘাত সম্পর্ককে তথ্যের আকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিই ত্রুটিহীনভাবে গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি। সমাজ ও মানুষের আচরণ যত বেশি আধুনিকতাধীন চাপে পড়ছে তত বেশি বাড়ছে প্রভাব বিস্তারকারী variable factor। সুতরাং ততই বেশি বাড়ছে সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তত্ত্ববাদকে নির্ভুল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার সংশয়। আংশিক প্রয়োগে আংশিক ফল পাওয়ার তথ্য সাহায্যেই কেউ কেউ পেতে চান নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনকারীর গৌরব। অথচ সে আংশিক নতুন তত্ত্ববাদ আংশিকভাবে স্বল্পকালের জন্য সুফল দিতে পারলেও কালক্রমে সেটুকু সুফল লাভের ভিত্তিটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নতুন প্রেক্ষিতে ও নতুন পরিস্থিতিতে একই পূর্ববর্তী সুফলদায়ক তত্ত্ববাদ অসামাজিক অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে। অ্যাডাম স্মিথ - রিকার্ডো সৃষ্ট ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির তেমনি হয়েছে অবসান, ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি ব্যবস্থার কুফলকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মার্কসবাদেরও হয়েছে অবসান। বর্তমান পৃথিবীতে কল্যাণের সন্ধান করছে পাশ্চাত্য, কল্যাণ রাষ্ট্রের নতুন রূপের অর্থনীতি এবং একই কল্যাণের সন্ধান করছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নানা মাত্রার সমাজতন্ত্রবাদ। এখনো সে সকল সন্ধান, অনুসন্ধান ও নতুন তত্ত্ববাদের বাস্তবায়ন সঠিক ও সুগঠিত রূপ নিয়ে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সৃষ্টির উপযোগী

www.nagorikpathagar.org

বলে প্রমাণিত হয়নি। তা হতেও পারবে না কোনদিন। কারণ, ভিত্তিগত ধর্তব্য সত্য বা axiom চিন্তা ও অনুশীলন সম্পর্কেই রয়েছে গোড়ায় গলদ।

আলোচ্য আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামী তত্ত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমেই স্বীকৃতি দান করতে হবে ইসলামী ধর্তব্য (axiom)-কে। প্রথম মৌল ধর্তব্যই হলো 'তওহিদ' জ্ঞান। এ জ্ঞানের স্বীকৃতি থেকেই আসছে ধর্তব্যের দৃঢ় স্তম্ভ, যার সত্যতার পরিবর্তন হবে না। সে জন্যেই এ ধরনের সত্যতাকে ভিত্তি করে যেসব variable-কে প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করতে হয় তার সংখ্যাও সীমিত। সেসব সীমিত variable-কে কঠোর সত্যনিষ্ঠ পদ্ধতিতে যুক্তি ও আল-কুরআন, সুন্নাহর সমর্থন সম্পর্কের মূল্যায়ন সহজ পন্থায় আর সঠিক পন্থায় পরিচালনা করা সম্ভবপর। আর এসব গবেষণা ও তত্ত্ববাদ সংগঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে অসত্য ও অকল্যাণের নির্দেশক তত্ত্ব এবং নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার ঝুঁকি থাকে খুবই কম। সে ঝুঁকি মানুষের উল্লিখিত সঠিক পদ্ধতিকে আয়ত্ত করার এবং প্রয়োগ করার দক্ষতার সীমাবদ্ধতার ওপরই নির্ভরশীল। সে কারণে বর্তমান বিশ্বেও পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে সর্বাঙ্গীন উপযোগী ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি ব্যবস্থা সংগঠনের তত্ত্ববাদ ও নীতি-নির্ধারণকে প্রতিষ্ঠিত রূপ দিতে পারলে দেখা যাবে, পরিবর্তনশীল পুঁজিবাদ ও পরিবর্তনশীল সমাজতন্ত্রবাদের চেয়ে সঠিক ভিত্তির ভারসাম্যপূর্ণ, শোষণহীন, সুবিচারমূলক ইসলামী ব্যবস্থাই বিশ্বের মানুষের জন্য সর্বত্রই সর্বোচ্চ কল্যাণপ্রসূ।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর নিয়ামতের অপরিমেয়তা প্রসঙ্গে

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۗ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ *

তিনি তোমাদেরকে সে সব কিছুই দিয়েছেন, যা তোমরা তাঁর নিকট চেয়েছ। তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ বড়ই অবিচারক ও অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহিম: আয়াত ৩৪)

শব্দের অর্থ

নিয়ামত (نِعْمَةٌ) অর্থ দান, অনুগ্রহ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পদ ইত্যাদি। (আরবি-ইংরেজি অভিধান)

তাফসীরকারদের আলোচনা

মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী তার তাফসীরে লিখেছেনঃ 'আল্লাহ মানুষ যা জিহ্বা দিয়ে চেয়েছে তা তাকে দান করেছেন। মানুষ যা কিছু আবিষ্কার করেছে, তা আল্লাহ পাকই দান করেছেন। কেননা মানুষের প্রগতির জন্য এসব প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আল্লাহ্ পাক এসব নতুন নতুন চাহিদা পূর্ণ করেছেন।' (তাফসীরে উসমানী, সূরা ইবরাহিম, ৫৯ নং টীকা)

আল্লাহ পাকের নিয়ামতের সংখ্যা এত অধিক ও অসংখ্য যে, গোটা মানব জাতিও একত্র হয়ে তা গণনা করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাযী বলেছেন, আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য এবং আল্লামা আবূ সউদ বলেন যে, এসব নিয়ামতের পরিমাণ সীমাহীন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী 'তিনি তোমাদেরকে সেসব কিছুই দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছ'-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ অর্থাৎ স্বভাব ও প্রকৃতির প্রত্যেকটি দাবীকেই পূর্ণ করেছেন। তোমাদের জীবনের জন্য যা যা প্রয়োজনীয়,

www.nagorikpathagar.org

তা তিনি যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। তোমাদের স্থিতি ও বিকাশ লাভের জন্য যে সব উপাদান অপরিহার্য সবকিছুই তিনি লাভ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহিমের ৪৫ নং টীকা)

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সূরা ইবরাহিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের শেষ ভাগে অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় রাসুল ও ইসলামের দুশমনদেরকে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত সূরা ইবরাহিমের পঞ্চম রুকুর অংশ এবং এ রুকু শুরু হয়েছে 'আল্লাহর দেয়া নিয়ামত অস্বীকারকারীদের পরিণতি'র বর্ণনা দ্বারা। অতঃপর আল্লাহ পাক নিয়ামতসমূহের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন এবং তার মাধ্যমে মানব জাতিকে রিযিক দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি নানা আকারের ফল সৃষ্টি করেছেন। নদ-নদী ও নৌযানকে মানুষের অধীন করেছেন, সূর্য-চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন মানুষের কল্যাণে। ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে, যা মানুষ গণনা করেও এসবের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না।

আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণার আলোকে দেখা যায়, আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য ও সীমাহীন। নিয়ামত অবশ্য কেবল সম্পদ (resource) অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না। সম্পদও নিয়ামতের অংশ। এ প্রেক্ষিতে সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। কেননা আমরা জানি না যে, বিশ্বে এবং সৌরমণ্ডলে কি সম্পদ ছড়িয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে এসব সম্পদ অনুসন্ধান করা এবং তা পাওয়া গেলে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইসলাম বাস্তবসম্মত আচরণ শিক্ষা দিয়েছে। রাসূলের গোটা জীবনই তার প্রমাণ। এ জন্য অর্থনীতিবিদকে অচল, জানা ও আবিষ্কৃত সম্পদের ভিত্তিতেই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত জুলুম ও অকৃতজ্ঞতার কথা এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে এত সম্পদ ও নিয়ামত দান করা সত্ত্বেও মানুষ এসবকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সুবিচার ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসে না। সে জন্য দেখা যায় যে, সৃষ্টিগতভাবে সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সামাজিকভাবে বহু লোক আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। আদেল ও শাকুর হিসেবে মানুষ তার দায়িত্ব পালন করলে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

www.nagorikpathagar.org

জন্তু-জানোয়ারের উপকার প্রসঙ্গে

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ * وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ
حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ * وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ
اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ * وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا
وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ *

তিনি তোমাদের জন্য জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন। তাতে তোমাদের জন্য খাদ্য ও পোশাক রয়েছে। নানাবিধ অন্যান্য উপকারও এতে রয়েছে। তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য রয়েছে, যখন সকাল বেলা তোমরা সেগুলোকে বিচরণের জন্য পাঠাও এবং যখন সন্ধ্যায় সেগুলোকে ফিরিয়ে আন সেগুলো তোমাদের ভারবোঝা বহন করে এমন স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায় যেখানে তোমরা খুব কঠোর শ্রম ছাড়া পৌঁছতে পার না। আল্লাহই বড় অনুগ্রহসম্পন্ন ও মেহেরবান। তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গর্দভ পয়দা করেছেন যার উপর তোমরা সওয়ার হও এবং তোমাদের জীবন উজ্জ্বল হয়। তিনি আরো বহু জিনিস তোমাদের কল্যাণে পয়দা করেন। যে সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানা নেই। (সূরা নাহল: আয়াত ৫-৮)

আয়াতসমূহের সাধারণ তাৎপর্য

সূরা নাহলের শুরু হতে তওহিদের প্রমাণ পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ মহান পবিত্র এবং শিরক হতে মুক্ত। তিনি যাকে চান নবী বানান এবং তার নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করেন এ বাণীসহ যে, 'তোমরা সকল লোককে সাবধান ও সতর্ক কর এবং কেবল আল্লাহকেই মান্য কর।' আল্লাহ্ পাক আসমান-যমীনকে সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে ক্রমে সামান্য ফোঁটা হতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর অমান্যকারী হওয়া সাজে না।

www.nagorikpathagar.org

এরপর জন্তু-জানোয়ারের এবং তার মধ্যে মানুষের জন্য যে উপকার রয়েছে তার আলোচনা আয়াত ৫ থেকে ৮-এ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক জন্তু-জানোয়ার পয়দা করেছেন। তার মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে পোশাক ও খাদ্য। জন্তুর মধ্যে আরো নানাবিধ ফায়দা নিহিত রয়েছে। অনেক জন্তু ভার বহন করে থাকে, অনেক জন্তু দুর্গম স্থানে যাতায়াতে সহায়তা করে। অনেক জন্তুর সৌন্দর্যও মানুষকে মোহিত করে। আলোচ্য আয়াতসমূহের পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক তওহিদের আরো প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন। তিনি আকাশমণ্ডল হতে বৃষ্টি বর্ষণ করান, যার দ্বারা মানুষ পানি পান করে তৃপ্ত হয়। এ বৃষ্টির সাহায্যে যে ফসল, তৃণ হয় তার দ্বারা মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার খাদ্য পায়। তিনি যে নানা রকম ফসল উৎপাদন করেন, সূর্য ও চন্দ্রকে যেভাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন, যেভাবে তিনি নদী-সমুদ্রকে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং যেভাবে তিনি পর্বতসমূহ পৃথিবীর বুকে স্থাপন করেছেন তাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। মানুষ এসবের মধ্যে এক মহাপরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনা লক্ষ্য করে সেই পরিকল্পনাকারী স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আয়াত ক'টিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মানুষের উপকারী জন্তুগুলোর অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রথমেই লক্ষ্যণীয়, আল্লাহর সৃষ্টি কতকগুলো জন্তু থেকে মানুষের জীবনধারণ ও জীবনের ক্রমাগত উন্নতির অবলম্বন উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। খাদ্য হিসেবে পাওয়া যায় সুস্বাদু গোশত আর দুগ্ধ। পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরির উপকরণ হিসেবে পাওয়া যায় জন্তুর গায়ের পশম। জন্তুর চর্ম থেকে তৈরি হয় শৈত্যের পোশাক, পানি বহন করার মশক আর তাঁবু তৈরি করার ভিন্ন ভিন্ন অংশ। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশে যান্ত্রিক যুগের পূর্বে প্রকৃতির সঙ্গেই তার ছিল নিকট সম্পর্ক। মানুষ বন্য পশুকে বশ করেছে এবং তার জীবনের সাহায্যকারী হিসেবে লালন পালন করেছে। বন্য অশ্ব, বন্য গবাদি পশু, মেষ, হরিণ ইত্যাদি আহরণ করে অর্থনৈতিক কাজে সাহায্য করার সম্পদে পরিণত করেছে। যে অঞ্চলে এসব উপকারী জন্তুর উপযোগী বন-জঙ্গল ও পরিবেশ সৃষ্টি ছিল, সে অঞ্চলেই কৃষি খামারের উন্নয়নের সঙ্গে পশু-পালন ও তার উন্নয়ন কাজ প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের আয়ত্ত হয়েছে। বিশেষ করে বনবহুল ও জনবিরল ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোতে এমনি বিবর্তন সহজ আর ফলপ্রসূ হয়েছে। উৎপাদনশীলতার বর্তমানকালেও উৎকর্ষ ফলপ্রসূতার ভিন্ন প্রাকৃতিক ভিত্তিকে অবলম্বন করে প্রতিযোগিতাশীল সমৃদ্ধি অর্জন করা যায়। খামার ও পশু-পালনের উন্নত উৎপাদনের জন্য তাই বর্তমান বিশ্বেও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, হল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলের দুগ্ধ, মাখন ও ঘি জাতীয় খাদ্য পৃথিবীর সর্বত্রই বাজার লাভ করছে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করেই জন্তু ছিল মানুষের এবং নানা প্রকার ধন-সম্পদ স্থানান্তর করার নিরাপদ অবলম্বন। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রগতি ও প্রসার ধন-সম্পদের স্থানান্তর ও দূর-দূরান্তে বিনিময় করার ওপর এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার ওপর নির্ভরশীল। হাতী, উট, অশ্ব, মহিষ, বলদ ইত্যাদিই সে কাজে মানুষকে দিয়েছে সাফল্য ও সমৃদ্ধি। বর্তমানকালেও যেসব ব্যাপক অঞ্চলে যান্ত্রিক যানবাহন বা জলপথের প্রাধান্য নেই, সে সব অঞ্চলের সব দেশেই পশু বহন করে অথবা পশু যানবাহন টেনে নেয়। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের বিরাট অংশের পরিবহন কাজ করছে পশু। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক যোগাযোগ সৃষ্টি পশুচালিত যানবাহনে চলছে। এই হলো অর্থনীতির অবকাঠামোতে প্রকৃতির অবদান।

তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই নিযুক্ত রয়েছে পশু। বলদ ও মহিষই এ ক্ষেত্রে পুঁজিযন্ত্রের মতো সাহায্য করছে - কৃষির খামারে মাটি তৈরি কাজে, লাঙ্গল, মই টানা কাজে, সেচের পানি উত্তোলনে, শষ্য মাড়াই কাজে। সুস্থ, বলিষ্ঠ বলদ ও মহিষ না থাকলে কৃষিকাজে এমনি পশু প্রয়োগের ভূমিকাও হয় দুর্বল, ফসলের উৎপাদন হয় কম, চাষীর অর্থনৈতিক অবস্থাতে আসে দুর্ভাগ্য। সুতরাং পশুর খাদ্য ও পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থাও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই মানুষকে করতে হয়।

চতুর্থত, কৃষি খামার, বনজ সম্পদ ও পশুপালনের পরিবেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যেমন পরিকল্পনা আল্লাহর সৃষ্ট আইনেরই অন্তর্গত, তেমনি আবার এ পরিবেশের মানবিক জীবনে কতকগুলো বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এ পরিবেশে প্রকৃতির আকাশ-বাতাস, ফুল-ফল, পাখির কাকলি মানুষের মনকে দেয় বিশুদ্ধতা আর বিশুদ্ধ আনন্দ। অন্যদিকে প্রত্যক্ষভাবে পশুপালনের কাজের মধ্যেও মানুষ পায় শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ - পশুর দলকে প্রত্যুষে মাঠের দিকে পরিচালনা করার সময়ে, আবার সন্ধ্যার ছায়াঘেরা স্নিগ্ধতায় পশুর দলকে ফিরিয়ে আনার সময়ে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের এবং জীবিকা আহরণের সংগ্রামের মধ্যেই সরল সুন্দর সততার অনুরূপ গ্রামবাসীর মনে জাগে শিল্পীর তৃপ্তি এবং তার নিজ হাতের সৃষ্টির মাধুর্য।

www.nagorikpathagar.org

সম্পদের ব্যয় প্রসঙ্গে

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا
مَّحْسُوْرًا * اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا
بَصِيْرًا * وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا *

নিজেদের হাত গলার সঙ্গে বেঁধে রেখো না এবং একে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিও না, তা করলে তোমরা নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। তোমার রব যার জন্য চান রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য চান সঙ্কীর্ণ করে দেন। তিনি তার বান্দাদের সবার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন এবং তাদেরকে দেখছেন। আর তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা একটি বিরাট অপরাধ। (সূরা বনী ইসরাইল: আয়াত ২৯-৩১)

আয়াতসমূহের সাধারণ তাৎপর্য

উপরোক্ত আয়াতসমূহে প্রথমত খরচের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এমন কৃপণ হওয়া সঙ্গত নয় যে, সে প্রয়োজনীয় খরচও করে না - তা তার নিজের জন্য হোক বা অন্যের জন্য অথবা পরিবারের জন্য। কৃপণতা ধন-সম্পদের আবর্তন ব্যাহত করে এবং অপচয় ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্ষমতা নষ্ট করে। তারপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে রিযিক বিতরণের ব্যাপারে কম বেশির পার্থক্য করেছেন। অবশ্য এ অসাম্য আল্লাহর নিয়মের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তারপর বলা হয়েছে, দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা যাবে না। সন্তানের রিযিক তেমনি আল্লাহ দেন যেমনি দেন তাদের পিতা-মাতার রিযিক। সন্তান হত্যা করা একটি বড় অপরাধ।

এ নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা চিরতরে সন্তান হত্যার রেওয়াজ বন্ধ করে দিয়েছেন। অভাবের ভয়ে হোক বা অন্য কারণে হোক। প্রকৃতপক্ষে আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া সব হত্যাই নিষিদ্ধ বা হারাম।

www.nagorikpathagar.org

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী এ সব আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ 'হাত বাঁধা' একটি রূপক কথা। তা হতে বোঝায় কার্পণ্য। যার হাত খোলা, ছেড়ে দেয়ার অর্থ অপচয়, বেহুদা খরচ করা। লোকদের মধ্যে যতদূর সম্ভব মধ্যম নীতিবোধ থাকা আবশ্যক যে, তারা না কৃপণ হয়ে ধন-সম্পদের আবর্তনকে ব্যাহত করবে, আর না অপচয় ও অপব্যবহারকারী হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তিকে বিনষ্ট করবে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন এক নির্ভুল অনুভূতি বর্তমান থাকবে যে, তারা প্রয়োজনীয় খরচ হতে বিরতও থাকবে না এবং বেহুদা খরচের বিপর্যয়েও তারা নিমজ্জিত হবে না। অহঙ্কার, রিয়া ও লোক দেখানোর জন্য আয়-ব্যয়, বিলাসিতা ও পাপ কাজে অর্থ ব্যয় আল্লাহর নিয়মের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা। যেসব লোক নিজের ধন-দৌলত এসব পথে ব্যয় করে তারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের ভাই।'

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে রিযিক বিতরণের ব্যাপারে যে কম-বেশির পার্থক্য রেখেছেন মানুষ তার কল্যাণকারিতা বুঝতে পারে না। এ বাক্যটি যে স্বাভাবিক নিয়মের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছে তার দরুন মদিনার সমাজে সংশোধনমূলক কর্মসূচিতে এই কথা মনে করার কোনো কারণই কখনও দেখা দেয়নি যে, রিযিক উপার্জনের উপায় উপাদানে কম-বেশি হওয়া মূলতই খারাপ জিনিস। কাজেই এটাকে নির্মূল করা এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা কোনো অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না। পক্ষান্তরে মদিনা শরিফে মানবীয় সমাজকে সুস্থ ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা ছিল এই যে, আল্লাহর সম্মত নীতি মানব সাধারণের মধ্যে যে পার্থক্য রেখেছে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হবে এবং পূর্বোক্ত হেদায়াত অনুযায়ী সমাজের নৈতিকতা, চাল-চলন ও কর্মনীতির এমন সংশোধন করে দিতে হবে যে, অর্থ-সম্পদের পরিমাণ পার্থক্য যেন কোনোরূপ জুলুম, বে-ইনসাফীর কারণ হয়ে না দাঁড়াতে পারে। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাইলের ২৯ ও ৩০ নং টীকা হতে উদ্ধৃত)।

মুফতী মুহাম্মদ শফী ৩০ নং আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ 'জাহিলিয়াতের যুগে কেউ কেউ জন্মের পর পরই সন্তানদের বিশেষ করে কন্যাদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কর্মপন্থাটি যে জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদাতা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহর কাজ। তোমাদেরকে তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছো। (মা'আরেফুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাইলের ৩১নং আয়াতের তাফসীর)।

www.nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

প্রথম দু'টি আয়াতে (২৯ এবং ৩০ নং) রিযিক এবং তা থেকে ব্যয় সম্পর্কিত নীতির প্রতি দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরার পূর্ববর্তী অন্য দু'টি (২৬ ও ২৭ নং) আয়াতের সঙ্গেও উক্ত নীতি বিশ্লেষণের সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া মৌলভাবে সূরা বাকারার ২নং আয়াতে যে মু'মিনের চরিত্র বিশেষত্ব বোঝাবার প্রেক্ষিতে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ বলা হয়েছে তার সঙ্গেও যথেষ্ট বিশ্লেষণ প্রেক্ষিতে সম্পর্ক লক্ষ্যণীয় (এ সম্পর্কে সূরা বাকারার উল্লিখিত ২নং আয়াত নিয়ে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ব্যয়নীতি নির্ধারণে ইসলামী অর্থনীতির জন্য ধর্তব্য কাঠামো হলো প্রধানত তিনটিঃ

১. ইসলামী ঈমানে প্রতিষ্ঠিত মানুষের জীবনধারা ও আধ্যাত্মিক আচরণ-শৃঙ্খলার বিদ্যমানতা (সালাত, যাকাত ও রিযিকের সমন্বয় সাধন যার জন্য সম্ভব); ২. আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের অধীনে উৎপাদন, বিতরণ ও জীবন যাপন ব্যবস্থার সংগঠন (যাকাত, সাদাকাত, সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য অনুসরণ এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত ব্যয় বর্জন যাতে সম্ভব হয়); এবং ৩. রিযিক, আয়-উপার্জন ও সম্পদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে ব্যয়নীতিতে ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা (যার ফলে বাঞ্ছনীয় মাত্রার তুলনায় অল্প ব্যয়ে কার্পণ্যের আচরণ সমর্থিত না হয় এবং অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে অপব্যয় ও ভ্রান্তিমূলক সম্পদ বিনাশ দেশ ও অর্থনীতির ক্ষতি সাধন করে)।

উপরোক্ত কাঠামোর যুক্তিতে আমরা বিশেষ করে অনুধাবন করতে পারি একটি মৌল কথা: ইসলামী জীবনদর্শনের অন্তর্গত হলো ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং সে নীতিমালা কাঠামোর শৃঙ্খলার অধীনে ক্রিয়াশীল হলো অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া (উদ্যোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা, বিতরণ ও ভোগ ব্যবস্থা, সম্পদ ও আয়-উপার্জনের ব্যয় ব্যবস্থা)। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকে যথাযথভাবে পরিচালিত না করলে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে ব্যয়নীতিকে কোনো যুক্তিবাদ দিয়ে মানবতার দিক থেকে ও সামগ্রিক কল্যাণের দিক থেকে পরিচালনা করা অবাস্তব প্রয়াস। সে কথা স্মরণ রেখেই এখানে ব্যয়নীতি সম্পর্কে লক্ষণীয় হলো: ১. অমিতচারী, অতিব্যয়ী ও অপচয়কারী (সর্বক্ষেত্রে সর্ব ব্যাপারে) প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ বিরোধী তাই শয়তানের ভাই; (আয়াত নং-২৭) এবং ২. ব্যয়ের হাতকে যে বেঁধে রাখে অথবা দিগন্ত প্রসারিত করে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক আচরণ নিন্দনীয় আর দৈন্য সৃষ্টিকারী (আয়াত নং-১৯)। একটা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরস্থিতির সুস্থতা ও সচ্ছলতা এবং তার কারণে মানুষের কর্মসংস্থান, আয়-উপার্জন ক্ষমতা, উৎপাদনের ও পণ্য সরবরাহের সন্তোষজনক অবস্থা, সাধারণ দ্রব্যমূল্য হার, সকল স্তরের মানুষের জীবন ধারণের স্থিতিশীলতা ইত্যাদি বহুবিধ পরিণতি নির্ভর করে আল্লাহ্ প্রদত্ত

www.nagorikpathagar.org

প্রাকৃতিক সম্পদকে আল্লাহ নির্দেশিত বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় ভোগ্য পণ্য, পুঁজিদ্রব্য যন্ত্র ইত্যাদি রূপে রূপান্তরিত করার ওপর, সে সবের বিতরণ ব্যবস্থাকে ন্যায় বিচার ভিত্তিক করার উপর যাতে আয়-উপার্জন হিসেবে সঙ্কীর্ণ তাৎপর্য রিযিক লাভ ও মানুষের জন্য ন্যায়ভিত্তিক হয় এবং সে রিযিক থেকে নিজের জন্য, পরিবারের সদস্যদের জন্য, প্রতিবেশী অভাবগ্রস্তদের জন্য, এমনকি অপরিচিত অভাবগ্রস্ত পথিকের বিশেষ অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ এভাবে সম্পদের ও আয়ের বণ্টন দিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণকে সার্বিকভাবে ন্যায় বিচারভিত্তিক করা সম্ভব হয়।

অর্থনৈতিক সামগ্রিক পদ্ধতিতে (Macro analysis) বা সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে কেইন্সীয় তত্ত্ববাদ প্রয়োগ করে বর্তমান কালে দেখানো হয়, সম্পদের বৃত্তাকার ঘূর্ণনের (circular flow) সাহায্যে উপার্জিত আয় থেকে আসে দুটি প্রক্রিয়া: ১. ব্যয় মাধ্যমে ভোগ এবং ২. সঞ্চয় এবং সঞ্চয় থেকে আসে পুঁজি বিনিয়োগ (Investment) আর পুঁজি সংগঠন (capital formation)। এখানেই ভারসাম্য (equilibrium) রক্ষার প্রয়োজন আছে। অর্জিত আয় থেকে সামান্য ব্যয় করে কৃপণের মতো বাঁচার জীবন যাপনকে দেশের মানুষ যদি অধিকাংশই গ্রহণ করে এবং অব্যবহৃত আয়কে স্বর্ণ-রৌপ্যের আকারে লুকিয়ে রেখেই তৃপ্তি লাভ করে, তাহলে সামগ্রিকভাবে এ পদ্ধতি সমাজের সকল মানুষের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সৃষ্টি করবে না। কারণ অব্যবহৃত গচ্ছিত গোপন আয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতে পুঁজি বিনিয়োগ এবং পুঁজি সংগঠনে সাহায্য করছে না। ফলে পূর্বেকার বিদ্যমান পুঁজি সংগঠন থেকে সামান্য পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ চলতে থাকবে এবং কালক্রমে সে ধারাটিও ধীরে ধীরে মরুপথে ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর মতো শুষ্ক হয়ে যাবে। দেশের অর্থনীতিই ভয়ঙ্কর পণ্য-দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে। তেমনি আবার আয়ের সব অংশই যদি মানুষ ভোগ্য পণ্য ও সেবা ক্রয় এবং ভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলে, উদ্বৃত্ত না রাখে, সঞ্চয় না করে, পুঁজি সংগঠনে এবং নতুন পণ্য উৎপাদন আর বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থার সংরক্ষণও না করে, সে ক্ষেত্রেও একই শোচনীয় পরিণতি আসবে। অর্থনীতির অবনতি মানুষকে দুর্ভোগ ও দুর্দশায় নিক্ষেপ করবে। সে জন্যই আল-কুরআন ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য নীতির ওপর জোর দিয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট মানব কল্যাণের ব্যবস্থাপনা রক্ষার উদ্দেশ্যে। তার জন্য ব্যক্তিগত আচরণ থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উপরোক্ত ভারসাম্য নীতির বাস্তবায়নকে সুনিশ্চিত করেছে।

এমনি ভারসাম্য নীতির বাস্তবায়নকে সুনিশ্চিত করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যে সকল মানুষ নিজস্ব ভ্রান্ত চেতনার অহংকারে ভারসাম্যের পথ বর্জন করে,

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে ইসলামী জীবন দর্শনের আদর্শবাদের যুক্তিতে সতর্ক করে দিলেও দুর্ভোগ-দুর্দশার পরিণতি ঘাড়ে এসে পড়ার আগে তারা আত্মবিশ্লেষণ করে না, অনুসৃত ভ্রান্ত নীতির মূল্যায়নও করে না আর নীতির যথাযথ সংশোধন বা সংস্কারও করে না। আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ববোধের ব্যবহার করে না বলেই তা করে না।

সে জন্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে (৩০নং আয়াতে), রিযিক তো প্রচুর পরিমাণ এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা তার সকল বান্দার জন্য। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে, আকাশে, বাতাসে অর্থাৎ সারা বিশ্ব সৃষ্টিতে। সে ব্যাপক পরিধির আল্লাহ প্রদত্ত দান বা উপাদান-উপকরণকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির সমন্বিত ও ভারসাম্যমূলক ব্যবহারের সাহায্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং যথাযথ মানব কল্যাণে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা বান্দাদেরই দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলেই অকল্যাণ সৃষ্টির পাপচক্রের হয় আবির্ভাব। যুদ্ধ-বিগ্রহ, উপনিবেশবাদ, আক্রমণ, অত্যাচার, রাষ্ট্র ও প্রকৃত সমাজের ভাঙা-গড়া, ভারসাম্যমূলক ও ন্যায়নীতি-ভিত্তিক রিযিক বা উপাদান-উপকরণের ব্যবস্থার হয় আমূল পরিবর্তন। তার প্রেক্ষিতে অর্থনীতিতে আসে বৈষম্য, শোষণ, অবিচার, মৌল সম্পদের দৈন্য, ব্যবস্থাপনার দৈন্য, উৎপন্ন দ্রব্যের (পুঁজি দ্রব্য ও ভোগ্য পণ্য দু'ই) দৈন্য, কর্মসংস্থানের স্বল্পতা ও আয়-উপার্জনের সংকীর্ণতা। তারই ফলে সৃষ্টি হয় ধনী দেশ ও দরিদ্র দেশ, উন্নত দেশ ও অনুন্নত দেশ এবং উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের মতো উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র দেশ আর অর্থনীতি। শেষোক্ত দেশ ও অর্থনীতির জন্য সৃষ্টি হয় বিপুল অভিশাপরূপী দৈন্য আর বেকারত্ব। সকল বান্দার জন্য প্রদত্ত সম্পদের ভিত্তিগত পরিস্থিতিতে ন্যায়সঙ্গত অবস্থান এ সকল দেশে এখন আর নেই। শোষক মানুষের অবিচার ও অন্যায় আচরণ এবং অন্যায় নীতি অনুসরণের জন্যই নেই। এমনি অমানবিকভাবে সৃষ্ট ভারসাম্যহীন দেশ ও সমাজের পরিস্থিতিতে বর্তমানকালে দৈন্য ও বেকারত্বের কাঠামোতে কিভাবে জনসংখ্যা সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ইসলামী বিধানকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে তাই হলো পরবর্তী ৩১ নং আয়াতের বিশ্লেষণের প্রধান তাৎপর্য।

প্রথমত, এ প্রসঙ্গে নীতিগতভাবে এ কথা বলা চলে যে, মানুষের আয়-উপার্জনের যে স্বাভাবিক অসাম্য বিদ্যমান (মানুষের স্বাভাবিক গুণাগুণ, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োগ কারণে) তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ শুভ, তাকে কৃত্রিমভাবে সমান করে দেয়ার নীতি ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের বিবেচ্য নয়। কট্টরপন্থী সমাজতন্ত্রবাদ সেদিকে চেষ্টা করে অকল্যাণ সৃষ্টিই প্রত্যক্ষ করেছে এবং সে পন্থা পরিত্যাগ করেছে - যেমন সোভিয়েত রাশিয়ার ও চীন দেশের সাম্প্রতিক আমূল পরিবর্তিত নীতিতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট

www.nagorikpathagar.org

(অতীতের শোষণ ও অবিচারের জন্য) অসাম্য ও দারিদ্র্য দূর করার ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

> আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সেই জাতি তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্রিয় হয়।

এ দায়িত্ব বর্তমানকালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে যথাসম্ভব পালন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যাকে উপরোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূরা আন'আমের ১৫১ নং আয়াতের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে তার আলোচনা রয়েছে। তবু সংক্ষিপ্ত যেটুকু পুনরুল্লেখ এখানে প্রয়োজন, তা হলো সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তাকে হত্যা করা যায় না এবং স্বামীর শুককীট স্ত্রীর ডিম্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান লাভ করে, তারপরে তাকে গর্ভপাতের মাধ্যমে নিঃশেষ করাকেই সন্তান হত্যা হিসেবে অপরাধ ও নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, আধুনিক পদ্ধতিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের নীতি অবলম্বনের ব্যাপারে আধুনিক ফকিহদের মধ্যে মতামতের বিভিন্নতা রয়েছে। অনেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া শরিয়াহ সঙ্গত বলেননি।[১] আবার অন্যরা সঙ্গত বলে ধরেছেন।[২] আবার দেখা যায়, ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ফিকাহ একাডেমীর কুয়েত বৈঠকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফকিহগণ মত প্রকাশ করেছেন, যে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ ইসলাম সম্মত।[৩]

চতুর্থত, সামগ্রিক প্রেক্ষিতে এবং জাতীয় আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে বর্তমানকালে অবস্থা বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, সম্পদের উদ্বৃত্ত আর জনসংখ্যার স্বল্পতা যে সব মুসলিম দেশে রয়েছে, সেখানে প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নয় বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উৎসাহ দান নীতি। দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতার এবং অতীতের উপনিবেশবাদী শোষণের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিতকরণ। তার জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে জন্মহার হ্রাস ইসলামী বিধান মতে সঙ্গত বলে অভিমতকেই সমর্থন করা যায়। তাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করে জাতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রমের অন্তর্গত করাই যুক্তিযুক্ত। জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর অপব্যবহার করে সামাজিক দুর্নীতি ও বিবাহ বহির্ভূত যৌন স্বেচ্ছাচারের সুযোগ দিয়ে যেন অকল্যাণ সৃষ্টি না করা হয়, সেদিকে পূর্ণ সচেতনতাসহ মনোযোগ এবং কর্মপন্থা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন।[৪]

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

১. এ আলিমদের মধ্যে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – ইসলাম ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ।

২. এঁদের মধ্যে ইউসুফ আল কারযাভী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রকাশিত ইসলামে হালাল হারামের বিধান), হাম্মুদাহ্ আবদুল আতী (The Family Structure in Islam, Published by American Trust Publications (USA) উল্লেখযোগ্য।

৩. দৈনিক ইনকিলাব ১৮/১২/৮৮ ইং তারিখে প্রকাশিত খবর।

৪. Prof. Raihan Sharif, Islamic Economy: Concept of Rizq, Islamic Foundation Bangladesh, Publication 1986 (Vide chap. pp. 66-67, esp) population discouragement (and hence reliance on fertility control) has in such cases to be integrated into the strategies of socio-economic department.

www.nagorikpathagar.org

সমুদ্রে যোগাযোগ ও আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ط إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালনা করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার। তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা বনী ইসরাইল: আয়াত ৬৬)

আয়াতের প্রেক্ষিত

এ আয়াতের প্রেক্ষিত বুঝতে হলে এ রুকুর প্রাথমিক কথাগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। তাতে বলা হয়েছে যে, ইবলিস সৃষ্টির প্রথম দিন হতে মানব সন্তানের পেছনে লেগে আছে। সে তাদেরকে নানাবিধ আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অভিলাষ ও মিথ্যা ওয়াদা এবং প্রতিশ্রুতির কুঞ্জজালে বেঁধে সর্বদা নির্ভুল পথ হতে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে আসছে। সে প্রমাণ করতে চায় যে, মানুষ আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার যোগ্য নয়। এ বিপদ হতে মানুষকে যদি কোনো জিনিস উদ্ধার করতে পারে তবে তা শুধু এই যে, মানুষ তার রবের বন্দেগীর উপর অবিচল থাকবে। হেদায়াত ও সাহায্যের জন্য কেবল তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এতদ্ব্যতীত আর যে পথই মানুষ গ্রহণ করবে, শয়তানের ফাঁকি ও ধোঁকা হতে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। এ আলোচনা হতে এ কথা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, সব লোক তওহিদের দাওয়াতকে অস্বীকার ও প্রত্যাখান করে আর শিরক-এর উপর অবিচল থাকে, তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস সাধনে নিয়োজিত। এ সম্পর্কের কারণেই এখানে তওহিদকে প্রমাণিত ও শিরককে বাতিল করা হয়েছে। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল, ৮২ নং টীকা)

তাৎপর্য

এ আয়াতে সামুদ্রিক সফরের সাহায্যে যেসব অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফায়দা লাভ সম্ভব, সে দিকে ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহর দেয়া যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্কে আল- কুরআনে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। আল্লাহ পশুসম্পদ সৃষ্টি করেছেন, যা ভার বহনে ও যোগাযোগে সহায়তা দান করে থাকে। আজও অনেক উচ্চ স্থানে, বনে-জঙ্গলে ও মরুভূমিতে পশু যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে (সূরা নাহলের আয়াত নং ৫ থেকে ৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এ আয়াতে ও এ সূরারই ৭০ নং আয়াতে নৌযানের গুরুত্ব বোঝা যায়। বিশাল সমুদ্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলভাগকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নৌযানের মাধ্যমে এ সবের মধ্যে যোগাযোগ সংস্থাপন করা হয়। তেমনিভাবে মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদ আহরণে নৌযানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এ আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহর অনুগ্রহ সমুদ্র ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এসব অনুসন্ধান করা মানুষের দায়িত্ব। অনুগ্রহ বলতে অনেক কিছু বোঝাতে পারে। প্রথমত, এর দ্বারা আল্লাহর দেয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ বোঝানো যেতে পারে, যা আহরণ-অর্জন করে মানবজাতির প্রয়োজন মেটানো যায় এবং তাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা যায়। এর দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যে জ্ঞানভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে (যা মানুষের কল্যাণকর), তা অর্জন করাও বোঝানো যায়।

এ আয়াতে এই ইশারাও পাওয়া যায় যে, সমুদ্রে সম্পদ আহরণে সব জাতির অধিকার রয়েছে। সে জন্য সমুদ্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে না রেখে আন্তর্জাতিক থাকাই সঙ্গত মনে হয়।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর আনুগত্য প্রসঙ্গে

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً ط وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ * وَتَقَطَّعُوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ إِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ *

তোমাদের এই উম্মত প্রকৃতপক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমার এবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে - সকলকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (সূরা আম্বিয়া: আয়াত ৯২-৯৩)

তাফসীরকারদের আলোচনা

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তার তাফসীরে লিখেছেনঃ 'তোমরা আমার এবাদত কর' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সমস্ত মানুষকে। বক্তব্য এই যে - হে মানুষ! তোমরা সকলেই আসলে এক উম্মত ও একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। দুনিয়ায় যত নবী-রাসূলই এসেছেন, তাঁরা সকলে একই দীন নিয়ে এসেছিলেন। আর সেই আসল দীন এই ছিল যে, একমাত্র আল্লাহই মানুষের রব এবং কেবল এক আল্লাহর পূজা-উপাসনা ও এবাদত-আরাধনা করা আবশ্যক। উভয়কালে যত ধর্মমতই আবির্ভূত হয়েছে, তা এই মূল দীনকে ঠিক করে, রদ-বদল করে তৈরি করা হয়েছে। একজন মূল দীন হতে একাংশ গ্রহণ করে তার সঙ্গে নিজের পক্ষ হতে আরো অনেক জিনিস যোগ করে এক নতুন ধর্মমতের রূপ দিয়েছে। এভাবে অসংখ্য মিল্লাত গড়ে উঠেছে। এখন একথা বলা হয় যে, অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। মানব সমাজে এমন বহু ধর্ম ও বহু মিল্লাতের বিভেদ নবী-রাসূলগণ সৃষ্টি করেছেন বলা সম্পূর্ণ ভুল কথা। বিভিন্ন মিল্লাতের লোকেরা নিজেদেরকে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশের নবীর প্রবর্তিত ধর্ম প্রচার করছে বলেই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, ধর্ম ও মিল্লাতের এ পার্থক্য নবী-রাসূলগণই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসূলগণ দশ রকমের ধর্ম প্রচার করেননি এবং এক আল্লাহ ছাড়া অপর কারো বন্দেগী করার দাওয়াত বা শিক্ষা দেননি। (তাফহীমূল কুরআন, সূরা আম্বিয়ার তাফসীর নং ৯১)।

www.nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ দুই আয়াতে অর্থনৈতিক তাৎপর্যের প্রত্যক্ষ কোনো কথা নেই। তবে পরোক্ষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। প্রতমত, এবাদত একমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে। এবাদতের অর্থ হচ্ছে আনুগত্য অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। এ আনুগত্য কেবল নৈতিক ও সামাজিক জীবনে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর দীনকে বা আল্লাহর নির্দেশকে টুকরো টুকরো করার কোনো অধিকার কারো নেই, অর্থাৎ এ কথা বলা অবৈধ যে, আল্লাহর এক নির্দেশ মানবো এবং অন্য নির্দেশ মানবো না। আল্লাহর নির্দেশ সর্বক্ষেত্রেই মানতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যেখানে যেখানে আল্লাহর নির্দেশ আছে, সেগুলোর সবটুকুই মানতে হবে। তৃতীয়ত, আল্লাহ হচ্ছেন রব অর্থাৎ প্রকৃত পালনকর্তা। অন্যেরা নিমিত্ত মাত্র। আল্লাহই প্রকৃত স্রষ্টা - মানুষের এবং সম্পদের। সুতরাং সে রবের নির্দেশের ভিত্তিতেই সব চলা উচিত এবং তাঁরই শুকরিয়া করা উচিত।

আলোচ্য আয়াতে আরো দু'টো বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, তোমাদের উম্মত একই উম্মত এবং আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। সবাই মিলে একই উম্মত হওয়ার ধারণা ব্যাপক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। দুনিয়া, সমগ্র মানুষ এবং তথাকথিত জাতিগুলো এক জোড়া মানব-মানবী থেকে উদ্ভূত। ফলে সকল জাতি মিলে দুনিয়ার সম্পদ সমভাবে ভাগ করে ভোগ ব্যবহার করার ধারণা অপ্রাসঙ্গিক নয়। দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ এমনভাবে গঠিত এবং সম্পদপূর্ণ, যেন পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ একটি বিশ্বজননী অর্থনীতির ধারণা করা সম্ভব, যা ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কোনো ধর্ম বা তন্ত্র নেই। সব দীন বা তন্ত্রই জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছে। কিন্তু ইসলাম জীবনের সবগুলো দিককে নির্দেশ করে একটি সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করেছে। এই অবস্থায় অর্থনীতি, দর্শন ও রাষ্ট্রনীতি নৈতিক নীতিমালার উপর নির্ভরশীল।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ *

তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি যমিনে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, যাবতীয় ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং যাবতীয় অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণাম আল্লাহর হাতে। (সূরা হাজ্জ: আয়াত ৪১)

বিশেষ শব্দের অর্থ

মা'রুফ (معروف) মূল ধাতু معروف عرفان، معرفة عرف অর্থ পরিচিত, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, সৎকর্ম ইত্যাদি (আল-মুনজিদ ও মিসবাহ)। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ন্যায়, সৎ ও উৎকৃষ্ট বলে পরিচিত কর্ম বা বিষয়কে معروف বলে।

মুনকারের (منكر) মূল ধাতু نكر । نكرة অর্থ অস্বীকার, অপরিচিত, অজানা, ঘৃণা ইত্যাদি। পরিভাষায় গৃহীত ও নিষিদ্ধ কর্ম এবং বিষয়কে (منكر) বলা হয়। অর্থাৎ যাবতীয় অকল্যাণকর ও অসৎ কর্ম 'মুনকার'-এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রেক্ষিত

৩৯ নং আয়াত হতে সূরা হজ্জের ষষ্ঠ রুকু শুরু হয়েছে। রুকুর শুরুতে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এটি ছিল মদিনায় হিজরতের পর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সর্বপ্রথম অনুমতি। বলা হয়েছে যে, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং যাদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো। তারপর যুদ্ধ সংক্রান্ত আল্লাহর একটি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ এক দল দ্বারা অন্য দলের প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করতেন তাহলে মসজিদ, গির্জা, উপাসনালয় - যাতে আল্লাহর নাম লওয়া হয়, তা সবই চুরমার করে দেয়া হতো। যুদ্ধ সংগঠনের এই কারণেই পূর্ববর্তী সব নবী ও উম্মতকে কাফিরদের

www.nagorikpathagar.org

মোকাবিলা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এরূপ না করা হলে কোনো মাযহাব ও ধর্মেরই অস্তিত্ব থাকত না। ইতোমধ্যে হিজরতের পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মদিনা সনদের মাধ্যমে কার্যত মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই ভিত্তিকে আরো সংহত এবং যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করার সুযোগ দানের জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করার অনুমতিও দেয়া হল। এখন ইসলামী রাষ্ট্রের কী দায়িত্ব হবে তার উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। আর তাই দেখা যাচ্ছে ৪১নং আয়াতে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তাফসীরবিদদের আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) লিখেছেনঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদিনায় হিজরতে অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসসমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত ওসমান গনী (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার এই ইরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। খুলাফায়ে রাশিদীন ও মুহাজিরগণ এ আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুররূপ তাঁদের কর্ম ও স্কীতি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। যাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন। এ কারণেই আলিমগণ বলেন, এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খুলাফায়ে রাশিদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তা সত্য, সঠিক, আল্লাহর ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল। (রূহুল মা'আনী)।

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল ভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহুল্য, কুরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোনো বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে যায়। এ কারণেই তাফসীরবিদ দাহহাক বলেনঃ এ আয়াতে তাদের জন্যই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কাজ আঞ্জাম দেয়া উচিত, যেগুলো খুলাফায়ে রাশিদীন তাদের যামানায় আঞ্জাম দিয়েছিলেন (কুরতুবী)। (মুফতী শফী (র), তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ষষ্ঠ খণ্ড, সূরা হজ্জের তাফসীর অংশ থেকে)।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, তাঁর (আল্লাহর) সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভের অধিকারী লোকের গুণাবলী এই যে, তাদেরকে দুনিয়ায় শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করা হলে তাদের ব্যক্তিগত

www.nagorikpathagar.org

চরিত্র আল্লাহ-দ্রোহিতা ও নাফরমানীর এবং অহংকার ও গৌরবের পরিবর্তে এই হবে যে, তারা সালাত কায়েম করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাদের ধন-সম্পদ বিলাসিতা, জাঁকজমক ও নফসের দাসত্বের কাজে ব্যয় হওয়ার পরিবর্তে যাকাত দানের কাজে ব্যয় হবে, তাদের সরকার যাবতীয় ন্যায় কাজকে দমন করার পরিবর্তে তাকে বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত হবে। তাদের ক্ষমতা অন্যায় ও পাপকে বিস্তার করার পরিবর্তে তাকে দমন করার কাজে ব্যবহৃত হবে। বস্তুত এই একটি বাক্যে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার কর্মধারা ও কর্মচারীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল কথা বলে দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র মূলত কি ধরনের রাষ্ট্র, তা কেউ বুঝতে চাইলে এই একটি আয়াত হতেই বুঝতে পারে। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা হজ্জের ৮৫ নং টিকা)।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে এ আয়াতে মূলনীতি, দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে যাকাত কায়েম করা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থে পূর্বেই করা হয়েছে। অন্যদিকে এ আয়াতে 'মারূফের প্রতিষ্ঠা' ও 'মুনকারকে' নির্মূল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'মারূফ' বা সুনীতি এবং 'মুনকার' বা দুর্নীতি শব্দ দু'টির ব্যাপক নৈতিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'আমরু বিল মারূফের' সঠিক প্রয়োগের অর্থ হবে সর্ববিধ উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং 'নাহি আনিল মুনকার'-এর তাৎপর্য অর্থনৈতিক অবিচারের সব উপায় ও পন্থা বন্ধ করা। অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েম ও জুলুমের অবসানের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব আইন তৈরি করতে পারে এবং তার প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা কুরআনের এ আয়াতে ইসলামী সরকারকে দান করা হয়েছে। অবশ্য কি ধরনের পন্তা ও উপায়ে জুলুম গণ্য করা হবে তা নির্ভর করবে ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের উপর। এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইসলামী সরকার সব ধরনের মুনাফাখোরী, মওজুদদারী, কার্টেল, মনোপলি ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় শরিয়াহ ও ইসলামী আইনের লক্ষ্য সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের মতামত উল্লখ করা হলো।

'আল্লাহ্ তা'আলার সব নবী পাঠানো ও কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, যা গোটা সৃষ্টির মূলনীতি। আল্লাহর নাযিল করা প্রতিটি বিষয় এ কথা প্রমাণ করে যে, এসবের সত্যিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য ও ইনসাফ এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। আমরা তাই ন্যায়সঙ্গত সরকারি নীতি ও আইনকে শরিয়তের অংশ মনে করি, শরিয়তের বরখেলাফ হওয়া মনে করি না। এসবকে রাজনৈতিক নীতি বলা কেবল পরিভাষার ব্যাপার। আসলে এগুলো শরিয়তেরই অংশ। তবে শর্ত এই যে, এগুলোকে

www.nagorikpathagar.org

ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। (ইলাম আল মুআক্কিন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯-১১)।

ইবনুল কাইয়্যেমের ভাষ্য অনুযায়ী ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের প্রতিটি বিভাগে ইনসাফ কায়েম করা। আলোচ্য আয়াতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করার বিষয়টি ইসলামী সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিভাবে ইনসাফকে বাস্তবায়ন করা হবে, তা বিস্তৃত নীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের ব্যাপার। এই বিস্তৃত নীতিমালার পরিধি হিসেবে বলে দেয়া হচ্ছে যাবতীয় সৎ, সাবলীল ও উত্তম পদ্ধতি ও কর্মসমূহ সর্বোত্তম পন্থায় প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বপ্রকার না-হক, অসৎ, বাতিল ও বে-ইনসাফী, জুলুম, অপচয় ইত্যাদি উৎখাত ও বর্জন করা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'মারূফ' প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে যাকাতের উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

এ আয়াতে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাও নিহিত রয়েছে বলা যায়। একটি কল্যাণ রাষ্ট্র সংগঠনে শুধু অর্থনৈতিক নীতি যথেষ্ট নয়। এ জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের আনুকূল্য। সালাত কায়েমের কথা বলে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মানবতার জন্য সাক্ষী

وَجَاهِدُوْا فِيْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ
حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ
الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ص فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا
الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ *

আল্লাহর পথে জিহাদ কর - যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাঁর দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সঙ্কীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ্ পূর্বেও তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন। যা এ কুরআনেও তোমাদের এই নাম। যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকের জন্য। অতএব নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মাওলা-মনিব। তিনি বড়ই উত্তম মাওলা - বড়ই উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা আল হাজ্জ: আয়াত ৭৮)

সাধারণ তাৎপর্য

পূর্বের ৭৭ নং আয়াতে ঈমানদারদের সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ ৭৮ নং আয়াতের নির্দেশসমূহও ঈমানদারদের লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে। আয়াতের সাধারণ তাৎপর্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহর নামে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। কেননা আল্লাহ্ মুসলিম জাতিকে তার কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আল্লাহর কাজ হচ্ছে সারা বিশ্বে আল্লাহর বাস্তব সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ সবাই যেন বাস্তবে আল্লাহর আনুগত্য করে - এটাই হচ্ছে মুসলিমদের মিশন। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ দীনের মধ্যে অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। মুসলমানদেরকে

www.nagorikpathagar.org

ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে বলা হয়েছে। কেননা ইবরাহীমের দাওয়াত ও মিশন ইসলাম থেকে ভিন্ন ছিল না।

এখান মুসলিম জনগণকে সমগ্র মানবতার জন্য সাক্ষী হতে বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মুসলমানদেরকে সমগ্র মানবতার নিকট ইসলাম পৌঁছে দিতে হবে এবং সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ আয়াতে আল্লাহকে শক্তভাবে ধরার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, হিদায়াত কেবল আল্লাহর নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে, কেবল তাকেই ভয় করতে হবে, কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। অন্য সব আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের অধীন হবে।

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

'দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আল্লাহ চাপিয়ে দেননি' - এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফহীমূল কুরআনে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন, 'তোমাদের যিন্দেগীকে সে সমস্ত অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় বাধা-বন্ধন হতে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যা অতীত উম্মতের উপর তাদের আইনবিদ, পীর, আলিম ও পোপেরা চাপিয়ে দিয়েছিল। এখানে চিন্তা-গবেষণার উপর এমন কোনো বাধানিষেধ আরোপ করা হয়নি যা তাত্ত্বিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। আবার বাস্তব কর্মজীবনেও এমন বিধিনিষেধের পাহাড় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়নি যা সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়। এক সহজ-সরল আকিদা ও আইন বিধানই তোমাদের দেয়া হয়েছে। এটি নিয়ে তোমরা যতদূর অগ্রসর হতে চাও অনায়াসেই হতে পার।' এ কথাটিই অন্য সূরায় এভাবে বলা হয়েছেঃ

এ রাসূল তাদেরকে চেনা জানা নেক কাজের আদেশ করেন এবং সে সব খারাপ কাজ হতে বিরত রাখেন যা মানুষেরা প্রকৃতই খারাপ মনে করে। আর সেসব জিনিস হালাল করেন যা পাক ও পবিত্র এবং হারাম করেন সে সব জিনিস যা খারাপ। আর তাদের উপর হতে সে সব দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দেন, যা তাদের উপর চাপানো ছিল। সেই জিঞ্জিরগুলো খুলে ফেলেন যাতে তারা বন্দী ছিল। (সূরা আ'রাফ: আয়াত ১৫৭; তাফহীমুল কুরআন, সূরা হাজ্জ, ১৩০ নং টীকা)।

মুফতী মুহাম্মদ শফী উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ 'ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নেই' এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এ ধর্মে এমন কোনো গোনাহ নেই, যা তাওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার কোনা উপায় হতে পারে না। ... কেউ কেউ বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এ ধর্মে এরকম কোনো বিধান নেই। (মুফতী মুহাম্মদ শফী, সূরা হজ্বের ৭৮ নং আয়াতের তাফসীর হতে)।

www.nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ আয়াতের অর্থনৈতিক তাৎপর্যবহ একটি কথা হচ্ছে - আল্লাহ্ পাক দীনের ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। দীন এর অন্যতম অর্থ হচ্ছে জীবন ব্যবস্থা। এ অর্থই এখানে যথাযথভাবে প্রযোজ্য। অন্য কথায়, আল্লাহ বলেন যে, মানুষ তার জীবনের কাজ-কর্মে অপ্রয়োজনীয় সংকীর্ণতা সৃষ্টি করুক বা বোঝা বহন করুক - যদি তা করা হয় তাহলে তা আল্লাহর মর্জি কার্যকর করা হবে না এবং আল্লাহর মর্জির বিপরীত কাজ করা হবে। এ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, অর্থনৈতিক জীবনেও তা রাষ্ট্রীয় হোক, কি ব্যক্তিগত - অহেতুক সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা ইসলামসম্মত কাজ হবে না; বরং তার বিপরীত হবে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্র যদি প্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-নিষেধ আরোপ করে, বিধি-নিষেধ প্রয়োগে যদি কঠোরতা দেখায়, অপ্রয়োজনীয়, অযথা জনগণের সাধ্যাতীত কর ধার্য করে, শিল্প উৎপাদন ও বাণিজ্যে যদি অহেতুক ও সমাজের উন্নতির পরিপন্থী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তা ইসলামের বিপরীত কাজ হবে। মূলকথা হলো - কঠোরতা পরিহার ও সহজতা অবলম্বন। এটাই ইসলামের অন্যতম প্রধান মুলনীতি, যার প্রয়োগ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠোরতা চান না'। উল্লিখিত আয়াতে মানব জাতির জন্য মুসলিমদের সাক্ষ্য হওয়ার মধ্যে এ তাৎপর্যও অন্তর্ভুক্ত যে, ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালা পৃথিবীকে জানানো, সবখানে ছড়িয়ে দেয়া এবং তা কায়েম করাও মুসলিমদের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য এ আয়াতে যাকাত দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ ও নিয়ামত প্রসঙ্গে

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ ص وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ *
فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا
تَاْكُلُوْنَ * وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ * وَاِنَّ
لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ
وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ * وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ *

আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর আমি তা ভূ-ভাগে সংরক্ষিত রেখেছি এবং আমি তা অপসারণ করলেও করতে পারি। আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় আছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্য থেকে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর এবং তাদের পিঠ ও জলযানে আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক। (সূরা মু'মিনুন: আয়াত ১৮-২২)

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) লিখেছেন, মানুষের জীবনধারণের জন্য যেসব জিনিস অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আযাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশী বর্ষিত হলে প্লাবন এসে যায়। ফলে আযাব নেমে আসে। তাই সবকিছু بِقَدَرٍ অর্থাৎ পরিমিতভাবে হয়।

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর আল্লাহ বলেন, أَسْكَنَّهُ فِى الْأَرْضِ অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে তা সংরক্ষণ করেছি। প্রাত্যহিক জীবনে যেভাবে যে স্থানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যেন পেতে পারে, সে জন্য পানির বিরাট অংশকে পাহাড়ের শৃঙ্গে বরফ হিসেবে রেখে দিয়েছি।

অতঃপর আরবের রুচি অনুযায়ী কিছুসংখ্যক ফল-মূল যেমন আঙ্গুর, খেজুর, জলপাই ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। চতুষ্পদ জন্তুর দুধ, গোশত, লোম, অস্থি মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে উল্লেখ করে উপকারের বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। মানুষ জন্তু-জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করে এবং মাল পরিবহণের কাজেও নিযুক্ত করে। অতঃপর নৌকা ও চাকার মাধ্যমে চলে এমন যানবাহনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। (মা'আরেফুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৬)।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আয়াত ক'টিতে আল্লাহর দেয়া সম্পদ ও নিয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বৃষ্টির সাহায্যে পৃথিবীকে জীবিত করেন এবং খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর এক বিরাট এলাকার অর্থনীতিতে খেজুর খাদ্য ও ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের কোনো কোনো অংশের কথা বলা যায়। আল্লাহ তা'আলা জলপাই উৎপাদনের কথা বলেছেন, যা তেল হিসেবে এমনকি সবজি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কুরআনের অন্যান্য স্থানে অন্যান্য শস্যের উল্লেখ রয়েছে এবং এ সবই আল্লাহর দেয়া সম্পদ। আয়াতসমূহে এরপর চতুষ্পদ জন্তুসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে কোনো কোনোটির দুধ মানুষ পান করে থাকে। এসব জন্তু থেকে মানুষ অন্যান্য অনেক উপকারিতা পেয়ে থাকে। এসব পশুর মধ্যে অনেক পশুর গোশত মানুষ খেয়ে থাকে। সেগুলোর চামড়াও মানুষের কাজে লাগে। কিছু কিছু পশু ভারবাহী জন্তু ও যান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সবই আল্লাহর দেয়া নিয়ামত ও সম্পদ।

এছাড়া এসব আয়াতে আল্লাহ পাক জলযানের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহরই দেয়া গাছের কাঠ দিয়ে মানুষ এসব নৌকা তৈরি করে। আধুনিক যুগে মানুষ ইস্পাত দিয়ে বড় বড় জাহাজ তৈরি করছে। তাও আল্লাহর দেয়া আকরিক লৌহ দিয়ে। মানুষ তার পরিশ্রম দিয়ে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসব যান তৈরি করছে। এসবও সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। মূলত মূল প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রযুক্তিগত সম্পদ মানের দিক দিয়ে একই রকম।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে

اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا *

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন না; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (সূরা ফুরকান: আয়াত ২)

শব্দের তাৎপর্য

ملك শব্দের অর্থ সার্বভৌমত্ব, শাসন ক্ষমতার মহত্ত্ব, আইন বিধান তৈরির অধিকার, বাদশাহী, সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

তাফসীর

তাফসীরে এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উদ্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। (মা'আরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর হতে)।

তাফসীরকারদের আলোচনা

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেনঃ তিনি (আল্লাহ্) কাউকেও পালক পুত্র বানাননি। বিশ্বলোকে এমন কেউ নেই, আল্লাহর সঙ্গে যার বংশীয় কিংবা পালকপুত্র হওয়ার সম্পর্কের কারণে তার মাবুদ হওয়ার অধিকার অর্জিত হবে। তাঁর সত্তা এক ও একক মাত্র। কেউ তাঁর সমজাতীয় বা সমপ্রজাতীয়ও নয়। খোদায়ী বংশ বলে কিছু নেই, আল্লাহর কোনো বংশের ধারাও চালু হয়নি। যারা বহু ফেরেশতা, জ্বিন কিংবা কোনো মানুষকে আল্লাহর বংশধর বা সন্তান মনে করে নিয়েছে আর এ কারণে তাদেরকে দেবতা ও মাবুদরূপে গ্রহণ করেছে, তারা সকলেই পুরোপুরি জাহিল, পথভ্রষ্ট।

www.nagorikpathagar.org

অনুরূপভাবে তারাও সুস্পষ্ট মূর্খ ও গোমরাহীতে নিমজ্জিত, যারা বংশীয় সম্পদের কারণে না হলেও কোনো বিশেষ ধরনের বিশেষত্বের ভিত্তিতে মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তিকে নিজের পুত্র বানিয়েছেন। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফুরকানের ৬নং টীকা)।

'মূলক' শব্দটি আরবি ভাষায় বাদশাহী, সার্বভৌমত্ব ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সমগ্র বিশ্বলোকের অধিকারী; প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী - তথা ক্ষমতা, এখতিয়ারে অপর কারো একবিন্দু পরিমাণ অংশও নেই। (তাফহীমূল কুরআন, সূরা আল-ফুরকান)।

আর্থ সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতের কোনো সরাসরি অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে বলা যায় না। কিন্তু এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মানবজাতির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়মনীতি নির্ধারণ করার অধিকার একামত্র আল্লাহ্ তা'আলার। কেননা তিনিই একমাত্র সার্বভৌম শক্তি। সার্বভৌম শক্তিরই এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি মানব জাতির জন্য মৌলিক নীতি, আদর্শ ও আইন দেবেন। বাস্তবেও আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সার্বভৌম শক্তি হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ বা আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব শক্তিরই নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদের পক্ষে চিরন্তন ও সবার জন্য কল্যাণকর নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এ জন্য ইসলামে মূল আইন আল্লাহপাক দিয়েছেন। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে এ মূল আইন ও নীতিমালাকে কার্যকর করা। অবশ্য মানুষ ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তিত সময়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মূল আইনের অতিরিক্ত আইন ও মূল আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারে। সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ক নীতি নির্ধারণে এ আয়াত থেকে গ্রহণীয় আছে।

www.nagorikpathagar.org

বিয়ে প্রসঙ্গে

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ط وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ـ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ط
وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ط وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, তাদের বিয়ে সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সম্পদশালী করে দেবেন, আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে সম্পদশালী না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মাঝে কল্যাণের সন্ধান পাও। আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদের দান করবে। তোমাদের দাসীরা সতিত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাদের ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না, আর যে তাদের বাধ্য করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ওপর জবরদস্তির পরে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আন-নূর: আয়াত ৩২-৩৩)

বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা

ايامى এক বচনে ايم অর্থ জুড়িহীন, (লিসানুল আরব) নারী ও পুরুষ উভয়ের বেলায় ব্যবহৃত وليستعفف, মূল ধাতু عفة পবিত্রতা, অনাবিলতা, নিষ্কলুষতা। উক্ত শব্দের অর্থ পবিত্রতা অর্জন করার প্রচেষ্টা।

www.nagorikpathagar.org

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেছেনঃ وانكحوا الايامى منكم অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী যার বিয়ে বর্তমান নেই। আসলেই বিয়ে না করার কারণে হোক কিংবা বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীর বিয়ে সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদের আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিয়ে নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোনো পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিয়ের মাসনূন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিয়ে তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে - এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাবারও সমূহ আশঙ্কা থাকে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদিসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিয়ে নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেয়া হয়েছে। তবে ইমাম আযমের মতে, এরূপ বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে।

যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্ম-কর্মের হিফাযতের জন্য বিয়ে করতে ইচ্ছুক কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হিফাযত ও সুন্নাতে রাসূলের ইতাআত করার সদুদ্দেশ্যে বিয়ে করবে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন। (মা'আরেফুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, উক্ত আয়াতদ্বয়ের তাফসীর)।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাফহীমুল কুরআনে লিখেছেন ঃ

ايامى বহু বচন। একবচনে ايم এর অর্থ জুড়িহীন। সাধারণত ايم বলতে বিধবাকে বোঝানো হয়ে থাকে। বস্তুত এর অর্থ স্বামী বা স্ত্রীহীন নারী বা পুরুষ। (সূরা নূরের ৫০ নং টীকা)।

اَنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ এর প্রকৃত অর্থ এই নয় যে, যারই বিয়ে সম্পন্ন হবে তাকেই আল্লাহ অনেক ধন-সম্পদ দান করবেন। বরং এর বক্তব্য এই যে, এ ব্যাপারে লোকেরা যেন খুব বড় হিসেবি হয়ে না দাঁড়ায়। এতে কন্যা পক্ষের প্রতি হিদায়াত হল কোনো ভালো স্বভাবচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি যদি তাদের ঘরে বিয়ের পয়গাম পাঠায় তবে কেবল তার দরিদ্র অবস্থা দেখেই যেন প্রত্যাখ্যান না করে। আর ছেলেমেয়ের প্রতি হিদায়াত হল - ছেলে এখনো খুব বেশী কামাই-রোজগার করছে না বলে তাকে যেন অবিবাহিত না রাখা হয়। মোটকথা, অধিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের আশায় বিয়ে-শাদীর ব্যাপারটাকে মূলতবী রাখা উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায়, শুধু বিয়ের কারণেই মানুষের আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে থাকে। দায়িত্ব মাথার ওপর এসে গেলে মানুষ

www.nagorikpathagar.org

স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অধিক পরিশ্রম করতে এবং আয় বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হয়। রুজি-রোজগারের ব্যাপারে স্ত্রীও সহযোগিতা করতে পারে এবং ব্যয় কাজটা তার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক সময় ভালো অবস্থাও খারাপ হতে পারে। খারাপ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে ভালো হতে পারে। (সূরা নূরের ৫৩ নং টীকা)।

ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিতঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করতে পারে, তার তা অবশ্যই করা উচিত। কেননা বিয়ে খারাপ দৃষ্টি থেকে আত্মাকে রক্ষা করার এবং পবিত্রতা রক্ষার বড় উপায়। আর যে তার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার যৌন প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখে।' (সূরা নূরের ৫৪ নং টীকা)।

বিয়ের অভিভাবকত্ব

উপরোক্ত আয়াতে দেখা যায় যে, অভিভাবকদের মাধ্যমে বিয়ে সম্পাদন করাই যথার্থ ইসলামী পন্থা। এ সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে সব ইমামই একমত যে, বিয়েতে বয়স্ক নারীর মতামত থাকতে হবে। বুখারি ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ পূর্বে বিবাহিত এমন জুড়িহীন ছেলেমেয়েদের বিবাহ হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে এবং পূর্বে অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ে হতে পারে না যতক্ষণ না তাদের স্পষ্ট অনুমতি পাওয়া যাবে।

তবে বিয়েতে অভিভাবকদের সম্মতি বাধ্যতামূলক কিনা - এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদের মত হচ্ছে যে, কেবল মেয়ের অনুমতিতেই বিয়ে হতে পারে না, অভিভাবকদের অনুমতি লাগবে। ইমাম আবু হানীফা (র), যুফার, শাবী ও জুহরীর মত হচ্ছে যদি একজন নারী তার ওলী ছাড়াই বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলে এবং তা কুফু (বিয়েতে পাত্র ও পাত্রীর সমতা) অনুযায়ী সম্পন্ন হয় তবে তা জায়েয হবে। (ইবন রুশদ, বাদিয়াতুল মুজতাহিদ, দ্বিতীয় খণ্ড)।

এ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম মতবিরোধের মীমাংসা পর্যায়ে লিখেছেন, ওলীর মতে ও ছেলেমেয়েদের মতে বিয়ের ব্যাপারে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তখন ওলীর মতের উপর ছেলেমেয়ের মতেরই প্রাধান্য দেয়া যুক্তিযুক্ত যদি তা ভালো পাত্র বা পাত্রীর সঙ্গে হতে দেখা যায়। কেননা বিয়ে হচ্ছে তার, ওলীর নয়। আর বিয়ের বন্ধনজনিত যাবতীয় দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয়, ওলীকে নয়। সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াত থেকেও তা প্রমাণিত হয়ঃ

তাদের ইদ্দত পূর্ণ হলে পরে তাদের নিজদের সম্পর্কে শরিয়ত মুতাবিক ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যে সিদ্ধান্তই তারা গ্রহণ করুক তাতে তোমাদের (ওলীদের) কোনো দায়িত্ব নেই। (মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন)।

www.nagorikpathagar.org

এখানে কুরআনের অন্য অনেক আয়াতের মতো যারা অসহায় বা অসুবিধায় আছে তাদের সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে - যারা মুক্তির প্রয়াসী তাদের আর্থিক সাহায্য কর। এ নীতি সব স্থানেই এবং সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে।

পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করার মধ্যে তাৎপর্য রয়েছে যে, ইসলাম সব পেশাকে বৈধ মনে করে না। মানবতার জন্য অকল্যাণকর কোনো পেশাই ইসলামের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজে বর্তমানের কিছু কিছু পেশা হয়তো থাকবে না। অবশ্য তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট যুগের ইসলামী পণ্ডিতদের পরামর্শের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের উপর।

[এ আয়াতের ইশারা যদিও বিবাহিতা নারীদের ব্যাপারে, তথাপি একই নীতি অবিবাহিত নারী ও পাত্রের জন্য প্রযোজ্য হতে কোনো বাধা নেই। (গ্রন্থাকার)]

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ই রিযিকদাতা

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ط هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ صلے فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ *

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছো? (সূরা ফাতির: আয়াত ৩)

শব্দার্থ

فانى تؤفكون এর দুটো অর্থ: ১. তোমরা কোথায় - দূরে সরে যাচ্ছ; ২. কেমন করে তোমরা সত্যকে অস্বীকার করছ। (সাফওয়াতুল বয়ান, পৃষ্ঠা ৫৪৯)।

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

সূরা ফাতির মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ সূরাতে মূলত তওহিদের আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতের তাফসীরে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেনঃ

অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ হইও না, অনুগ্রহ ভুলে যেও না, নিমকহারামী করো না। তোমরা যা কিছু পেয়েছ তা আল্লাহ্রই দেয়া, এ সত্যকে তোমরা ভুলে যেও না। অন্য কথায় এই বাক্যটি সাবধান করে দেয় এই বলে যে, যে লোকই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করে, কোনো নেয়ামত পেয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো শোকর আদায় করে, তার যে কোনো একটি কাজই যে করবে, সে অতিবড় অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি। (সূরা ফাতিরের ৫নং টীকা, তাফহীমুল কুরআন, দ্বাদশ খণ্ড)।

আয়াতে এ কথাও প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কি কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে, আছে কোনো রিযিকতাদা? আল্লাহ্ নিজেই জবাব দিচ্ছেনঃ না, নেই, কারণ প্রকৃত ইলাহ হচ্ছেন কেবল আল্লাহ্ তা'আলা। সুতরাং এ ব্যাপারে মানুষের ধোঁকা খাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

www.nagorikpathagar.org

এ আয়াতের তাফসীরে সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছেঃ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং তার একত্ব ও এবাদতের তিনিই যে একমাত্র অধিকারী - এ বিষয়ে দলিল পেশ করছেন। সৃষ্টি ও রিযিক প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন তিনি একক, তেমনি এবাদত পাবার বেলায়ও। সুতরাং অন্য কেউ তার শরীক হতে পারে না। অতঃপর বলা হয়েছে, এ প্রমাণ পেশ করার পরও কি তোমরা অন্য কারো সামনে মাথা নত করবে? এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে? (আল্লামা আযমী কৃত সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ১৩৯, তৃতীয় খণ্ড, ৭ম খণ্ড)।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ রিযিক দেয় না। রিযিক কেবল আল্লাহই দেন। ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি যা নিরেট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত - তা হচ্ছে দুনিয়ার সব সম্পদ আল্লাহর সৃষ্টি করা। এ সম্পদ হতেই মানুষ সব প্রয়োজন পূরণ করে। এ জন্য মানুষকে সব সময় আল্লাহকে মেনে চলা উচিত। আল্লাহই হচ্ছেন ইলাহ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, যাকে মানা সবার কর্তব্য। তার বিধানই সঠিক। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু মানা হলে তা কেবল অকৃতজ্ঞতা এবং না শোকরই হবে না, তা হবে বিভ্রান্তি। আল্লাহকে না মানা হলে তা হবে বিপথে চালিত হওয়া, ধোঁকা খাওয়া, যেমনটি এখানে বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহই সর্বযুগের সব মানুষের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দিতে পারেন। অন্য কোনো শক্তির পক্ষেই তা দেয়া সম্ভব নয়। তারাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের শক্তি সীমিত।

মানব সমাজকে এ জন্য আল্লাহর বিধান মুতাবিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে বিভ্রান্তি হতে মুক্ত হতে পারে। এ পথ অবশ্য কঠিন। কেননা সত্যের প্রতিবন্ধক হচ্ছে মানুষের নিজের নফস ও স্বার্থের দাসানুদাস বিভিন্ন শক্তি।

বস্তুত এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, আল্লাহ পাক যেমন মানুষের জৈবিক ও দৈহিক প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি ব্যবস্থা করেছেন তার নৈতিক ও আত্মিক প্রয়োজন মেটাবার। প্রথমটার ক্ষেত্রে যেমন তিনি একক ও অনন্য, তেমনি দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রেও। সামান্য একটু চিন্তা করলেই এ সত্য সবার সামনে সহজে পরিষ্কার হয়ে উঠে। এতে বিভ্রান্তির সামান্যতম অবকাশও নেই।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর অনুগ্রহশীল ব্যক্তি সম্পর্কে

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ * وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ط إِنَّهُ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ *

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কখনও লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশি দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

(সূরা ফাতির: আয়াত ২৯-৩০)

শব্দের ব্যাখ্যা

كتاب : কিতাব - পুস্তক, বই। এখানে আল্লাহর কিতাব কুরআন মজিদ বোঝানো হয়েছে। সালাত - দোয়া, প্রার্থনা, ইসলামের পরিভাষায় রুকু ও সিজদাসহ যে এবাদত দিনে ৫ (পাঁচ) বার আদায় করা হয়। রিযিক - আয়, জীবনোপকরণ, দান, একজন অন্যজন থেকে যে সুবিধা পায়, ভরণপোষণ। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে।

তিজারত: ব্যবসা-বাণিজ্য, যাবতীয় আর্থিক লেনদেন।

তাবুরা শব্দটি بور থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিনষ্ট হওয়া।

তাফসীরকারদের ব্যাখ্যা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ প্রথম গুণ হচ্ছে তিলাওয়াতে কুরআন। আয়াতে এমন লোকদের বোঝানো হয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কুরআন তিলাওয়াত করেন ঃ اَلَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ ।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে নামাজ কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে 'গোপনে ও প্রকাশ্যে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া

www.nagorikpathagar.org

থেকে আত্মরক্ষার জন্য অধিকাংশ এবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগিতার কারণে কখনো কখনো প্রকাশ্যে করাও জরুরি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ *

এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মসমূহকে ব্যাপক অর্থে ও উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সৎকর্মের তুলনা ব্যবসার সাথে এই অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে।

কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশঙ্কা থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবসায়ের সাথে لَنْ تَبُورَ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, সর্বকালের এই ব্যবসায়ে লোকসান ও ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই। তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই না, উপরন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান ও সওয়াব পুরোপুরি দেয়ার পরও স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ধারণাতীত আরো বেশি দেবেন। (মা'আরেফুল কুরআন, সূরা ফাতিরের উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের তাফসীর অংশ)।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন ঃ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ঈমানদার লোকদের এই কাজকে (আল্লাহ্) ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ব্যবসায়ে মানুষ নিজের মূলধন, শ্রম ও যোগ্যতা ব্যয় করে এই আশায় যে, কেবল মূলধনই ফেরত পাওয়া যাবে না, কেবল শ্রম, সময় ও ব্যয়ের মজুরিই পাওয়া যাবে না, অতিরিক্ত মুনাফাও কিছু পাওয়া যাবে। একজন মু'মিন ব্যক্তির এই কাজও ঠিক তেমনি। সে খোদার হুকুম পালন, বন্দেগী ও এবাদতে এবং দীনের জন্য চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রামে নিজের ধন-মাল, সময় ও মেহনত, যোগ্যতা এই আশায় বিনিয়োগ করেন যে, এই সব কিছুর পুরোপুরি মজুরিই শুধু পাওয়া যাবে না, আল্লাহ তা'আলা আরো অধিক দান করে তাকে ধন্য করবেন। তবে এই দুই প্রকারের ব্যবসায়ে অতি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। সেই পার্থক্য এই দিক দিয়ে যে, দুনিয়ার ব্যবসায়ে মুনাফার আশাই কেবল থাকে না, লোকসান ও দেউলিয়া হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। কিন্তু নিষ্ঠাবান বান্দা আল্লাহর সঙ্গে যে কারবার করে তাতে ক্ষতি-লোকসানের ভয় থাকে না। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফাতিরের ৫১নং টীকা)।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ আয়াতদ্বয়ে কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ কায়েম করা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করার মতো এবাদতের কাজকে ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এতে ইসলামে কেবল ব্যবসার বৈধতাই প্রমাণ করে না, ব্যবসার মর্যাদাও প্রমাণ করে। এই আয়াতে ব্যবসায় লাভ-লোকসানের একটি মানদণ্ড দেয়া হয়েছে। ইসলামের

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টিতে মানুষের লাভ-লোকসানের হিসাব কেবল দুনিয়ার লাভ-লোকসানের ভিত্তিতেই করা সংগত নয়। লাভ-লোকসানের পূর্ণ হিসাব পাওয়া যাবে যদি আখিরাতের লাভ-লোকসানকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; বরং সত্য কথা হচ্ছে - আখিরাতের লাভ-লোকসানই সত্যিকার লাভ-লোকসান। আখিরাতে যদি ক্ষতি হয়, তাহলে দুনিয়ার লাভ কোনো লাভ বলে গণ্য হতে পারে না।

এ জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যথার্থ অর্থ ব্যবস্থার জন্য কেবল আইন-কানুনের উপরই নির্ভর করা হয় না; সেখানে ঈমানদার মানুষ তৈরি করার পূর্ণ ব্যবস্থা থাকে। যারা তাদের কাজের ভিত্তিতে পায় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, তাদের দোয়া হচ্ছেঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো। (সূরা বাকারা: আয়াত ২০১)

এ জন্য ইসলামী অর্থনীতিতে মূল্যবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ আয়াতে ব্যয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ব্যয়কে আল্লাহর কিতাব পাঠ ও সালাত কায়েমের পাশাপাশি উল্লেখ করায় এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। অবশ্য কি ধরনের ব্যয় করতে হবে, সে বিষয়ে এখানে কোনো উল্লেখ নেই। তবে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করার কথা বলে একে শুধুমাত্র দানের মধ্যে সীমিত রাখা হয়নি। কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার আলোকে বলা যায় যে, অসহায় মানুষকে সাহায্য করার জন্য ব্যয় যেমন এর অন্তর্ভুক্ত (যা প্রধানত গোপনে করা হয়), তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ নয় - এমন সব ধরনের ব্যয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে 'আনফাকু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা জমা করে রাখার (hoarding) বিপরীত অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয়, বিনিয়োগ, ধার, যাকাত, সদকা, ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ব্যয়ের উপর কুরআনের অন্যত্রও গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। যে কোনো ব্যয় - তা দানই হোক অথবা বিনিয়োগই হোক, কার্যকর চাহিদাকে বৃদ্ধি করবে। বিনিয়োগের জন্য ব্যয় কার্যকর যোগানকেও বৃদ্ধি করবে। আর দানের রয়েছে সামাজিক তাৎপর্য। তা এক ধরনের Transfer payment হলেও আয় বণ্টনে অসমতা (inequity) কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া, জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভোগ ব্যয়ের গুণক প্রভাব (multiplier effect) বিদ্যমান। সুতরাং সামগ্রিক অর্থনীতির স্বার্থে সুষ্ঠু ব্যয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ অপরিহার্য।

কুরআনে তাই এ বিষয়ে যথার্থ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কৃপণতাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই সাথে ব্যয়ের নামে অপব্যয়কেও ইসলাম গ্রহণ করেনি। ব্যয় হতে হবে যথার্থ। ইতোপূর্বে এ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ * مَاخَلَقْنٰهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ *

আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে কোনো কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করিনি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না। (সূরা দুখান: আয়াত ৩৮-৩৯)

সাধারণ আলোচনা

সূরা দুখান মক্কাতে নাযিল হয়। এ দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক পৃথিবীকে অকারণে সৃষ্টি করেননি। পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী উদ্দেশ্যমূলকভাবে যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথাটি কুরআনের আরো বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

'তিনিই সত্যতা সহকারে (বিলহক) পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আন'আম)

'আল্লাহ্ এসব (সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি) নিরর্থক সৃষ্টি করেননি।' (সূরা ইউসূফ, আয়াত ৫)

'আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী কোনো কিছু আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১৫)

'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না?' (সূরা আল মুমিনূন, আয়াত ১১৫)

'তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী সবকিছু সত্য ভিন্ন অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি করেননি। (সূরা রূম, আয়াত ৮)

এসব আয়াত থেকে বোঝা যায়, সৃষ্টির সবকিছু যথাযথ কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এটি ইসলামী চিন্তার একটি মৌলিক দিক এবং এটিই অতীব সত্য কথা।

www.nagorikpathagar.org

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেছেনঃ বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদঘাটন করে। উদাহরণত এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বোঝা যায়। কারণ যে মহাশক্তি এসব মহাসৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি নিশ্চয়ই এগুলোকে ধ্বংস করে পুনরায় অস্তিত্বে আনতে পারেন। এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি না থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কাণ্ড-কারখানাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং এরপর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেয়া। অন্যথায় সৎ ও অসৎ উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহর মাহাত্ম্যের পরিপন্থী। (মা'আরেফুল কুরআন, সূরা দুখানের তাফসীর অংশ দ্রষ্টব্য)।

মাওলানা মওদূদী লিখেছেনঃ এর তাৎপর্য হচ্ছে, যে ব্যক্তিই মৃত্যুর পরের জীবন ও পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কারের কথা অস্বীকার করে, সে আসলে এ বিশ্বলোককে একটি খেলনা ও এর সৃষ্টিকর্তাকে অবুঝ বালক মনে করে। এ কারণে সে এ মত দাঁড় করিয়েছে যে, মানুষ দুনিয়ার সব রকমের হুড়-হাঙ্গামা করে একদিন এমনি মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে। তার এ জীবনের ভালো বা মন্দ ফল কিছুই হবে না। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই দুনিয়া জাহান কোনো খেলোয়াড়ের খেলার সৃষ্টি নয় বরং এক মহাবিজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার এক মহানির্মাণ। আর কোনো বিজ্ঞানীই অর্থহীন নিস্ফল কাজ করতে পারেন - তা ধারণা করা যায় না। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা দুখানের ৩৪ নং টীকা)।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াত দু'টি মানব জীবনের জন্য একটি মৌলিক দর্শন দান করেছে। এ দু'টি আয়াত যে মহাসত্যের কথা যোজন করছে, তা কেউ যথাযথভাবে বিশ্বাস করলে সে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। সে হয়ে উঠবে স্রষ্টা ও পরকালে গভীর বিশ্বাসী এবং যে স্রষ্টা ও পরকালে গভীর বিশ্বাসী হবে, তার আচরণ অন্যের মতো হবেনা। সে সব কিছু করার সময় পরকালের কথা ও স্রষ্টার নিকট তার জবাবদিহির কথা মনে করবে। সে দুনিয়াতে কম পেলেও বা কষ্ট স্বীকার করতে হলেও সত্যের খাতিরে তা মেনে নেবে। সুতরাং ইসলাম যে নৈতিকতা ভিত্তিক অর্থনীতির পরিকল্পনা করেছে, তার জন্য এ ধরনের ব্যক্তি হওয়া যে একান্ত অপরিহার্য - তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সামাজিক জীবনেও এ ব্যক্তি দায়িত্বশীল হবে এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

www.nagorikpathagar.org

তওবার পর নিয়ামত দান প্রসঙ্গে

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ
وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا *

তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।

(সূরা নূহ: আয়াত ১১-১২)

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ এ আয়াতের প্রেক্ষিতে অধিকাংশ আলিম বলেন, গোনাহ্ থেকে তওবা ও ইস্তিগফার করলে আল্লাহ্ যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে রক্ষা করেন এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোনো রহস্যের কারণে খেলাফও হয়; কিন্তু তওবা ইস্তিগফারের ফলে পার্থিব বিপদ-আপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রচলিত রীতি। হাদিসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। (মা'আরেফুল কুরআন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭৭)।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর তাফসীরে লিখেছেনঃ কুরআন মজিদের বেশ কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহদ্রোহিতার আচরণ কেবল পরকালেই নয় এই দুনিয়াতেও মানুষের জীবন সংকীর্ণ-দুর্বিষহ করে দেয়। পক্ষান্তরে কোনো ক্ষতি যদি আল্লাহর নাফরমানীর পরিবর্তে ঈমান, তাকওয়া ও খোদায়ী আইন-বিধান মেনে চলার নীতি অবলম্বন করে, তাহলে কেবল পরকালেই নয়, দুনিয়ায়ও তার প্রতি অফুরন্ত নিয়ামতের বারি বর্ষণ শুরু করে। (সূরা তাহা: আয়াত ১২৪, সূরা মায়েদা: আয়াত ৬১, সূরা হুদ: আয়াত ৪২)।

কুরআন মজিদের এ সব আদেশ, উপদেশ অনুযায়ী একবার দুর্ভিক্ষকালে হযরত উমর (রা) বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বের হন এবং শুধু ইস্তিগফার করেই ক্ষান্ত হন। লোকেরা বলল, আমিরুল মুমিনীন! আপনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন না। উত্তরে বললেন, আমি আকাশ মণ্ডলের সেসব দুয়ারে ধাক্কা

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছি, যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। অতঃপর সূরা নূহ-এর এ ক'টি আয়াত পড়ে শুনালেন। (ইবন জরীর ও ইবন কাসীর)। হযরত হাসান বসরীর সময়ও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। তার সম্মুখে এক ব্যক্তি এসে চরম অনাবৃষ্টির অভিযোগ করে। তিনি বলেন, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও। অন্য এক লোক দারিদ্র্যের কথা বলে। তৃতীয় এক ব্যক্তি বলল, আমার কোনো সন্তান হচ্ছে না। চতুর্থ ব্যক্তি বলল, আমার জমিতে ফসল খুব কম ফলে। হাসান বসরী (র) প্রত্যেককে একই জওয়াব দিতে লাগলেন। বললেন, আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাও। লোকেরা বলল, ব্যাপার কি? আপনি বিভিন্ন প্রকার সমস্যার একই ধরনের সমাধান, সকল রোগের একই মহৌষধ বলছেন। এর কারণ কি? তিনি এর জওয়াবে সূরা নূহ-এর এ ক'টি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। (তাফহীমূল কুরআন, সূরা নূহের তাফসীর, টীকা নং ১২, সংশোধিত)।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত জীবনের মক্কী অধ্যায়ের প্রথম ভাগে এ সূরা নাযিল হয়। সূরার ৮-১০ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ) কর্তৃক তাঁর সঙ্গীকে দীনের দাওয়াত দেয়া, তাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে বোঝানো এবং আল্লাহর নিকট তাদেরকে ক্ষমা চাইতে আহবান করার কথ উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা ক্ষমা চাও এবং সংশোধিত হয়ে যাও, তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ বৃষ্টি দান করবেন, ধন-সম্পদ দিয়ে ধন্য করবেন। তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করবেন এবং ঝর্ণা প্রবাহিত করবেন।

এ কথা সত্য যে, আল্লাহ পাক অনেক সময় ঈমানদারদের কম সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করবেন (সূরা বাকারা, আয়াত ১১৫)। কিন্তু সব সময়ই যে হবে এটা সত্য নয়। যেমন এ দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে। মুসলিম জাতি যখন সামগ্রিকভাবে ইসলাম অনুসরণ করেছে, তখন সাধারণত আল্লাহ পাক তাদেরকে মালামাল ও সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন। গত কয়েকশ' বছর যে মুসলমানদের অবস্থা সাধারণভাবে খারাপ তার কারণ অন্য। এ সময়ে মুসলিম জাতি যথাযথভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানের চর্চা করেনি, জিহাদের দায়িত্ব পালন করেনি, জাতি উন্নতির জন্য ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে কাজ করা দরকার তা পুরোপুরিভাবে করেনি। এ সময়ে তারা ইসলামের পরিবর্তে সাধারণভাবে কুসংস্কারে লিপ্ত হয়েছে। তা না হলে কোনো কারণ নেই মুসলিম জাতির প্রতি আল্লাহ মেহেরবানী না করার।

তাফসীর অংশে হযরত উমর (রা) ও হযরত হাসান বসরীর (র) কাজের তাৎপর্য এ নয় যে, কেবল ক্ষমা চাইতে হবে, কোনো কাজ করতে হবে না; বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে কাজও করতে হবে, ক্ষমাও চাইতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

অভাবগ্রস্তদের দুঃখ দূর করা প্রসঙ্গে

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا * اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُوْرًا *

এবং আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় মিসকিন, এতিম ও কয়েদীকে যারা খাওয়ায় আর তাদেরকে বলে - কেবল আল্লাহর জন্যই তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি এবং তোমাদের নিকট হতে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাই না। (সূরা দাহর: আয়াত ৮-৯)

শব্দ টীকা

لوجه الله সরাসরি অর্থ আল্লাহ তা'আলার চেহারার উদ্দেশ্যে। ভাবার্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অথবা তাঁর সৃষ্টির বৃহত্তর কল্যাণার্থে।

তাফসীরকারদের আলোচনা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী এ দু'টি আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ মূলের শব্দ হলো على حبه। বহুসংখ্যক তাফসীরকার এর তাৎপর্য করেছেন - খাবারের প্রতি তাদের মনের আকর্ষণ, লোভ এবং নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা এই লোকদের খাওয়ায়। ইবন আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, দরিদ্র লোকদিগকে খাওয়াবার আগ্রহ ও উৎসাহে তারা এ কাজ করে। আর হযরত ফুজাইল ইবন আয়াজ ও আবূ মাসুদ দারানী বলেন, 'তারা আল্লাহর ভালোবাসায় এরূপ করে।' আমাদের দৃষ্টিতে এটাই ঠিক। এর পরবর্তী বাক্য 'আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের খাওয়াই' - এ কথা সমর্থন করে। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা দাহর, টীকা ১১)।

তিনি আরো লিখেনঃ আলোচ্য আয়াতে 'কয়েদী' বলতে যে কোনো বন্দীকেই বোঝায়, সে কাফির হোক কিংবা মুসলমান, যুদ্ধবন্দী হোক কিংবা কোনো অপরাধের কারণে বন্দী। (প্রাগুক্ত, টীকা নং ১২)।

www.nagorikpathagar.org

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) লিখেনঃ উপরে বর্ণিত সৎ লোকদের গুণাবলীর মধ্যে এটাও অন্যতম গুণ যে, তারা নিঃস্ব, এতিম ও বন্দীদের খাদ্য দান করেন। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ 'মা'আ' অর্থ সত্ত্বেও। মর্মকথা হলো এই যে, তারা নিঃস্বদের খাদ্য দান করে থাকেন, যদিও এ খাদ্যে তাঁদের আসক্তি ও ভালোবাসা আছে। শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার প্রদান করে এমন নয়। দরিদ্র ও এতিমদের খাওয়ানো তো সওয়াবের কাজ এবং এবাদত বলে প্রকাশ্যেই বোঝা যায়। বন্দীদের ব্যাপারে এমন কাজও এবাদত। কেননা, বন্দী - সে মুসলিম হোক বা কাফির - তাকে সাহায্য করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করে তাও সওয়াব হবে; কেননা ইসলামের প্রাথমিক যুগে বন্দীদের খাওয়ানো ও সংরক্ষণ করার জন্য সাধারণ মুসলিমদের মাঝে বন্টন করা হতো। যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের সাথে এরূপ করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩৮)।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সূরা দাহর-এর শুরুতে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার জীবনের শুরুতে কিছুই ছিল না এবং ক্রমে সে শ্রবণ ও দৃষ্টিসম্পন্ন মানবে পরিণত হয়। আল্লাহ তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন, তার মন চাইলে শোকরগুযার বান্দা হিসেবে আল্লাহর পথে চলতে পারে অথবা অকৃতজ্ঞ কাফির হতে পারে। তারপর কাফিরদের শাস্তি ও সৎকর্মশীলদের গুণাবলী পর্যায়ে আলোচ্য আয়াত দু'টিতে কেবল আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির জন্য মিসকিন, এতিম ও কয়েদীদের খাওয়াতে বলা হয়েছে।

এতিম ও মিসকিনদের প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের অভাব, দারিদ্র্য ও অসুবিধা দূর করার কথা কুরআনের বহু স্থানে বলা হয়েছে। কয়েদীদের কথা এ আয়াতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কুরআনে যে অর্থনৈতিক নীতিমালা পাওয়া যায় তার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে অভাবগ্রস্ত জনসমষ্টির অভাব-দুঃখ দূর করা। এ প্রসঙ্গে সূরা কাসাসে একটি ব্যাপক নীতি বর্ণিত হয়েছেঃ

> আমি ইচ্ছা করলাম যে, যারা দুনিয়াতে নির্যাতিত তাদের প্রতি মেহেরবানী করব, তাদের নেতৃত্ব দান করব, তাদেরকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করব এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাব। (সূরা কাসাস: আয়াত ৫)

আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর করা প্রত্যেক মু'মিনের দায়িত্ব। সূরা দাহরের এ আয়াতদ্বয়েও ঐ মূলনীতির ব্যাখ্যা রয়েছে। এই নীতি কার্যকর করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

এ দু'টি আয়াতে ইসলামের ব্যয়নীতির একটি দিক পাওয়া যায়। মুসলমানদের ব্যয় আল্লাহর ভালবাসায় হতে হবে। ব্যয়ের অন্যান্য লক্ষ্যের উপরে থাকতে

www.nagorikpathagar.org

হবে আল্লাহর ভালবাসা। অর্থাৎ যাতে আল্লাহর মর্জি নেই, এমন কাজে ব্যয় করা যাবে না। তেমনিভাবে ইসলামী সমাজে ব্যক্তি ও সরকারকে এমন অনেক ব্যয় করতে হবে, যা আপাতঃদৃষ্টিতে লাভজনক নয় কিন্তু যা করা মানবকল্যাণের দাবি।

বস্তুত ইসলামী অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা এমন একটি Comprehensive System যেখানে অর্থনীতির যাবতীয় বিষয় অর্থনৈতিকভাবে সুসমন্বিত করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার উৎপাদন প্রক্রিয়া (Production process)-এর সাথে যারা প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের আবার এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত করার জন্য বিভিন্ন রকম পন্থা গৃহীত হয়েছে। দান-সাদকা, যাকাত ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে সক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়ে নানাভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতদ্বয়েও একইভাবে তা করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতদ্বয়ের বাহ্যিক রূপ আধ্যাত্মিক হলেও সমষ্টির দিক দিয়ে এগুলো অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যবহ।

www.nagorikpathagar.org

বর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ

ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল

শাহ আবদুল হান্নান